মানুষের মন

পরাধীনতার তীব্র জ্বালা
যাদের প্রাণ অগ্নিময় ক'রে
তুলেছিল, জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য
আরাম-প্রলোভন তুচ্ছ ক'রে, দেশের
মুক্তিযজ্ঞে অকাতরে অমূল্য প্রাণের অর্ঘ্যদান ক'রে
দেশকে যারা স্বাধীনতার দুয়ারে এনে উপস্থিত করেছে, সেই সব
মৃত্যুঞ্জয় ভাই-বোনদের উদ্দেশে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করলাম।

কলিকাতা

মানুষের মন

জীবনময় রায়



রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো : কলিকাতা-৪

চার

মূল্য পাঁচ টাকা

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৪৪

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

মানুষের মন

১

অনেক ঘোরাঘুরি ক'রে নন্দলাল শেষে এন্‌টালিতে একখানা ছোট ভাড়াটে বাড়ির সন্ধান পেলে। বাড়িটা নেহাৎ ছোটই, গলিটাও খুব ঘুপ্‌চি। তা হোক, অত সস্তায় আজকাল্‌কার দিনে একটা গোটা বাড়ি আর পাওয়া যায় কোথায়? ঘর কমও নয়; উপরে খান-দুই শোবার ঘর—বাকি রান্নাঘর, স্নানের জায়গা সব নীচে। তা ছাড়া গলির ওপরেই একটা ক্ষুদে কুঠরি; বাড়িওয়ালারা ওকেই খাতির ক'রে বলে—বৈঠকখানা। তাতে বাতাসের তো প্রবেশ নিষেধই; আর আলো যা আসে তাও ঐ সরু গলিটার অন্ধকার চুঁইয়ে। ঘুরতে ঘুরতে হয়রান হয়ে শেষে ল্যাম্পপোস্টের গায়ে বাড়িটার সন্ধান পাওয়া গেল। স্ত্রীর না-বনতাপনা, তিনি আবার কারো সঙ্গে থাকতে পারেন না। কুলোবে কোত্থেকে, তা তুই ভেবে মর্‌।

এই সবে ব্যবসা ক'রে বেচারা একটু গুছিয়ে নিচ্ছে। ভাবলে, এবার বউকে এনে ঘর-সংসার পেতে থিতু হয়ে বসবে; আর বাউড়ের মত মেসে মেসে কাটানো ভাল দেখায় না। ক্যাদার-দা'র বাড়ির ওপর-তলার ঘরখানা কিছু নিন্দের নয়; তা ছাড়া একটা রান্নাঘর। টাকা-বারো ভাড়া হবে এখন, আর ক্যাদার-দা'কে ব'লে-ক'য়ে, এক রকম ক'রে গুছিয়ে নেবে। নন্দ বলে, তা তো হবার জুৎ নেই, নাই দিলে সব মাথায় ওঠে কিনা!

কি আর করে! গেল এন্‌টালিতে বাড়ির খোঁজে।

অনেক হাঁকডাক করতে করতে একটি ছোট্ট মাদুলি-পরা ছেলে—

ভারি মিষ্টি ছেলেটি—দরজাটা ফাঁক ক'রে মুখ বাড়ালে, পাপড়ির ভেতর থেকে গোলাপের কুঁড়িটি যেন। বড় বড় চোখ তুলে নন্দকে দেখেই দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ডাকল, দিদি!

কি দাদা?—ব'লে একটু পরে এক বুড়ো ঝি বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে, কি গা বাছা?

বাড়ি ভাড়া আছে?

তা আছে বাছা, তা ম্যাছ-ট্যাছ হবে নি বাপু।

নন্দ মনে মনে চ'টে গেল; ভাবলে, গেল যা, আমার কপালে কি মেসের ছাপ মারা আছে নাকি? প্রকাশ্যে যথাসম্ভব মোলায়েম সুরে বললে, না না, মেস নয় গো। আমরা মেয়েছেলে নিয়েই থাকব। বাড়িটা কি দেখতে পাই?

দাঁড়াও বাছা, চাবিটা আনি; কত নোক গা বাছা তোমরা? নোক বেশি হ'লে ভাড়া দেওয়া হবে নি।

কেন?

তা কি জানি বাছা! যার বাড়ি সে দিবে নি। তা বাপু, বাড়ি তো এই ছ মাস প'ড়েই রইছে—

আচ্ছা, চাবিটা আনো। লোক দু-তিন জনের বেশি হবে না।

নন্দ ভারি বিরক্ত হ'ল ওর কথায়, এত তত্ত্বে তোর দরকার কি রে বাপু?

এত সরু গলিরও যে বাই-লেন থাকে, না দেখলে তা চট্ ক'রে বিশ্বাস করা শক্ত। বাড়ির ডান পাশ দিয়ে একটা ঘুঁড়ি পথ; তারই ওপর বাড়ির এই অংশটার ঢোকবার দরজা। একই বাড়ির পিছনের অংশটা ভাড়া দেওয়া হয়। দুই বাড়ির মধ্যে রান্নাঘরের ভিতর দিয়ে একটা দরজা ছিল বটে, কিন্তু সেটা খুব সাবধানে এঁটে বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে।

ভাড়া কুড়ি টাকা। এক মাসের টাকা আগাম দিয়ে, বাড়ির চাবিটা নিয়ে নন্দ ফিরে গেল।

২

বাড়িতে দু-এক দিন থাকতে-না-থাকতেই নন্দর কেমন যেন ভাল ঠেকে না। রাত্রে পাশের বাড়িতে কেমন সব আওয়াজ হয়। তার উপর ঝিটার সেই সব কথা। রাত হ'লেই ভীরু মানুষ নন্দর কেমন গা ছম্-ছম করে। মালতীর সে বালাই নেই।

বেশি দিনও নয়, সবে দিন-পনরো পরে একদিন অনেক রাত্রে নন্দ স্ত্রীর তাড়নায় জেগে উঠল, ওগো, ওঠ না! দেখ না, পাশের বাড়িতে কি কাণ্ড হচ্ছে!

সমস্ত দিন বেচারার ঘোরাঘুরির কাজ। নন্দ বিরক্ত হয়ে বললে, আবার দেখব কি? ও তো নিত্যই আছে। ব'লে পাশ ফিরে শোবার চেষ্টা করলে। মালতী দু-মিনিট চুপ ক'রে রইল, তার পর ঠেলা দিয়ে বললে, ওই দেখ আবার।

নন্দ ঘুমোয় নি। সেও কান পেতে সবই শুনছিল। আজকেরটা যেন একটু বেশি বেশি ঠেকছে। ব্যাপারটা যে কি হতে পারে, তা অনেক ক'রেও তার ঘুমালো মাথায় কিছুতেই আসছে না। আধা-ঘুমে আধা-চিন্তায় খানিক চুপ ক'রে সে প'ড়ে রইল। কিন্তু শোবার জো কি? কথায় বলে, স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী; সে কি আর শান্তিতে শুতে দেয়? বিরক্ত হয়ে স্ত্রীকে বললে, আরে, দয়া-টয়া আমাদের মনেও আছে, শরীরে রাগও কিছু কম নেই। হ'লেও, এসব চুপ ক'রে সহ্য করতে হয়, উপায় কি? কিন্তু সে কথা শোনে কে?

উঠতে হ'ল তাকে। একটা আলো হাতে ক'রে, সিঁড়ি দিয়ে পা আর নামতে চায় না। তবু কি আর করে, গেল নীচে—একলাই।

স্ত্রীর ব্যবহারে আন্তরিক চ'টে গেল। দেখ দিকি, এই রাত্তিরে, এ সব এঁদো গলির মধ্যে কলকাতার শহরে কি না হতে পারে? আর যাবেই বা সে কোথায়? কি ক'রে পরের বাড়ির মধ্যে ঢুকবে? দরজা যদি না খোলে? ভেঙে ঢুকতে হবে না কি? ইঃ, তা আর ঢুকতে হয় না—ট্রেসপাস, বার্গলারি, ক্রিমিন্থাল ইন্টিমিডেশুন যা খুশি চার্জ আনতে পারে। তার পর যাও শ্রীঘর তিনটি বছর। তখন প্যানর-প্যানর ক'রে কেঁদো 'খন।

রাগে গজগজ করতে করতে ভয়ে ভয়ে নন্দ যেই না দরজার খিলটি খুলেছে, আর গলির মধ্যে একেবারে দুপদাপ পায়ের শব্দ। ভয়ে নন্দর বুকটা ধড়াস ক'রে উঠল। হাত-পা ঠকঠক ক'রে কাঁপতে লাগল। নিশ্চয় চোর, কি গুণ্ডা, কি পলিটিক্যাল ডাকাত, নিদেন পক্ষে মাতাল, পুলিসে তাড়া করেছে। ভয়ে তার দম বন্ধ হয়ে এল, হাত-পা জল হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি খিলটা বন্ধ করবার আগেই ব্যাটা একেবারে ভীষণ বেগে হুড়মুড় ক'রে তাকে ঠেলে উঠানের মধ্যে এসে আছড়ে পড়ল।

আমাকে বাঁচান। দোহাই আপনাদের, মেরে ফেলেছে আমায়। শীগ্‌গির দরজা দিন।

ওমা, এ কি, মেয়েমানুষ যে! সাহস ক'রে নন্দ এগিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ ক'রে ফেললে। না করলে সে রাত্রে যা কাণ্ডটা হ'ত, বাঙালীর ছেলে হয়ে তা ভাবতেও গায়ের রক্ত জল হয়ে যায়। স্ত্রী উপর থেকে ছুটে এল। মেয়েটি তখন প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। এমন সময় দরজায় আবার ভীষণ ধাক্কাধাক্কি। নন্দকে বুঝি কাঁপ-জ্বরে ধরল।

স্ত্রী তাকে ধমকে বললে, যাও না গো, দরজাটা ঠেস দিয়ে গে চেপে দাঁড়াও।

হ্যাঃ, চেপে দাঁড়াও, বাস্, বললেই ঢুকে গেল! যত্তো হাঙ্গাম!

এদিকে দরজা প্রায় ভাঙে ভাঙে। আর দরজাও তেমনি। কি করে, কোন গতিকে মরিয়া হয়ে দরজায় পিঠটা ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে নন্দ দুগ্‌গা-নাম জপতে লাগল। ভরসা ছিল শুধু তার দেহের ওজনটার। ওর স্ত্রীর ভরসাও বোধ হয় তাই।

গলার আওয়াজে বোঝা গেল, লোকটা খুবই মদ খেয়েছে। খানিক ধাক্কাধাক্কি ক'রে খুব শাসাতে শাসাতে শেষে চ'লে গেল। একবার নন্দ ভাবলে, কাজ কি বাবা অত হাঙ্গামে, খুলে দি; পরের হাঙ্গামে গিয়ে লাভ কি? আবার ভয় হ'ল, মাতালটা ঢুকেই কিছু একটা ক'রে বসবে না তো? বিশেষত বউটা আবার নীচে রয়েছে। ভেবে চিন্তে আর খোলা হ'ল না।

৩

সমস্ত রাত মেয়েটির শুশ্রূষায় কাটল। নন্দর যে এত বড় কুম্ভকর্ণের ঘুম, কোথায় তা গেল যেন। ওর বউ মালতী স্টোভ জ্বালিয়ে জল গরম ক'রে পায়ে-টায়ে সেঁক দিচ্ছে আর ও মেয়েটির মাথায় পাখা করছে। ঠায় ব'সে পাখাই করছে।—পাখা করছে তা মনে নেই; শুধু মুখের দিকে চেয়ে আছে। দেখছে—দেখে দেখে চোখ যেন আর ফেরানো যায় না। এমন যে হয়, তা গরিব মানুষের ছেলে বি.এ. ফেল নন্দলাল দত্ত, সামান্য ব্যবসা ক'রে খায়,—তা কল্পনাও করতে পারত না। শিশির-ধোয়া পদ্ম-ফুলটি! হ্যাঁ, তেমনই বটে! মনে হয়, তারও বুঝি এমন কোমলতা নেই।

নিশ্বাস পড়ছে। ধীরে—অতি ধীরে; খুব লক্ষ্য না করলে বোঝা যায় না। কপালের উপর অবাধ্য একটা চুলের গুছি, ক্রমাগতই এসে

এসে পড়ছে। পাখার বাতাস দিয়ে নন্দ যত বার অন্য দিকে চালিয়ে দিচ্ছে, তত বারই আবার কপালের উপর এসে পড়ছে। ভাবলে, থাক গে, সরিয়ে দি। কণ্ঠার কাছ থেকে কাপড়টা নেমে পড়েছে। বুকে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে, একে দুর্বল শরীর, তাতে···। ভাবলে, ভাল ক'রে ঢেকে দি। রুগী বই তো না। ছুঁতেই মেয়েটির সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠল। নন্দলাল নিজের মনে অজ্ঞাতে বিড়বিড় ক'রে ব'লে উঠল, উঃ, কি মারই মেরেছে পাষণ্ডটা! নেহাৎ একলা—নইলে বাড়ির মধ্যে পুরে ঘা-কতক দিয়ে দিতুম হারামজাদা ব্যাটাকে।

এমনি ক'রে মেয়েটির মুখ চেয়ে, সেবা ক'রে সারা রাত কাটল। শেষরাত্রের দিকে মেয়েটির জ্ঞান ফিরে এল; কিন্তু জ্বরও এল খুব। নন্দ ভেবেছিল, রাত্রের মধ্যেই মাতালটা লোকজন নিয়ে হৈ-চৈ ক'রে এসে পড়বে। কিন্তু কই? জনপ্রাণীর টুঁ শব্দটি নেই। সমস্ত রাত নন্দ কান পেতে আছে। বউটা বার বার নীচে আর উপর করছে, জল গরম, সেঁক—এই সব নিয়ে। নন্দ ভাবছে, ওর কি ভয়-ডরও নেই?

৪

পরদিন সকালে জ্বর অনেকটা কম মনে হ'ল। মেয়েটি মালতীকে ডেকে বললে, ভাই, ওঁকে বল আমার খোকাকে একটু এনে দিতে। সে উঠে আমাকে না দেখলে কেঁদে অনর্থ করবে।

গেল নন্দ আবার সেই মাতালটার বাড়ি। রোগীর অনুরোধ। তা ছাড়া না গেলে ছাড়ে কে?

সরু গলিটা থেকে বেরুতেই ধড়ে যেন তার প্রাণ এল। সেই বুড়ী ঝিটা বকবক করতে করতে বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে। ভেবেই পাচ্ছিল না, ঢুকবে কেমন ক'রে ব্যাটার বাড়িতে! বুড়ী কেবলই বকবক করছে,

ছিরোটা কাল এমনি—ছাঃ, মাগী বুঝি এবার পালাল। আক্কেল দেখ মাগীর, ওই দুধের বাছা, তারেও ফেলে মানুষে যেতে পারে! ডাইনি মাগী।

আর বেশি দেরি না ক'রে তাকে একটু খুশি ক'রে নন্দ বললে, ওগো অ বুড়ো মা, আরে, শোনো গো, তোমার বউমা কাল রাত্রে পালিয়ে আমাদের বাড়ি গিয়ে পড়েছে গো, ছেলে ফেলে পালায় নি। মারের চোটে বাছা গিয়ে পড়েছে, বড্ডই জ্বর হয়েছে, বাঁচে কি না-বাঁচে। ছেলেকে একটু দেখতে চায় গো—আমাকে তাই নিতে পাঠিয়েছে।

এক মুহূর্তে বুড়ীর স্বর একেবারে দীপক থেকে সিন্ধু বারোয়াঁয় এসে নামল, আহা-হা, তাই বল বাছা। অমন সোনার পিত্তিমে, তার এমন দশাটা করলে ছোঁড়া! ছিরোটা কাল এই দশা গো, ছিরোটা কাল ওই দশা। মদ খেলে আর জ্ঞানগম্যি কিচ্ছুটি থাকে নি। আর তাই বা এত মারধোরের দরকার কি রে বাপু; ওপরে তো তালা দে রেখেছিস—আবার এত হাঙ্গাম-হুজ্জুতে দরকারটা কি? আহা, মা আমার নক্ষীর পিত্তিমে, মুখে রা'টি নেই—

কথা শুনে নন্দর তো চক্ষুস্থির। উপরে তালা দিয়ে রাখে! সে আবার কি রে বাবা! নন্দলালের মনে নানা রকম ভাবনা এসে জুটতে লাগল। ব্যাপার বড় সুবিধের ব'লে বোধ হ'ল না। একটা মুশ্‌কিলে না পড়তে হয় শেষকালে।

হ্যাঁ গা, তোমার বাবু কোথা?

হা কপাল; বাবু কি আর পাঁচ-ছ দিনের মধ্যে এমুখো হবে গা? অমনি ধারা তার ছিরোটা কাল। একটা ব্যায়রাম-স্যায়রাম না নিয়ে আর ফিরবে নি বাপু। কমনে আড্ডায় আড্ডায় ফিরবে এখন। আমি ঘাই মানুষ, তাই এই ঘরদোর আগলে প'ড়ে আছি। হাতে ক'রে এত

বড্ডা ক'রে তুলেছি, ফেলেও তো যেতে পারি নি; নইলে ঘেন্না ধ'রে গেছে বাবু, ঘেন্না ধ'রে গেছে—

নন্দ খোকাকে নিয়ে ফিরে এল। কিন্তু মনের মধ্যে ভারি একটা অস্বস্তি, ভয়, কৌতূহল মিলে তার মনটাকে নাড়াচাড়া দিতে লাগল। স্ত্রীকে গোপনে ডেকে বললে, দেখ, এই রকম সব কাণ্ড; এরা কিন্তু সুবিধের লোক ব'লে বোধ হচ্ছে না। মালতী হেসে উঠল, বললে, তুমি চুপ কর দিকি, কে ভাল লোক কে মন্দ লোক তা চিনতে পারি। ও কখনই মন্দ লোক হতে পারে না।

চুপ ক'রেই যেতে হ'ল নন্দকে। ওর মুখের দিকে তাকালে অবশ্য নন্দও তা আর মনে করতে পারে না। কিন্তু—।' মরুক গে। নন্দ একটু জোর দিয়েই বললে, শেষকালে কিন্তু আমায় দোষ দিও না ব'লে দিচ্ছি, হাঁ।

ওগো, না গো না, তোমায় কিছুই ভাবতে হবে না।

নন্দ মুখ ভেঙিয়ে বললে, বাস্, 'ভাবতে হবে না' ব'লেই খালাস। এর পর হাঙ্গাম হ'লেই বলবে 'তখুনি তো বললাম' ব'লে এক নাকী সুর ধরবে এখন।

স্ত্রী কথা না ব'লে একটু হেসে চ'লে গেল।

কেন জানি না, নন্দলালের মনে একটু স্বস্তি বোধ হ'ল। বোধ করি, বিপদটা অলীক এই ভেবেই। বোধ করি, রোগকাতর অসহায় নারীকে বিদায় দেবার নিষ্ঠুরতা তার মনকে পীড়া দিচ্ছিল মনে মনে। কিংবা আর কোন সূক্ষ্মতর সুকুমার হেতু তার মনে প্রচ্ছন্ন ছিল, কে জানে! সে যেন একটু নিশ্চিন্ত হয়ে রোগীর শয্যার পাশে গিয়ে পাখা নিয়ে বসল।

মালতী একটু দুধ গরম ক'রে নিয়ে ফিরে এল এবং নন্দকে দেখে ফিক ক'রে একটু হেসেই মুখটা ফিরিয়ে নিলে।

ওর ওই হাসিটা নন্দর ভাল লাগে না। ভাবে, মেয়েমানুষের মন ভারি ইয়ে।

৫

সন্ধ্যার দিকে কমলের জ্বর খুব প্রবল হয়ে উঠল এবং বিকারের লক্ষণ সব দেখা যেতে লাগল।

রাত আটটা। কিন্তু চারি দিক এত চুপচাপ যে দুপুর রাত ব'লে মনে হয়। রোগীর শিয়রে ব'সে আছে নন্দ। ডাক্তার দেখে সন্ধ্যাবেলা ব'লে গেছে যে, আশা বিশেষ কিছুই নেই। ক্রমাগত বরফ চালাতে হচ্ছে। তাই হাতে একটা কাজ পেয়ে অকারণে ব'সে থাকবার অস্বস্তিটা কেটেছে তার। বোধ হয় সেবার ভারটা ওর ভিতরে চাপা ছিল—অবসর ও সুযোগের অভাবে ফুটতে পায় নি। নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছে নিজের সেবা করবার পটুতা দেখে। জ্বরের ধমকে সমস্ত মুখটা লাল হয়ে উঠেছে—লাল টুকটুকে ঠোঁট দুটি রসে টুলটুল করছে। জ্বরের তাড়সে এত মারাত্মক সুন্দর দেখায় মানুষকে! নন্দ ওর যন্ত্রণার কথা প্রায় ভুলেই বসেছিল। কতক্ষণ এমনি ভাবে ছিল তার হুঁশ নেই। স্ত্রী এসে ফিসফিস ক'রে বললে, কি গো, গিলে খাবে না কি? ব'লে একটু মুচকে হাসলে। নন্দ ভাবে, এত ছোট মন এই মেয়ে জাতটার! একটু ইয়ে হয়েছে কি বাস্, ওদের মনে সন্দেহ হবেই। হ'লই বা ঠাট্টা, অমন ঠাট্টা সব সময় ভাল না। অন্যমনস্ক ছিল ব'লেই বোধ করি ঠিক মুখের মত জবাবটা তার জোগাল না। একটু আমতা-আমতাই ক'রে ফেলেছিল প্রথমটা। তারপর সামলে নিয়ে প্রায় রেগেই বললে, একটা আপদ ঘরে টেনে এনে, এখন ছ্যাকরা হচ্ছে, না?

স্ত্রী কিছু না ব'লে একটু মুচকি হেসে বেরিয়ে গেল, বললে, ব'স, আর একটু বরফ ভেঙে আনি।

ওর এই হাসিটায় নন্দর পিত্তি জ্ব'লে যায়। খানিকক্ষণ পরে মালতী বরফ নিয়ে ফিরে এল। রোগিণীর অবস্থা ভাল নয়। ক্রমাগত প্রলাপ ব'কে চলেছে, একটাও কথা বোঝা যায় না।

রাত্রি অনেক। পাখা নাড়তে নাড়তে নন্দর একটু তন্দ্রা এসেছে মাত্র। এমন সময় হঠাৎ গলির মোড়ে কে যেন ডাকলে, বাবুজী, এ বাবুজী! কিছুই বুঝতে না পেরে সে চুপ হয়ে রইল। এত রাত্রে আবার কে ডাকবে! স্ত্রী আগেই উঠে বসেছিল, বললে, ওগো, কে ডাকছে যেন।

নন্দর বুক তখন ধড়াস ধড়াস করছে। তবু মুখে তাচ্ছিল্য দেখিয়ে বললে, হ্যাঁ, কে আবার আমায় ডাকবে! অন্য কাউকে ডাকছে।

তার কথা শেষ হবার আগেই বাড়ির দরজায় ঘা পড়ল, বাবুজী, এ বাবুজী, কেওয়াড়া খোলিয়ে তো।

বহু কষ্টে দায়ে প'ড়ে সাহসে ভর ক'রে সে বারান্দায় গিয়ে হাঁক দিলে, কোন্ হ্যায় রে বাপ্ এত্তো রাতমে। বাড়িমে ব্যায়রামী আদমি হ্যায়। একটু নিচিন্দি হবার জো নেই।

খোলিয়ে বাবু। খবর হ্যায়। হাম পুলুসকে আদমি হয়। মাটিয়া কালিজসে আয়া।

ওরে বাবা, আবার পুলিস কেন! নন্দর পিলে তো চমকে গেল। না গিয়েও উপায় নেই। ভারি রাগ হ'ল স্ত্রীর উপর। যত হাঙ্গামের গোড়া তো ওই। বকবক করতে করতে নন্দ উঠে পড়ল।—তখন বললাম তা শুনলে না। এখন মরি গে আমি হাজতে প'চে। দেখ দিকি কি ফ্যাসাদে পড়া গেল! কি করি এখন? যত্তো হাঙ্গাম!

মালতী বললে, এত ভয় পাচ্ছ কেন? কোন অন্যায় তো কর নি। দেখ না ব্যাপারটা কি!

আর দেখেছি! ক্যাঁক ক'রে হাতকড়ি দিয়ে নিয়ে যাবে এখন। পরের মেয়ে ঘরে পোরা সোজা কথা কিনা!

আর বেশি তর্ক করবার সময় পেল না। দরজায় আবার ঘা পড়ল। স্ত্রীকে রেগে বললে, নাও, এখন আলোটা ধর। মরতে তো হবেই। তার পথটা একটু দেখাও এখন।

মালতী না হেসে থাকতে পারে না। নন্দ তাতে আরও চ'টে যায়।

বাবুজী, খোলিয়ে না!

এই যে বাবা, এলুম ব'লে। রাগ ক'রো না সেপাই সাহেব। চটীঠো তক্তাকে তল্‌মে সেঁদোয় গিয়া, ওইঠো বের করনেমে যা দেরি।

গেল নেমে, কাঁপতে কাঁপতে। পিছনে স্ত্রী লণ্ঠন-হাতে। যা হোক তবু একটা নিজের লোক, তাই একটু ভরসা।

সেপাই যা বললে, তা শুনে নন্দলাল বেশ খানিকটা স্তম্ভিত হয়েই রইল। পাশের বাড়ির সেই লোকটা রাস্তায় লরি চাপা প'ড়ে মারা গেছে। মানুষের মৃত্যুসংবাদে মানুষের কিছু আর খুশি হবার কথা নয়। তবু মনে হ'ল যেন একটা দুঃস্বপ্ন বুকে জেঁতে ছিল—তার থেকে ত্রাণ পেয়ে গেল। কিন্তু এর মানে কি? তার এতটা স্বস্তি পাবার কারণ ঠিক খুঁজে পাওয়াও শক্ত। বোধ করি কাল রাত্তিরে সেই যে মাতালের শাসানির পর থেকে একটা আসন্ন দুর্দৈবের নিশ্চিত আতঙ্ক মনের ভিতর চেপে ছিল, তার থেকে পরিত্রাণ পেল ব'লেই এই স্বস্তি। কিংবা অবলার উপর যে অত্যাচার করে, তার প্রতি বোধ করি সহজেই মানুষের একটা ঘৃণা জন্মে। ভগবান নিজেই পাষণ্ডের উপযুক্ত শাস্তি দিলেন ব'লে করুণাময়ের ন্যায়পরতায় এই প্রসন্নতা তার মনে। অথবা আরও কোন গূঢ়তম কারণ তার অন্তরের মধ্যেই ছিল হয়তো, কি জানি, কিন্তু মনটা যে সে অকস্মাৎ অত্যন্ত হালকা বোধ করলে এবং একটা

গভীর তৃপ্তির নিশ্বাস নিজের অতর্কিতেই যে তার বুক থেকে বেরিয়ে এল তা ভেবে একটু যেন লজ্জাও হ'ল। বললে, আহা সেপাই সাহেব! লোকটাকে চিনতুম না বটে— কিন্তু পড়শী কিনা! ওরই বাড়িতে আজ কদিন হ'ল আমরা ভাড়াটে এসেছি। বুঝলে কিনা? তা মারাই গেল একেবারে; অ্যাঁ? আহা-হা, সাহেব, এ সব আর কিছু নয়, মদে করেছে।

সেপাই ঘাড় দোলাতে দোলাতে একটু ঘনিষ্ঠভাবে বললে, বড্ডি মাতোয়ালা থা বাবু। কুচ্ছু খেয়াল থা না। নসীব বাবু, নসীব! উয়ার আপনে লোক কোই আসে?

না সেপাই সাহেব, আপনার বলতে ওর কেউ নেই গো।

বুড়ো ঝিটাকে আর এই হাঙ্গামে জড়াতে তার ইচ্ছে হ'ল না।

মালতী এই বীভৎস মৃত্যুর রূঢ়তায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। মাতাল হ'লেও তার কেমন মায়া করতে লাগল, সেপাই চ'লে গেলে সে ক্ষুণ্ণ স্বরে বললে আহা-হা, শেষে লরির তলায় প'ড়ে মারা গেল গা? উঃ—

কথার ধরনে নন্দলাল ভারি চ'টে গিয়ে বললে, মরবে না? ভগবান আছেন তো মাথার ওপর।

মালতী তার ভগবদ্ভক্তিতে কিছুমাত্র অভিভূত না হয়ে একটু উষ্ণভাবেই বললে, তাই ব'লে মোটর চাপা প'ড়ে মরবে? ই—শ!

নন্দলাল বিরক্ত হয়ে বলতে লাগল, মরবে না? মেয়েটার কি হাল করেছে দেখ তো? মরেছে, না বেঁচেছে। নইলে জেলে প'চে একদিন ফাঁসিতে ঝুলতে হ'ত যে।

মালতী চুপ ক'রেই গেল। তবু উক্ত উপায়ে মৃত্যুর দুঃসহ যন্ত্রণা কল্পনা ক'রে মনে মনে সে শিউরে উঠল।

নন্দ মনে মনে বললে, মরুক গে, ওদের লজিকই আলাদা।

৬

চার-পাঁচ মাস আগেকার কথা।

মাঘ মাস। প্রয়াগের কুম্ভমেলা। কি একটা স্নানের যোগ যেন। উঃ, কি দারুণ ভিড়! কেবল মাথা, মাথা, লক্ষ লক্ষ মানুষের মাথা—এপার ওপার মাইলের পর মাইল কেবল মানুষের মাথা ছাড়া আর এতটুকু মাটি দেখবার জো নেই। ঠাসাঠাসি পেষাপিষি। হঠাৎ মনে হয়, যেন দুনিয়ার সব লোকগুলোকে ভেড়ার মত নিলেমে চড়াবার জন্যে জড়ো করা হয়েছে। যেন মানুষের হরিহর ছত্তর। তারই মধ্যে মধ্যে আবার এক-একটা শোভাযাত্রার ঢেউ। "পান্ সিপাহীকে ঝাণ্ডা"—খুব সাজানো একটা হাতীর উপর একটা নিশানের গায়ে পাঁচটা সেপাই আঁকা; আর তার পিছনে হাতীর সারি। একে ওই চাপাচাপি, তার উপর হাতীর শোভাযাত্রা! মানুষ যে কেন হাতীগুলোর পায়ের তলে প'ড়ে মারা পড়ছে না ভাবলে অবাক হতে হয়। ভিড় ঠেলে রাস্তা বানাবার শিক্ষা হাতীর অদ্ভুত! তবু কত মানুষ যে জখম হচ্ছে তার অন্ত নেই। দু-দশ জন, যাদের ভাগ্য ওরই মধ্যে একটু সুপ্রসন্ন বেশি, তারা একেবারে বিনা প্রয়াসে, মোক্ষলাভ না ক'রেই স্বর্গে যাবার ব্যবস্থা ক'রে নিচ্ছে। দলে দলে গান গাইতে গাইতে চলেছে। কেল্লার পিছন থেকে কেল্লার পাশ দিয়ে দিয়ে একটা খুব ঢালু জমি হু-হু ক'রে একেবারে ত্রিবেণী-সঙ্গমের জলে গিয়ে নেমেছে। ওই ঢালু জমিটার কাছে এলে আর তোমার হাত-পা তোমার নয়। লোকের চাপে চাপে মাটিতে পা পড়বার বড়-একটা সময় পায় না। সেই অনন্ত লোকের স্রোতে গা ঢেলে দাও, তার পর হয় রুটিবেলা হতে হতে গিয়ে ত্রিবেণীতে পৌঁছাও, আর না-হয় মাঝপথেই কোথাও ব্যাঙ-চ্যাপটা হয়ে বিনি-ভাড়ায় ভবনদী পার হয়ে যাও।

শখ ক'রে আবার কেউ এখানে আসে? কিন্তু বাঙালী বাবুদের শখের অন্ত নেই। বেড়াতে যান না তাঁরা হেন ঠাঁই বোধ হয় ভূভারতে নেই। আজকাল আবার হয়েছে মেয়েছেলে না নিয়ে গেলে বেড়ানো হয় না।

একটি যুবক। বেশ বড়লোকের ছেলে ব'লেই মনে হয়। সঙ্গে একটি চাকর—তার বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু চমৎকার শরীর, বাঁধ যেন কোথাও আলগা হয় নি। সঙ্গের মেয়েটির বয়স সতেরো-আঠারোর বেশি মনে হয় না, তার কোলে একটি ছেলে। বাঙালীর মেয়েগুলো যেন কি! বাংলা দেশ ছেড়ে একবার বেরলেন তো বাস্ একেবারে ধিঙ্গি। না রইল তার ঘোমটা, না রইল হায়া লজ্জা। বোধ হয় স্ত্রীই হবে, বোঝবার তো জো নেই! আরে, তোদের হেথায় আসবার দরকার কি বাপু—তোরা কি ঠাকুর-দেবতা কিছু মানিস?

খোকা বললে, মা, উহঃ।

ওগো, চল না আর একটু এগিয়ে, খোকা হাতী দেখতে চাচ্ছে।

ওগো, না গো না, এই ভিড়ে আর এগোয় না। ওদিকে গেলে আর বাঁচতে হবে না।

পিছন থেকে আর একটা শোভাযাত্রার স্রোতের ধাক্কা এসে পৌঁছেছে তখন। যুবকটি দুই-এক পা এগিয়ে চাকরের বাঁ-হাতখানা চেপে ধরলে, স্ত্রীর হাত ধরাই ছিল। এই স্রোতের ঠেলায় যে কোথায় গিয়ে পড়তে হবে, একটু চেষ্টা ক'রে ফেরাই ভাল। যুবক মুখ ফেরাল। হায় রে নির্বোধ, এখন কি আর উলটো মুখে ফেরবার চেষ্টা করে? হৈ-হৈ, হৈ-হৈ ক'রে আর একটা স্রোতের ঠেলা—তারপর সব অন্ধকার। কে যে কোথায় ছটকে পড়ল, তার আর ঠিক পাওয়া গেল না।

যুবকটির বুদ্ধিশুদ্ধি যখন কতকটা ফিরে এল, তখন সে প্রাণপণে

সকলের নাম ধ'রে ডাকতে লাগল। কিন্তু কোথায় কে, কারও দিশা পাওয়া গেল না। পাগলের মত সে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি ক'রে কিছুই ক'রে উঠতে না পেরে শেষে হতাশের শেষ দুরাশা পুলিসে গিয়ে খবর দিলে। হঠাৎ তার মনে হ'ল, তাই তো আমি এখানে ছোটাছুটি ক'রে মরছি, আর-তারা হয়তো ভোলাদার সঙ্গে বাড়ি চ'লে গেছে। যেমনি মনে হওয়া অমনি দৌড়।

সমস্ত রাত একবার বাড়ি আর একবার গঙ্গার ধার ক'রে শুধু খোঁজাখুঁজিই সার হ'ল। রাত তখন প্রায় এগারোটা, পথে হঠাৎ এক জায়গায় ভোলানাথের সঙ্গে তার দেখা। দুজনেই প্রায় একসঙ্গে পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠল, বাবু, খোকাবাবু, বউমা ?

ভোলাদা, কমল ?

আবার দুজনে মিলে খোঁজ্ খোঁজ্ খোঁজ্—হায় রে, এ খোঁজার কবে অন্ত হবে কে জানে !

কেল্লার ধার ঘেঁষে একটা উঁচু জায়গা। তার উপর দুজন লোক দাঁড়িয়ে এই বিপুল জনতরঙ্গের তাণ্ডবলীলা দেখছিল। একজন বাঙালী, তার সূক্ষ্ম আদ্দির পাঞ্জাবির ভিতর দিয়ে লাল জাপানী গেঞ্জির আভা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মাথার ঢেউ-খেলানো তেড়ি থাকে-থাকে কেয়ারী করা। দ্বিতীয় ব্যক্তির কাপড়ও বাঙালী-ধাঁজে পরা ; কেবল গায়ে একটা ময়লা বুকখোলা ইংরেজী খাটো কোর্তা। হাতে একটা ডাণ্ডা। বেঁটে-খাটো মজবুত চেহারা। বসন্তের দাগে ডায়মণ্ড-কাটা কর্কশ মুখের উপর সর্বদাই একটা সরল হাসি পাহাড়ে দেশের উপর সকালবেলাকার রোদটির মত লেগে আছে। ওতেই তার ডালকুত্তার

মত মুখের ভাবখানা অনেকখানি অমায়িক ক'রে এনেছে। 'চৌকে'র একটি মৌতাতের দোকানে দুজনের আলাপ হয়েছে প্রথম—দিন-দুয়েক আগে। উপেন্দ্রনাথ তখন সবে একটু রঙ চড়িয়েছে, এমন সময় লোকটা এসে অত্যন্ত হৃদ্যতার সঙ্গে বললে, আদাপ অর্জ্। ক্যা আপ, বঙ্গালী হ্যাঁয় ?

গলার আওয়াজে উপেন্দ্রনাথ চমকে উঠে সংক্ষেপে বললে, হ্যাঁ।

লোকটি হঠাৎ উল্লাসিত হয়ে উঠে বললে, হামিও বঙ্গালী হচ্ছি। মাশার নাম ?

আজ্ঞে, উপেন্দ্রনাথ দত্ত। ব'লে তার ভাষা এবং হাবভাবের বৈচিত্র্যে অবাক হয়ে চেয়ে দেখলে। লোকটি নিজেই ব'লে যেতে লাগল, হামার নাম সারুধাপর্সাদ—পিছে ঘোস্ভি আছে। হামার বাপ কোই পচাস বরস্ আগে ইলাহাবাদ শ্কাফামোমে এসে তেজারতি কারবার খোলিয়েছিল। হামার বাপ বঙ্গালী হচ্ছে, লেকিন হামার মা হিন্দুস্থানী কাহারুনী। হামার একঠো ছোটে ভাই আছে, বড়ে ইল্মদার হচ্ছে। আদালৎমে লিখাপঢ়ার কাম করে। রোজগার বহোৎ। মাশা কি কাম করেন ?

আমার একটু জমিজমা আছে, কলকাতায় একটা বাড়িও আছে।

আহ্-হা, জিমিদার ?

এর পর দুজনে প্রায় গলায় গলায় হয়ে গেছে। দুই বন্ধু আজ স্নানের দিন দেখে মেলা দেখতে বেরিয়েছেন। সকালবেলায় গুলাবী ভাঙ এক এক গ্লাস চড়াবার পর বেশ একটু বেলওয়ারীগোছ নেশাও হয়েছে। হঠাৎ সারুধাপর্সাদ উচ্ছ্বসিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, আরে, দেখো ইয়ার, দেখো দেখো, এইসি খুবসুরৎ আওরৎ ময়নে কভি নেহি দেখা—

বন্ধুর নির্দেশ অনুসারে উপেন্দ্রনাথ চেয়ে দেখলে। যা দেখলে,

তাতে দস্তুরমত তার মাথা ঘুরে গেল। এত সুন্দর মানুষ হয়? তার গোলাপী চোখের সামনে সমস্ত জনতা যেন মিলিয়ে গিয়ে একটি মাত্র স্বপ্নমূর্তিতে এসে ঠেকল। খানিকক্ষণ হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকবার পর বন্ধুর খোঁচা খেয়ে তার চেতনা হ'ল।

আরে মাশা, এক বারগী যে বেহোঁস হয়ে পড়লেন, 'নজরা দিলবাহার এ বেনিয়া—এ নজরা আ-আ-আয় হায়'।—ব'লে অশ্লীল ভঙ্গিতে একটা চোখ বুজে সে একটা সুর ভাঁজতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। এতক্ষণে উপেন্দ্রনাথের নেশা সম্পূর্ণ ছুটে গেছে। বাঙালীর স্বভাবসিদ্ধ সতর্ক চতুরতা এবং উপস্থিত-বুদ্ধি খাটিয়ে সে বললে, ভাই, কিছু মনে ক'রো না, আমি এখনই আসছি।

সারদা চট ক'রে তার কাঁধে হাত দিয়ে চেপে ধ'রে বললে, সে হোবে না দাদা। তুমি একেলা মৌজ করবে, সে হোবে না।

দারুণ ঘৃণার ভাবে এক ঝটকায় কাঁধটা ছাড়িয়ে নিয়ে উপেন্দ্রনাথ বললে, কি বেলেল্লাপনা কর হে, মেড়োদের কি ভাইবোন জ্ঞান নেই?

সারদা ভারি অপ্রস্তুত হয়ে বললে, ওফ, আপনার ভ্যান্ হচ্ছেন? মাফ করো ভাই। এই ব'লে বেচারা সরল মানুষ, আর বার-দুয়েক গোপনে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ক্ষুণ্ণ মনে আস্তে আস্তে সেখান থেকে চ'লে গেল। যাবার সময় জিজ্ঞাসা করলে, সন্ধ্যাবেলায় দেখা হোবে তো?

আজ আর ভাই দেখা হবে না। মা আর বড়দাও বোধ হয় এসেছেন মনে হচ্ছে। আজ আর বোধ হয় বেরুতে পারব না।

নসিব!—ব'লে বেচারা কপালে হাত দিয়ে আর একটিবার কটাক্ষপাত ক'রে চ'লে গেল।

দেখুন, আপনি শীগগির এখান থেকে অন্য জায়গায় যান। এক

ব্যাটাকে তো অনেক ক'রে তাড়ালুম। কিন্তু এখানে থাকা 'সেফ,' মানে—নিরাপদ নয়।

একজন ভদ্রলোক দেখে কমলের ধড়ে যেন প্রাণ এল। সে কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললে, দয়া ক'রে এর বাবার একটু খোঁজ ক'রে দিন। আর আমাদের বুড়ো চাকর, তার নাম ভোলা। খুব লম্বা-চওড়া লোক, কাঁচা-পাকা চুল—কপালে একটা কাটার দাগ। মাত্র দু-তিন দিন হ'ল এসেছি আমরা, কিছুই চিনি না এখানকার। বড় বিপদে পড়েছি, একটু দয়া করুন।

সেই দুটি কাতর অশ্রু-সজল চোখ।

মন বলে, ছিঃ, অসহায়, তার সর্বনাশ ক'রো না। ওকে বাঁচাও। অমন দুটি চোখের কৃতজ্ঞতা অর্জন কর।

মতি বলে, চুলোয় যাক কৃতজ্ঞতা।

তার পরের ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্ত। সৎলোক সেজে অসহায়ের সর্বনাশ করা শক্ত নয়। অতি সহজেই মেয়েটিকে সে ভুলিয়ে একেবারে কলকাতার খাঁচার মধ্যে এনে পুরে ফেললে। তারপর—

প্রথম পর্বে অনুনয়-বিনয়; দ্বিতীয় পর্বে তর্জন-গর্জন; তৃতীয় পর্বে নিঃসঙ্কোচে অত্যাচার এবং নির্দয় প্রহার।

৮

এলাহাবাদে যমুনার পোলের থেকে ত্রিবেণীর দিকে খানিকটা এগিয়ে একটা ছোট বাড়ি। দেখলেই বোঝা যায় যে, বাড়িটায় অনেক দিন, কেউ বাস করে নি। একটি বাঙালী যুবক ছাদের উপর বসে যমুনার ওপারে নৈনীর মাঠের দিকে অন্যমনস্কভাবে চুপ ক'রে চেয়ে রয়েছে। চোখ তার বিষণ্ণতায় ম্লান; দেখলেই বোঝা যায় যে, কোন

দারুণ দুশ্চিন্তায় তার জীবনের সমস্ত সুখের উপর গভীর ছায়া বিস্তার করেছে।

একটি আধবুড়ো বাঙালী চাকর ধীরে ধীরে কাছে এসে দাঁড়াল, বললে, বাবু, চা কি এখানেই আনব?

বাবু কোন কথা না ব'লে শুধু তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। ভোলানাথ বুঝতে পারলে যে, বাবুর ধ্যান এখনও ভাঙে নি।

বাবু, চা তৈরি হয়েছে।

চা খাব না।

বাবু, অমনি ক'রে ভেবে ভেবে কি কূল করতে পারবে? খোঁজার তো কমতি হয় নি,—মা আমার বেঁচে থাকলে কি আর দেখা পেতে না বাবু? সে তো আমার চুপ ক'রে ব'সে থাকবার মেয়ে নয়। এবার ঘরে ফিরে চল; এমনি ক'রে শরীরটা পাত ক'রে তো কোন ফল নেই।

বাবু কিছু না ব'লে যেমন ব'সে ছিল, তেমনই চুপ ক'রে ব'সে রইল।

ভোলানাথের বয়স হয়েছে। দু-তিন পুরুষ থেকে তারা বল্লভপুরের জমিদার সিংহীবাবুদের নিমক খেয়ে মানুষ। রক্তের টানের চেয়ে তার প্রাণের টান একটুও কম নয়। তার খোকাবাবুর (অধুনা শুধু বাবু) দিকে তাকিয়ে তার মনে আর শান্তি ছিল না। অত বড় শরীরটা যেন ভেঙে পড়েছে। চোখের কোলে কালি, মুখে যেন রক্তের লেশ নেই। চেয়ে চেয়ে তার চোখ সজল হয়ে উঠল। সে আর কিছু না ব'লে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

আধ ঘণ্টাটাক পরে যখন সে খানকয়েক লুচি আর এক গ্লাস বরফ-দেওয়া ঘোলের শরবত নিয়ে ফিরে এল, তখনও বাবুর অবস্থার কোন বিশেষ পরিবর্তন হয় নি।

এইটুকু মুখে দিয়ে নাও বাবু।

ভৃত্যের মুখের দিকে ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে তার হাতের সাজ-সরঞ্জাম দেখে বাবুর মুখে একটু ম্লান হাসি ফুটে উঠল। এই নাছোড়বান্দা ভৃত্যটির হাত থেকে এড়াবার কোনও উপায় ছিল না। ঘোলের শরবতটা তার হাত থেকে নিয়ে বললে, ভোলাদা, তুই আর আমার সঙ্গে সঙ্গে কত ঘুরবি? তুই বাড়ি ফিরে যা। পিসিমাকে গিয়ে বলিস, আমি আরও কদিন ঘুরে-টুরে তার পর বাড়ি ফিরব।

ভোলানাথ আর কোনও জবাব দিলে না। শচীন্দ্রনাথকে বিদেশে একলা এই অবস্থায় ফেলে রেখে সে যে বাড়ি ফিরে যাবে, এমন পাত্রই সে নয়। তবুও সে বাবুর কথার কোনও উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রেই রইল। বার বার সদুপদেশ বর্ষণ করলে যে তার বাবুর দুঃখটাকে শুধু উজিয়ে তোলাই হবে, নিরক্ষর হ'লেও এ কথা তার বুঝতে দেরি হয় নি।

ছেলেবেলা থেকে শচীন্দ্রনাথকে সে কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ করেছে। আজ সেই শচীন্দ্রের এই দশা তার পক্ষে যে কত কষ্টের, সে তো আর মানুষকে ব'লে বোঝানো যায় না।

মা-ঠাকরুণ মারা গেলেন। শচীন্দ্র তখন ছোটটি। যাবার সময় মা শচীন্দ্রকে তো প্রায় এক রকম তারই হাতে সঁপে দিয়ে গিয়েছিলেন। তার পর কত অসুখ-বিসুখ, দেবতা-অপদেবতার হাত থেকে রক্ষা ক'রে তাকে এত বড়টি ক'রে তুলেছে সে। আজ শচীন্দ্র জমিদার, আর সে ভৃত্যমাত্র। কিন্তু একদিন তার ওই প্রকাণ্ড বুকটাই তার একমাত্র আশ্রয় ছিল। সেই শচীন্দ্র, ও তাকে ছেড়ে যাবে!

বছর-পাঁচেক আগে শচীন্দ্রের যেদিন বিবাহ হয়, সেদিনকার সমস্ত ছবি বৃদ্ধের মনে স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। জমিদারের একমাত্র ছেলের বিয়ে,—ধুমধাম, চেঁচামেচি, লোকলস্কর, বাজনাবাদ্যির অন্ত ছিল না।

বরকে সম্ভাষ করতে আর বড় দেরি নেই। এমন সময় দক্ষিণপাড়ার সিধু বাঁড়ুজ্জে একটা গোল তুললে। কন্যার পিতা গোরখপুরে সামান্য যা কাজ করতেন, তাতেই তাঁর স্ত্রী আর মেয়েটিকে নিয়ে এক রকম চ'লে যেত। গোরখপুরে মিশনরী স্কুলে মেয়েটি লেখাপড়া শিখছিল। অর্থ ও অবসরের অভাবে উপযুক্ত সময়ে মেয়েটির পাত্র জোটানো সম্ভব হয়ে ওঠে নি। তা ছাড়া পশ্চিমে অত সমাজের ভয়ও বড় ছিল না। এমনি ক'রে মেয়ে প্রায় পনরো বৎসরে পড়ল, আর রাখা যায় না— এবার দেশে গিয়ে একটা চেষ্টা-চরিত্র না করলে আর চলে না। ঠিক হ'ল, মেয়ের মামাকে চিঠি লেখা হবে, তিনি এসে মেয়েকে আর তার মাকে নিয়ে যাবেন।

চিঠি লেখা ও টাকা পাঠানো হয়েছে। আর দু-চার দিনের মধ্যেই মামা এসে নিয়ে যাবেন। গোছানো-গাছানো সব ঠিক। এমন সময় হঠাৎ সন্ধ্যাবেলা মায়ের খুব জ্বর এল। শহরে প্লেগ দেখা দিয়েছে—দুর্গাচরণ আর বিলম্ব না ক'রে ডাক্তারের বাড়ি ছুটলেন। ডাক্তার এসে জ্বরের রকম দেখে বড়ই ভয় পেয়ে গেল। যাই হোক, তার পরের ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্ত—মামা যখন এলেন, তখন দুর্গাচরণেরও খেয়া প্রায় ওপারের ঘাটে গিয়ে ঠেকেছে। বাপ-মাকে হারিয়ে কমলা মামার সঙ্গে কাঁদতে কাঁদতে মামার বাড়ি এল। পথের সম্বল রইল শুধু তার চোখের জল।

দেখতে দেখতে তার রূপ ও বিদ্যার খ্যাতি ও নিন্দা গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ল। শচীনের বাবা একটু স্বাধীনচেতা একরোখা মানুষ ছিলেন। নিজে মেয়ে দেখে তিনি বিনাপণেই মেয়ে নিতে রাজী হলেন।

বিয়ের আসরে সিধু বাঁড়ুজ্জে এই পিতৃমাতৃহীন বিদেশবাসিনী অনাথা কন্যাটির সম্বন্ধে কি যেন একটা শ্লেষোক্তি উচ্চারণ ক'রে সভার সামনে আপত্তি তোলবার চেষ্টায় ছিল। ভোলানাথ তার বিপুল শরীরখানা

নিয়ে চোট-খাওয়া বাঘের মত গিয়ে পড়ল তার ঘাড়ে। শচীন্দ্র উপস্থিত না থাকলে সেদিন যে একটা ব্রহ্মহত্যা হয়ে যেত—এ কথা প্রায় হলফ ক'রেই বলা যায়।

হায়! সবই হ'ল, আবার সবই গেল। আবার সেই প্রকাণ্ড অন্ধকার পুরীতে সে ফিরেই বা যায় কোন্ প্রাণে? শচীন্দ্রের পিতাও বছর দুই হ'ল স্বর্গে গিয়েছেন; কেই বা আর তার কথা তেমন ক'রে ভাববে? বৃদ্ধের চোখে জল এল।

বাবু, দুখানা অন্তত খাও।

চেষ্টায় নিজেকে সামলিয়ে ভোলানাথ আবার তার নিত্যকর্মে মন দিল।

সবই এক রকম সে স'য়ে নিয়েছিল, কেবল একটি কথা মনে করলে সে কিছুতেই যেন আর স্থির থাকতে পারত না। বছর তিনেক হ'ল শচীন্দ্রের একটি ছেলে হয়েছিল। ভোলানাথের উপর তার কথ্য অকথ্য নানা প্রকার অত্যাচারের সীমা ছিল না। তার সেই শিশু-প্রভুটির অসংখ্য স্মৃতিচিহ্ন তার মনের মধ্যে সমুজ্জ্বল হয়ে ছিল। তার কথা মনে হ'লেই তার মন একেবারে অস্থির হয়ে উঠত, তবু খোকার কথা সে প্রাণান্তেও শচীন্দ্রের কাছে তুলত না।

এমনি ক'রে তাদের দিনের পর দিন কেটে যায়—নিরুদ্দিষ্টার সন্ধানে। ক্রমে চার-পাঁচ মাস কেটে গেল। আশার রশ্মি ক্রমে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসতে লাগল; তবু খোঁজারও আর বিরাম নেই, ক্ষীণ আশার দীপটুকুও যেন কিছুতেই নিবতে চায় না।

অবশেষে ব্যর্থ অনুসন্ধানে হতাশ হয়ে, পরিচিত আবেষ্টন ও সহানুভূতির অত্যাচার থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে, সে বেরিয়ে পড়ল দীর্ঘভ্রমণ পরিকল্পনা নিয়ে ইউরোপের উদ্দেশ্যে।

৯

বছর তিনেক পরের কথা।

ফেনিসগঞ্জ একটা গ্রাম নয়। ইমারতের মধ্যে রঙ্গিণী নদীর উত্তর পারে একটা পুরাতন নীলকুঠি, আর তার চতুর্দিকে প্রকাণ্ড একটা আমবাগান। তা আমবাগান, কি সুন্দরবন এখন বোঝা শক্ত। নদী থেকে এই অট্টালিকায় যাবার পথ ওই বিরাট বনের মধ্যে একেবারে গা-ঢাকা দিয়েছে। দেউড়ির দরজার কতকটা অংশ নিজের বিপুল ভারে ভেঙে পড়েছে এবং চতুর্দিকে বনফুল, নোনা, কাঁটাঝোপে জড়াজড়ি ক'রে নদী থেকে বাড়ি পর্যন্ত সমস্তটা একটা ভয়াবহ জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। বাড়ির পুব দিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নীলের হাউস। তার ভিতরেও জঙ্গল গভীর। এতদিনকার, তবু কি আশ্চর্য গাঁথনি এই হাউসের, একখানি ইটও তার খ'সে যায় নি। জায়গায় জায়গায় জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে তার কতক অংশ চোখে পড়ে। চারিদিক এত নির্জন যে, খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলে নিজেকে জীবলোকের বাসিন্দা ব'লে মনে হয় না। মাঝে মাঝে বিশালকায় রবার, মেহগ্নি, সেগুন, শিশু প্রভৃতি গাছে সে বনের ছায়া নিবিড়তর ক'রে তুলেছে।

নদীর ঘাটের কাছে একটা ছোট মোটর-লঞ্চ বাঁধা। সেই লঞ্চে ব'সে ইংরেজবেশধারী একটি বাঙালী ভদ্রলোক, একটি বৃদ্ধা বিধবা ও একটি সুন্দরী তরুণী কথাবার্তা বলছিলেন।

বৃদ্ধা বলছেন, তোর যেমন পছন্দ বাছা, এই বনালা জায়গায় কি মনিষ্যি আসে! বাঘে খেয়ে ফেলবে যে!

বৃদ্ধা বড় মিথ্যে বলেন নি। শচীন্দ্র ও পার্বতী সকালবেলা নদীর কিনারা তদারক করতে গিয়ে তার কিছু পরিচয় পেয়ে এসেছিল।

নদীর পাড়ে কৃষ্ণচূড়ার গাছটা যেখানে জলের উপর নুয়ে পড়েছে, কোন কালে সেখানে হাউস পর্যন্ত জলসরবরাহের জন্য একটা কাটা খাল ছিল। এখন তার অনেকটা বুজে এসেছে। বর্ষার দিন ছাড়া সে খালে এখন আর জলস্রোত প্রবেশ করে না। সেই খালের মুখে যে বাঘে জল খেতে আসে, তার স্পষ্ট প্রমাণ কাদার উপর ছাপার অক্ষরে সে রেখে গেছে।

পার্বতী দেখিয়ে বললে, মিস্টার সিংহ, দেখেছেন? এখানকার বাসিন্দা যাঁরা, আর বেশি দূর এগনো তাঁরা ট্রেসপাস ব'লে গণ্য করবেন। শেষে কি মেচিওর করবার আগেই আপনার নারী-কল্যাণের অত বড় আইডিয়াটা বেঘোরে বাঘের মুখে মারা পড়বে?

শচীন বললে, ভয় কি? আমি একলা হ'লেও বা বাঘে সিংহে একটা বোঝাপড়া হতে পারত। কিন্তু একেবারে সিংহবাহিনীর সাক্ষাতে এতটা বেয়াদবি করতে বাবাজীর ভরসায় কুলোবে না; কি বল?

ইস, তাই বইকি! একেবারে ল্যাজটি মুখে পুরে গরুড়পক্ষীটির মত হাতজোড় ক'রে এসে প্রথমে পদচুম্বন করবে এবং পরে বোধ হয় সবিনয়ে মুখচুম্বনের অনুমতি চাইবে? যাই বলুন, আপনার চয়েসের তারিফ করতে হয়। কি চমৎকার জায়গাই বেছেছেন ভেবেচিন্তে! বাঘের পেটে সব কটা মেয়েকে একসঙ্গে যদি না-দিতে পারেন তো সাপের অভাব নেই বোধ হয়। তাও যদি পিতৃপুণ্যে কেউ রক্ষে পায় তো,—এই বলে সশব্দে একটা চাপড় মেরে পার্বতী ব'লে উঠল, বাব্বাঃ, ম্যালেরিয়ায় নির্যাত বাংলার নারী-নির্যাতনের সব প্রবলেম—(আবার চপেটাঘাত)—উঃ, সমস্ত হাত-পা একেবারে ফুলিয়ে দিয়েছে!

ইস, তাই তো! কুইনিন খেয়েছিলে তো সকালে উঠে? ওইটি

ভুলো না কিন্তু। তা যাই বল, এমন চমৎকার লোকালয়ের অন্তরালে, নির্জন নদীর ধারে এমন উপযুক্ত জায়গা আর কোথাও পাবে না-

হ্যাঁ, এমন বড় বড় মশা, এমন শ্বাপদসঙ্কুল বিস্তৃত বনভূমি, এমন নিবিড় কাঁটাঝোপ—

শচীন্দ্র হেসে বললে, কাঁটাঝোপই তো; সে কণ্টক উদ্ধার করবার জন্মেই তো এই আয়োজন।

ও, তাই বুঝি কাঁটা তোলার জন্মে আমাকে এই বাঘ-ভালুকের মুখে এনে—কাঁটা দিয়ে কাঁটা—

বাঘ-ভালুকরা মানুষের চেয়ে খারাপ নয় গো—তাদের দেখলে চেনা যায়। না না, ঠাট্টা নয়; তুমি দেখে নিও, এই কাঁটাঝোপই ইডেন গার্ডেন হয়ে উঠবে। তোমাকেই সব গ'ড়ে তুলতে হবে। ইউরোপে যা-কিছু দেখে বেড়িয়েছ, সবার সেরা। একেবারে সম্পূর্ণ নারী-প্রতিষ্ঠান—পুরুষের সম্পর্কশূন্য।

অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ডটি আমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে হালকা হয়ে স'রে পড়তে চান তো!

না না, স'রে পড়ার কোন কথাই হচ্ছে না। প্রথম দিকে আমরাই তো তোমাদের সব বিষয়েই সাহায্য করব। তবে সে সাহায্য দু-এক বছরের বেশি না করতে হয়, তার—

সেটি হচ্ছে না মশাই। যতটুকু সুতো ছাড়ব ততটুকু উড়তে পাবেন। যেই সুতো গোটাব, অমনি ফরফর ক'রে এসে উপস্থিত হবেন। তা নইলে জোয়ালটি ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আপনি স'রে পড়বেন, আর আমি কলুর চোখ-বাঁধা বলদের মত ঘানিগাছের চারি দিকে বে-ওজর পাক খেতে থাকব, তা হচ্ছে না মশাই।

আসলে এই নির্জন বনবাসে আবদ্ধ হয়ে কতকগুলি নির্বোধ অশিক্ষিত অবলার নিয়ত সঙ্গলাভের প্রসঙ্গ পার্বতীর মনে বিশেষ উৎসাহ

সঞ্চার করছিল না। শচীন্দ্রের এবং পার্বতীর কর্মপ্রেরণার উৎস এক নয়। শচীন্দ্রের বিরহ-বিধুর চিত্ত তার প্রিয়ার স্মৃতিকে সমুজ্জ্বল ক'রে রাখতে চায়; সুতরাং শচীন্দ্রের প্রেরণা তার অন্তরে। আর পার্বতী? শচীন্দ্র আনন্দলাভ করবে এই জন্যই তার উৎসাহ, সুতরাং যেখানে শচীন্দ্র অনুপস্থিত সেখানে তার পক্ষে কোন সরসতা নেই।

আমি তো আছিই। যখনই দরকার, সব কাজেই আমাকে পাবে। সব গুছিয়ে দেব। দেখবে তখন।

গোছানোর কথায় পার্বতী হো-হো ক'রে হেসে উঠল। বললে, হয়েছে। আপনাকে আর গুছিয়ে দিতে হবে না। যা না মুরদ তা আর জানতে আমার বাকি নেই। তবু আপনার অসুখের সময় লণ্ডনে আপনার ঘরে গিয়ে অবস্থাটা যদি না দেখতাম! উঃ, ঘর তো নয়, যেন ঘোষের বাথান! আমার মত পিটপিটে মানুষ কেমন ক'রে যে সেই ঘর নিজে হাতে সাফ করেছিলাম, তা ভাবলে নিজেই অবাক হয়ে যাই। ভাগ্যিস জ্বরে আপনি বেহুঁশ ছিলেন। নইলে সেই দিনই সেই মুহূর্তে বেরিয়ে গিয়ে টেম্‌স্ নদীতে গঙ্গাস্নান ক'রে বিদায় নিতাম। আপনার বুড়ী ল্যাণ্ডলেডী বাঙালী ব'লে নেহাত কাকুতিমিনতি করেছিল তাই। আর বাবা মারা যাবার পর কতদিন যে ঘর আর অফিস ছাড়া কারুর সঙ্গে মিশতাম না। বোধ হয় অনেক কাল কোন বাঙালীর সঙ্গে কথাই কই নি। তাই বোধ হয় একটু মায়া হয়ে থাকবে মনে মনে আমার—

শচীন্দ্র কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বললে, সত্যি, কি অসম্ভব কাজ করেছিলে! তুমি না থাকলে তো আমার বাঁচবারই কোন সম্ভাবনা ছিল না। সে রকম—

পার্বতী বাধা দিয়ে বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ, যে দেশে পার্বতী নেই, সে দেশে তো বিদেশী ছেলে বাঁচে না? ব'লে কথাটা উড়িয়ে দেবার অভিপ্রায়ে

সে প্রচুর হাসতে লাগল। এ হাসিতে তার লজ্জা ছিল, সুখ ছিল এবং বোধ করি দুঃখও ছিল, সে দুঃখ নিজের প্রতি পরিহাসের দুঃখ।

শচীন হাসিতে যোগ না দিয়ে বলতে লাগল, সে রকম অবস্থায় একটি অসহায় মেয়ে বিদেশে যে কি দুঃসাহসে ভর ক'রে এত বড় একটা ভার মাথা পেতে নিতে পারে আমি ভেবেই পাই নে।

দুঃসাহস আবার কি? প্রথমত লণ্ডন আমার বিদেশ নয়। তারপর বাবার মৃত্যুর সময় রোগীচর্যা থেকে রোজগার পর্যন্ত সবই করতে হ'ত। তা ছাড়া মানুষ দরকারে পড়লে কি যে না পারে তা এখনও বুঝে উঠতে পারি নি। বাবা যখন মারা যান, বয়স হিসাবে তখন আমাকে বালিকা বলাও চলে। মাত্র সতেরো বছর। কিন্তু পেরেছিলাম তো। কি নিদারুণ যন্ত্রণা ছিল তাঁর, তা এখন মনে করলেও হৃৎকম্প হয়। তার তুলনায় আপনারটা তো সহজই বলতে হবে। বিশেষত আপনার জ্ঞান ছিল না এবং আমার হাতে অর্থও ছিল তখন। তারপর যখন জ্ঞান হতে শুরু হ'ল, তখন কেমন ক'রে যেন সব সহজ হয়ে এসেছে। ব'লে, চুপ ক'রে লণ্ডনের তখনকার দিনগুলি তার মনের চিত্রপটে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠাতেই বোধ করি, সে মুখ ফিরিয়ে দূরে এক জায়গায়, যেখানে নদীটি ঘন বনের অন্তরাল থেকে হঠাৎ বের হয়ে বাঁক ফিরেছে, তারই সূর্যকিরণোজ্জ্বল চিক্কণতার দিকে চেয়ে রইল। সেদিনকার কথা তার কাছে এখন স্বপ্নের মত, অথচ কত স্পষ্ট! তার স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নেওয়া গুরুভারের মধ্যে সে কি উন্মাদনা, কি তীব্র উদ্বেগ, তবু তার মধ্যে কত মাধুর্য, চিত্তের স্ফুটনোন্মুখ ভাবগুলির কী তীব্রমধুর মন্থন! আর আজ! জীবনের সেই রসবন্যায় আজ নৈরাশ্যের ভাটার টান ধরেছে। আজ তার জীবন সমস্ত আনন্দময় পরিণতির আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত। অন্তরে অন্তরে অবসাদের পঙ্ক জমা হয়ে উঠেছে। নৌকায় আজ পালের বাতাসের দাক্ষিণ্য নেই, স্রোতের

আনুকূল্য নেই; যে তরণী সে বেয়ে চলেছে, তার সঙ্গে তার যোগ বিচ্ছিন্ন; সে তাকে ব'য়ে নিয়ে চলে না, টেনে নিয়ে তাকে জীবনপথে অগ্রসর হতে হয়, শুধু গুণ দিয়ে। তবু তো এই যোগসূত্রটুকুর মায়া সে কাটাতে পারে নি।

পার্বতীর মনের কথা শচীন্দ্রের কাছে নিতান্ত অগোচর ছিল না এবং তার মনের এই মেঘটুকু হালকা হাসির হাওয়ায় উড়িয়ে দেবার জন্যে বললে, করুণার তাড়নায় বুঝি আমার যা-কিছু কাগজপত্র, কাপড়, গেঞ্জি—মায় নতুন সুটটা পর্যন্ত ঝেঁটিয়ে বের ক'রে দিলে? মনে আছে, যখন প্রথম জ্ঞান হ'ল তখন কি রকম অবাক হয়ে গিয়েছিলাম তোমায় দেখে?

বিদেশে রোগশয্যায় শচীন্দ্রের কাছে সমস্ত জগতের মধ্যে যখন সে একমাত্র, তখনকার পরমানন্দময় দুঃখের বিচিত্র ছবি মনে মনে উপভোগ করায় পার্বতী যেন এক রকম নিরুপায়ের পরিতৃপ্তি লাভ করত।

শচীন্দ্রের প্রচেষ্টাটুকু তার বুঝতে বাকি রইল না এবং সলজ্জ প্রয়াসে নিজেকে সংযত ক'রে নিয়ে একটু হেসে বললে, আছে।

শচীন্দ্র যে সর্বপ্রথম কথাই বলেছিল 'খোকা কোথায়?'—এ কথা দুজনেরই মনে পড়ল। কিন্তু শচীন্দ্রের জীবনে তার মর্মান্তিক বেদনার কথাটিকে তারা দুজনেই এড়িয়ে গেল।

শচীন বললে, ভারি মুশকিলে প'ড়ে গিয়েছিলে, না?

মুশকিল না? আপনি কত প্রশ্নই যে করেছিলেন! একটারও তো উত্তর দেবার পুঁজি ছিল না। কত বানানো যায় বলুন তো?

তারপর?

তারপর দু-তিন দিন আবার একটু নির্বিঘ্নে কাটল, বোধ হয় কথা বলবার ক্ষমতা বেশি ছিল না কিংবা মাথাটাই পরিষ্কার হয় নি তখনও।

তারপর একদিন সকালবেলা মুখ ধোয়াতে গিয়ে দেখি, আপনি ওঠবার চেষ্টা করছেন। তাড়াতাড়ি ধ'রে শুইয়ে দিলুম। অনেকক্ষণ আমায় চেনবার চেষ্টা ক'রে বললেন, তুমি কে? মহা ফ্যাসাদে পড়লুম। নতুন যে বাসাটাতে আপনাকে অ্যাম্বুলেন্স ডেকে উঠিয়ে এনেছিলুম, জানেন তো সেখানে মিস্টার এবং মিসেস সিন্‌হা ব'লেই পরিচয় দিয়াছিলাম।

জানি, নইলে বোধ হয় সে ল্যাণ্ডলেডী জায়গাই দিত না।

হ্যাঁ। একদিন গল্প করতে করতে বলছিল যে, বিয়ে করবে ব'লে বেশি ভাড়া আগাম দিয়ে একটা ছোকরা আর একটা মেয়ে এসে উঠেছিল। তারপরে তাদের নিয়ে পুলিসের হাঙ্গামে পড়তে হয়। বলছিল, অবিবাহিত স্ত্রী-পুরুষকে আমরা সেই থেকে ভাড়া দেওয়া একেবারে বন্ধ ক'রে দিয়েছি।

বটে? তাই নাকি? তার পর?

একবার ভাবলুম, আমাদেরই সন্দেহ করছে বুঝি। তার পরে দেখলুম, না, তা নয়। হিন্দুদের ওসব সন্দেহ তারা বড়-একটা করে না। বলত, তোমাদের মত সকাল-সকাল বিয়ে হয়ে যাওয়াই ভাল। ওতে অন্তত সামাজিক দুর্নীতি অতটা প্রশ্রয় পায় না।

উঃ, কি দুঃসাহস তোমার! যদি ধরা পড়তে? কি ভয়ানক উদ্বেগের মধ্যেই না তোমাকে দিন কাটাতে হয়েছে!

হ্যাঁ, উদ্বেগ ছিল বটে, তবে ধরা পড়ার নয়। ডাক্তার আপনার প্রাণের আশঙ্কা করছিল। ব'লে সে চুপ ক'রে তার দৃষ্টিকে ফিরিয়ে অতীতের স্মৃতির মধ্যে নিয়ে গেল এবং গভীর কৃতজ্ঞতায় শচীন্দ্রনাথ নিঃশব্দে পার্বতীর একটা হাত নিজের দুটো হাতের মধ্যে সস্নেহে তুলে নিলে। এই সমাদরটুকুর স্নেহরসে পরিতৃপ্ত হয়ে পার্বতী একটু হেসে বললে, ধরা তো পড়ি নি। সে যাই হোক, এ দিকে বুড়ীকে এক রকম

চোখ-ঠার দিয়েছিলুম, কিন্তু আপনাকে কি বলি? বললুম, তোমার দিদি। চোখ মুখ কুঁচকে আপনি গেঙিয়ে গেঙিয়ে বললেন, নন্‌সেন্স, ইউ লুক ইয়ং এনাফ টু বি মাই ডটর। ভাবলুম, উঃ, ছেলেগুলো কি জ্যাঠা, মরতে ব'সেও পাকামো ছাড়ে না! কিন্তু— ওই দেখুন আপনার পেয়াদা এসে হাজির হয়েছে।

বলতে বলতে একটি দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ বৃদ্ধ এসে উপস্থিত হ'ল।

শচীন্দ্র বললে, কি ভোলাদা?

পিসীমা পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, বেলা হয়ে গেছে, রান্না জুড়িয়ে যাচ্ছে, চান-টান—

আচ্ছা আচ্ছা, যাচ্ছি—যাও, দশ মিনিটের মধ্যেই যাচ্ছি, পিসীমাকে গিয়ে বল।

ভোলানাথ চ'লে যাওয়ার পর পার্বতী বললে, শচীনবাবু, আপনার এই লোকটিকে কিন্তু আমি চাই। আপনার নারী-কল্যাণকে আপনি যে রকম বনবাস দেবার ব্যবস্থা করছেন, তাতে এমনি একটি 'লক্ষ্মণ-প্রহরী'র নিতান্তই প্রয়োজন। কি আশ্চর্য দেহের বাঁধন এই বয়সে; কোথাও যেন টোল খায় নি! পাকা চুল যেন ওর মাথায় পরচুলার মত মনে হয়। ভারি ভাল লেগেছে ওকে আমার।

১০

দুপুরে খেয়ে-দেয়ে পার্বতী বললে, চলুন শচীনবাবু, জালি-বোটটা নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসি। পিসিমাকে তো আর ডাঙায় নামানো যাবে না। এই লঞ্চের কোটরে ব'সে ব'সে তাঁর বোধ হয় কোমরে বাত ধ'রে গেল। চলুন, একটু বেয়ে ওই চড়াটায় যাওয়া যাক। চষা ক্ষেত-টেত দেখলে তিনিও একটু ধাতে আসবেন। ভারি চমৎকার

লাগছে জায়গাটা আমার। সমস্ত দিন কিছুতেই এই ইঁদুরের গর্তে ব'সে থাকতে পারব না।

শচীন বললে, আচ্ছা বেশ; মাল্লারা খাওয়া-দাওয়া সেরে নিক। আমি ততক্ষণ ভোলাদা আর বাহাদুর সিংকে নিয়ে বাড়ি আর জমিটা একটু তদারক ক'রে আসি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসব, তোমরা প্রস্তুত থেকো।

বেশ তো লোক! আমি হাঁ ক'রে ঘণ্টাখানেক এখানে ব'সে পানকৌড়িদের ডুবসাঁতার দেখব, না? সেটি হচ্ছে না। আমি হলাম নারী-প্রতিষ্ঠানের প্র-নেত্রী, আর আমি থাকব পিছনে প'ড়ে? যেতে হয় আমিও যাব। আমার ভবিষ্যৎ আস্তানা আমায় দেখে শুনে নিতে হবে না?

শচীন একটু মুশকিলে পড়ল। নদীর ধারে ধারে সকালে তারা যেটুকু বেড়িয়ে এসেছিল, তার মধ্যেও বিপদের আশঙ্কা ছিল বটে, তবু তত নয়। কিন্তু এই এত কালের পোড়ো বাড়ির মধ্যে এই সাপ বাঘের রাজ্যে কোন্ দিক দিয়ে যে কি বিপদ কখন হতে পারে তা বলা শক্ত। অজ্ঞাত বিপদের মধ্যে ওই বাড়িতে একটি স্ত্রীলোককে সঙ্গে ক'রে যাওয়া—হতেই পারে না। সে এক রকম বিব্রত হয়েই ব'লে উঠল, না, না, তোমাকে নিয়ে ওখানে যাওয়া যাবে না। ভারি মুশকিলে পড়া যাবে শেষকালে। কত রকম বিপদ হতে পারে, কিছু কি বলা যায়? তুমি থাক, আমরা খুব শীগগির ফিরে আসব। তারপর পার্বতীর মুখ ভার দেখে বললে, লক্ষীটি, অবুঝ হ'য়ো না; বুঝতেই তো পার—

পার্বতী কোন কথা বললে না। শুধু মুখটি ফিরিয়ে নিয়ে নদীর অন্য পারের ধু-ধু-করা চরের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে রইল। সে বুঝেই চুপ করলে, না, অভিমানে মন ভার ক'রে রইল, তা বোঝা গেল না।

মনিব এবং অনুচরদ্বয় রীতিমত পোশাক ক'রে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লঞ্চ থেকে নেমে গেল। যাবার সময় শচীন আবার পার্বতীকে একটু অনুনয়ের সুরেই বললে, রাগ ক'রো না লক্ষ্মীটি, ভারি বিশ্রী জায়গা। নইলে নিশ্চয়ই তোমায় সঙ্গে নিতাম।

পার্বতী বললে, যান না, আমি তো আপনাকে বারণ করি নি। ব'লে বোটের কামরায় চ'লে গেল। মিছে শুধু কথা-কাটাকাটি ক'রে ফল নেই দেখে শচীনও প্রস্তুত হয়ে অনুচর দুজন নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

নদীর ঘাট থেকে একটা ঢালু জমি বেয়ে অনেকখানি উপরে উঠতে হয়। বর্ষার জল দুর্দম স্রোতে সেই পথে নামে। স্রোতে ক্ষ'য়ে যাওয়ায় এবড়ো-খেবড়ো পথ প্রায় লোকচলাচলের অযোগ্য হয়ে ছিল। বহু কষ্টে সেইটুকু পার হয়ে তারা কুঠির সামনের বিস্তৃত জমিতে এসে উঠল একটা বিরাট বটগাছের তলায়। এই বটগাছের তলার জমিটুকুই যা একটু পরিষ্কার। তার পরই জঙ্গল, একেবারে দেউড়ি পর্যন্ত, মনে হয় যেন বাড়ির ভিতর পর্যন্তও।

সমস্ত প্রদেশটি জনহীন—পরিত্যক্ত। গাছের পাতায় প্রচ্ছন্ন ছোট ছোট পাখির কূজনে সেই জনহীনতা যেন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। এই কালো পুরু মখমলের মত স্তব্ধ অন্ধকারের পটে ছোট পাখিদের এই মৃদু কিচমিচ রূপালী শব্দে যেন ধ্বনির চুমকি বসানো চলেছে। বাড়ির দোতলার প্রায় সমস্তটাই এখান থেকে চোখে পড়ে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দরজা, তাদের সমস্ত খড়খড়িগুলি সম্পূর্ণ বন্ধ ক'রে কি যেন একটা গভীর রহস্যের ইতিহাসকে মানুষের কৌতূহলের প্রলুব্ধতা থেকে গোপনে রক্ষা করছে।

শচীন্দ্র খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক দেখে বললে, ভোলাদা, দেখ তো ঘাট পর্যন্ত নিশ্চয় কোন বাঁধানো পথ ছিল, একটু খুঁজলেই পাওয়া যাবে। এই ব'লে সে নিজেই প্রথমে এগিয়ে গেল পথের সন্ধানে।

বড় বড় বটের ঝুরি নেমে জায়গাটা অন্ধকার ক'রে রেখেছে। উপর দিকে চাইলে চাপ চাপ অন্ধকারের মাঝে মাঝে সামান্য সামান্য আকাশের টুকরো দেখা যায় মাত্র। সেই অবকাশপথ বেয়ে যে আলোটুকু নামে, তাতেই দুপুরবেলা গাছের তলার অন্ধকারটা অনেকখানি স্বচ্ছ দেখায়। তবু গাছের গুঁড়ির আশপাশের অন্ধকারগুলো যেন সব কিম্ভূত মূর্তি ধ'রে গুড়ি মেরে সুযোগের প্রতীক্ষায় নির্বাক নিশ্চল হয়ে আছে। নিঃশব্দে তারা চলেছে—শচীন্দ্র, ভোলানাথ, বাহাদুর সিং। ওর জুতোর আওয়াজটাও এই গাছের তলার ভিজে অন্ধকারে যেন একটা বেসুর কর্কশ স্পর্ধা। মনে হয়, স্তব্ধতার ছানারা এই হঠকারিতায় চকিত হয়ে অন্ধকার কোটর থেকে যেন উঁকি মেরে পরস্পর চোখ-ঠারাঠারি করছে আর বিরূপ বিস্ময়ে একেবারে নির্বাক হয়ে গেছে।

হঠাৎ ভোলানাথ বজ্রকণ্ঠে সমস্ত আতঙ্কের রাজ্যকে উচ্চকিত ক'রে ধমকে উঠল, এই ব্যাটা হনুমান! শচীন্দ্র চমকে পিছন ফিরে যা দেখল তাতে সে হাসবে, না, কাঁদবে, ঠাওর করতে পারল না।

গাছের গুঁড়ির কাছে অন্ধকারটা যেখানে একটু গাঢ়, সেখানে একটি বৃহৎ অজগর পরম নিশ্চিন্তে বসবাস করে। কোনো অজগর-শিশু তার লীলায়িত পুচ্ছটিকে বোধ করি বায়ুসেবনেরই উদ্দেশ্যে বাইরে প্রসারিত ক'রে দিয়ে থাকবে। বাহাদুর সিংএর রেখামাত্র নয়নপথে এই দৃশ্যটি গোচর হবামাত্র তার চিত্তে রসিকতা-প্রবৃত্তি একটু প্রবল হয়ে উঠল। এবং কোমর থেকে কুকরিটি বার ক'রে সে নিঃশব্দপদসঞ্চারে সেই দিকে অগ্রসর হতে লাগল। মতলব, অজগরের দুঃশাসিত পুচ্ছটিকে কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত করা। কৌতুক যে কি অপরূপ হবে—এই চিন্তা ক'রেই তার মণ্ডলাকার বদনপিণ্ড উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল।

ভোলানাথ বজ্রমুষ্টিতে বাহাদুর সিংএর ডান হাতখানা চেপে ধ'রে

ঝাঁকি দিয়ে গর্জন ক'রে উঠল, ব্যাটা হনুমান, নিজে মরবি, আর সকলকে মারবি? ব্যাটা মর্কট।

শচীন্দ্রনাথ ব্যাপারখানা ঠিক ঠাহর করতে পারে নি। একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, কি ভোলাদা, ব্যাপার কি?

ভোলানাথ বললে, ব্যাটাকে আজ যমে ধরেছে বাবু—

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে শচীন্দ্র রহস্য ক'রে বললে, তা তো দেখতে পাচ্ছি! কিন্তু হ'ল কি? ওর অপরাধটা কি হ'ল?

অপরাধ! ব্যাটা মরবার রাস্তা খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওই বেরৎ সাপের খপ্পরে পড়লে কি আর কারও রক্ষে ছিল? ব'লে আর এক ঝাঁকি দিল তার ঘাড় ধ'রে।

তখনও শচীন্দ্র ব্যাপারটা ঠিক আঁচ করতে না পেরে ব্যস্ত হয়ে বললে, আরে, কর কি ভোলাদা, ছাড়, ছাড়; পাহাড়ে লোক; তায় নতুন মানুষ, ওর কি কাণ্ডাকাণ্ডি জ্ঞান আছে? গোখরো সাপ বুঝি?

না বাবু, অজগরের ছাঁ। ওইখেনে ওই ঝোপে অজগরের বাসা আছে। সোঁদরবনে আমি অমন আরও দেখেছি। ভয়ানক জানোয়ার; বাঘে পার পায় না বাবু। আর ও ব্যাটা কিনা যায় তার ন্যাজে বাড়ি দিতে?

শচীন্দ্রনাথের একটু ভয়ই হ'ল মনে মনে। বললে, জন দুই লোক আর দুটো মশাল বেশি নিলে হ'ত।

না বাবু, সে ভয় নেই। না রাগলে, ওনারা মাটির মানুষ। তবে হ্যাঁ, ক্ষেপলে একেবারে সাক্ষেৎ যম।

শচীন্দ্র আর বেশি বাক্যব্যয় না ক'রে চারি দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগল। ভাবলে, এর চেয়ে নৌবিহারের প্রস্তাবটা নিতান্ত মন্দ ছিল না।

ভারবাহীর ঝাঁকি খেয়ে মনে মনে বৃদ্ধের বাহুবলের তারিফ করতে

করতে পিছনে পিছনে পোষা কুকুরটির মত চলতে লাগল। সম্প্রতি তার উপর দিয়ে যে কিছুমাত্র দুর্ঘটনা ঘ'টে গেছে, তার চিহ্নমাত্র তার ল্যাপা-পোঁছা মুখে খুঁজে পাবার জো নেই।

১১

বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর তারা ইঁট দিয়ে বাঁধানো পথের মত একটা কিছু বার করতে পারলে। কিন্তু জঙ্গল না কাটলে সে পথ দিয়ে এক পাও এগনো চলে না। অনেক পরিশ্রমে দা ও ভোজালির সাহায্যে একটু একটু ক'রে জঙ্গল সাফ ক'রে ক'রে তারা অগ্রসর হতে লাগল এবং গলদঘর্ম হয়ে অবশেষে সেই অট্টালিকার নীচে সিঁড়ির কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। চারি দিকে ঘোরানো বারান্দা। সেই বারান্দা দিয়ে গিয়ে এক কোণে দোতলায় যাবার সিঁড়ির দরজা। দরজা খোলাই ছিল। সাবধানী ভোলানাথ বললে, বাবু, এখানে মানুষের যাতায়াত আছে। এই ব'লে দরজার কাছে এগিয়ে গেল এবং হঠাৎ কি দেখে থেমে বললে, এই দেখুন বাবু, জুতোর দাগ।

শচীন্দ্র একটু চিন্তিত এবং অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে দেখলে, সত্যিই জুতোর দাগ। বড় ভারী কাদা-জল-মাথা জুতোর সদ্য চিহ্ন। শুধু তাই নয়। প্রকাণ্ড তালাটা না ভেঙে শিকলের হল্‌কাটা উপড়ে ফেলেছে। অদ্ভুত বটে! আর অধিক অগ্রসর হওয়া সমীচীন কি না—শচীন্দ্র মনে মনে সেই আলোচনা করতে লাগল।

এমন সময় অকস্মাৎ জনহীন বাড়িটার স্তব্ধ পঞ্জরতল বিদীর্ণ ক'রে একটা তীব্র আর্ত চীৎকার শব্দহীন জমাট আকাশটাকে ফেড়ে তাদের বুকের রক্তপ্রবাহকে আড়ষ্ট ক'রে দিয়ে গেল। শচীন্দ্র দু-তিন পা হ'টে এল। গুর্থাপুঙ্গব তো 'দেও দেও' ব'লে কাঁপতে কাঁপতে সেইখানেই জমি নিলে। ভোলানাথও চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ভাবতে

লাগল, ডাকটা কি জানোয়ারের! না, আর কিছু! সকলেই স্তম্ভিত; মুখে কারও রা-টি নেই। আওয়াজটা এত অতিমানুষিক যে, যে-লোকটা জুতো-সুদ্ধ উপরে গিয়েছে, তার কথা শচীন্দ্রনাথ চমক খেয়ে একেবারেই ভুলে গিয়েছিল।

রহস্য সহ্য করা ভোলানাথের ধাতে পোষায় না। সে এক রকম বিরক্ত হয়েই উঠেছিল।

শচীন্দ্রও কি করবে কিছুই ভেবে উঠতে পারছিল না।

এমন সময় আবার সেই চীৎকার। মনে হ'ল, যেন পৃথিবীর বক্ষ নিদারুণ যন্ত্রণায় দীর্ণ ক'রে এই বিলাপধ্বনি উঠছে।

ভোলানাথ বললে, এ মানুষের আওয়াজ বাবু, মেয়েমানুষের। আমি দেখি। ব'লে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না ক'রে সে দু-তিনটে ক'রে সিঁড়ি ডিঙিয়ে উঠে গেল। অগত্যা শচীন্দ্রও তার পিছু নিলে।

উপরে উঠে দেখলে, চারি দিকে চওড়া বারান্দা দিয়ে ঘেরা প্রকাণ্ড দালান। সামনের মাঠটা পেরিয়ে ঘন জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে নদীর জল দেখা যায়। ভোলানাথ জুতোর দাগ দেখে দেখে সাবধানে এগুতে লাগল। পিছনে শচীন্দ্র—হাতের বন্দুকটা বাগিয়ে ধরা। ভয়ে এবং বিস্ময়ে, সম্ভব এবং অসম্ভব উদ্ভট কল্পনায় তার মস্তিষ্কের মধ্যে চলচ্চিত্রের তাণ্ডব চলেছে যেন। একটা বারান্দার মোড় ফিরেই ভোলানাথ বললে, ওই যে বাবু।

একটা অদ্ভুত-পোশাক-পরা লোক একটা প্রকাণ্ড থামের প্রায় আড়ালে নদীর দিকে মুখ ক'রে রেলিঙের উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। শচীন্দ্রের মাথার মধ্যে কল্পনার ফিল্মটা কটাং ক'রে কেটে গেল, এবং ভয়ের ভোজবাজিটা অকস্মাৎ ছবির পরদা থেকে ছটকে এসে যেন গা ঘেঁষে নেমে পড়ল। সে প্রায় ভয়ার্ত রূঢ় কণ্ঠে হাঁক দিয়ে উঠল, কে? কে ওখানে? বল, নইলে—

'নইলে'র অপেক্ষা না ক'রে হঠাৎ মাথার টুপিটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রকাণ্ড একটা লম্বা কোট খুলতে খুলতে পার্বতী হি-হি ক'রে হেসে উঠল। উঃ, কি জবরদস্ত বীরপুরুষ আপনারা! এই বীরপনা নিয়ে আবার আমাকে মেয়েমানুষ ব'লে ফেলে আসা হয়েছিল! বীরত্বের উত্তেজনায় আজ আমারই দফা শেষ করেছিলেন আর কি!

নিরতিশয় বিস্ময়ে প্রায় নির্বোধের মত মুখ ক'রে শচীন্দ্র তার দিকে চেয়ে বললে, তুমি! অ্যাঁ! পার্বতী!

হ্যাঁ, পার্বতীই তো! সারপ্রাইজটা নিতান্তই জোলো হয়ে গেল, যাঃ! হুরী না, পরী না, রাক্ষকন্যে না, এমন কি বাঘ-ভাল্লুক পর্যন্ত নয়। ইস!

সত্যি! এলে কেমন ক'রে বল তো? কি দুঃসাহস তোমার! এলে কোথা দিয়ে?

এলাম উড়ে।

শচীন্দ্র বিস্ময়বিস্ফারিত প্রশংসমান চোখে তার দিকে চেয়ে তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে দেখতে লাগল। তার নিজের ভয়ের লজ্জা এবং পার্বতীর এই নারীদুর্লভ সাহসিকতা তাকে সত্যই অভিভূত করেছিল। বললে, উড়ে এলে এত আশ্চর্য হতাম না। তবু, আর যে কেমন ক'রে আসতে পার তাও তো জানি নে।

বলব কেন মশাই? একটু নজর করলেই দেখতে পেতেন যে পশ্চিমের আমবাগানটা নদীর উপর গিয়ে নেমেছে। তার তলাটা বেশ চলনসই পরিষ্কার। বোটটা নিয়ে একটু বেয়ে গিয়ে উঠে তার ভেতর দিয়ে বাড়ির দেউড়ির উল্টো দিকে কাঁঠালতলা দিয়ে এসে উঠলাম। উঃ, আর এক মিনিট দেরি হ'লেই আপনারা আমাকে নীচের তলায় ধ'রে ফেলেছিলেন আর কি! ভাগ্যিস সামনেই রেলিঙের একটা শিক প'ড়ে ছিল, তাই দিয়ে এক টানে শিকলের হলকাটা উপড়ে ফেলে

তাড়াতাড়ি উপরে উঠে এলাম। এসে মনে হ'ল, মশায়দের সাহসটা একটু পরখ ক'রে দেখা যাক। তা ভোলাদা না থাকলে বোধ হয় মশায় সিঁড়ির তলাতেই—; অ্যাঁ! কি বল ভোলাদা?

ভোলানাথ এতক্ষণ একটাও কথা বলতে পারে নি। এই মেয়েটির দুর্জয় সাহস ও বুদ্ধিতে তার সাদা বলিষ্ঠ মন প্রশংসায় ভরপুর হয়ে উঠেছিল। এখনও সে কোন কথা না ব'লে প্রাণ খুলে তার প্রকাণ্ড দরাজ গলায় হাঃ-হাঃ ক'রে হেসে উঠল—যেন তার মনের সমস্ত প্রশংসার উচ্ছ্বাস একটা বিরাট হাসিতে তর্জমা ক'রে দিলে।

শচীন্দ্রনাথের মনটাও প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তার নিজের ভীরুতায় তার লজ্জাও হচ্ছিল না কম।

শচীন্দ্র লজ্জা পেয়েছে দেখে পার্বতী বললে, ভাবছেন কি চুপ ক'রে, ভাবছেন তো যে—উঃ, মেয়েটা কি বেহায়া! বাংলা দেশে এমন মেয়ের স্থান হওয়া উচিত নয়—

শচীন বললে, না, ভাবছি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ক্যারদানি নিতান্তই বাজে গল্প; কিংবা বাঙালীর মেয়ের জুড়িদার মাথা বিলেতে নেই। নইলে—মানে—। ব'লে হাসতে লাগল।

নইলে কি? নইলে এ মেয়েটা জেলের বাইরে এখনও ছাড়া আছে কেমন ক'রে? তালাভাঙার কথা তো? তা, ধরা পড়বার ভয়ে ইন্‌স্‌টিংক্‌ট অব সেল্‌ফ-প্রিজার্‌ভেশন মানুষের আপনিই জাগে মশায়। এই ব'লে কথাটাকে চাপা দেবার জন্যে বললে, এই কোটটা ধর তো ভোলাদা, ওর পকেটে একটা কাগজে সন্দেশ আর ফ্লাস্কে শরবত আছে। একটু খেয়ে ঠাণ্ডা হোন। অন্তত মুখটা বন্ধ হোক।

এমন সময় দেখা গেল, বারান্দার দেয়ালের কোণ থেকে বাহাদুর সিং উঁকি মেরে দেখছে। দেখছে, হ'ল কি? এতক্ষণ নীচে ব'সে ব'সে সে নানা কাল্পনিক প্রেতিনীতত্ত্ব আলোচনা ক'রে ভয়ে এবং কল্পনায়

বিভীষিকার জাল বুনছিল, সব চেয়ে আগে চোখ পড়ল পার্বতীর। সে বললে, এস এস বাহাদুর সিং। তোমার আশ্চর্য সাহসে সকলের তাক লেগে গেছে। সরকার বাহাদুর টের পেলে তোমাকে পল্টনে নিয়ে গিয়ে কাপ্তেন বানিয়ে দেবে। বাহাদুর সিং খুব সপ্রতিভভাবে এগিয়ে এল এবং প্রথমে পার্বতীকে ও পরে ভোলানাথকে ফৌজী কায়দায় সেলাম ঠুকে বন্দুকটাকে নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে কুৎকুৎ ক'রে চাইতে লাগল। শচীন্দ্র যে আদৎ মনিব, তা সে যেন গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না। ভোলানাথ এই দেখে ভারি চ'টে গেল। রেগে বললে, বেরো ব্যাটা হনুমান এখান থেকে; বাঁদর-নাচ দেখাতে এসেছে! বেরো।

বাহাদুর আবার ফৌজী কায়দায় রীতিমত সেলাম ঠুকে, রাইট অ্যাবাউট টার্ন ও কুইক মার্চ ক'রে বারান্দার অন্য দিকে চ'লে গেল। ভোলানাথ বললে, বাবু, ঘরের দরজাগুলো খোলবার চেষ্টা করি। আপনারা বরং এখানে একটু অপিক্ষে করুন।

১২

ভোলানাথ চ'লে গেল। শচীন্দ্র আর পার্বতী দুজনে রেলিং ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ফ্লাস্কটা খুলে একটু শরবত খাবার জোগাড় করতে লাগল।

চারি দিকে চেয়ে পার্বতী বললে, মাগো, পায়রার অত্যাচারে বারান্দাগুলো হয়েছে দেখুন না! একটু বসবার জো নেই। এমন চমৎকার বারান্দা, কি নোংরাই করেছে, নইলে বোটে না থেকে এখানে থাকলে নেহাৎ মন্দ হ'ত না।

তোমার মতলবখানা কি? এইখানেই রাত কাটাতে চাও নাকি? বল, তা হ'লে না হয় ঘর-দোর সাফ করাই, কাঁথা-কম্বল আনাই।

পার্বতী বললে, মন্দ কি, দুই প্রহর আমি ঘুমুব, আপনি পাহারা

দেবেন, আর বাকি দুই প্রহর আপনি পাহারা দেবেন, আমি ঘুমুব। বেশ হবে, কেমন?

কৃত্রিম ভয়ে নয়ন বিস্ফারিত ক'রে শচীন বললে, তারপর 'কে জাগে' ব'লে যখন অন্ধকার থেকে খ্যাগা গলায় হাঁক পাড়বে, আর ইস্পাতের তলোয়ারের মত জিবটা খড়খড়ির ভিতর থেকে যখন ঝলসে উঠবে, তখন? ওরে বাবা, সে আমার বড্ড ভয় করবে, সে আমি পারব না। তার চেয়ে এক কাজ করা যাবে, আমরা দুজনেই দুজনকে পাহারা দেব, কি বল, আঁ্যা!

ঘুমিয়ে, না, জেগে?

যা প্রাণ চায় তোমার।

আমার প্রাণ চায় যে, আমি ঘুমুব, আপনি জাগবেন।

না, সে ভারি অন্যায় হবে। বরং এক কাজ করা যাবে—তুমি ঘুমুলে আমি জাগিয়ে দেব, আর আমি জেগে থাকলে তুমি ঘুম পাড়াবে; কেউ কাউকে খাতির করব না।

হুঁ! বুঝলুম। মানে, তলোয়ারের মত জিবটা আমার—

ক্ষুরের কাছে হার মানবে—ঠিক।

হ্যাঁ, আমার জিব ক্ষুরের মত, আর মশায়ের একেবারে মিছরির ছুরি। নিন, এখন চলুন, যাওয়া যাক। কেবল বাক্‌চাতুরী করলে তো কাজ হবে না? আর কোন কাজ নেই?

শচীন বললে, কাজ! আজও কাজ? আরম্ভটা এমন হয়েছে যে, আজ কাজের দিন ব'লে মনেই নিচ্ছে না। মনে হচ্ছে, আজ রূপকথার রূপকের রাজ্যে কল্পনার পক্ষিরাজে তুরুক সওয়ার হয়ে বেরিয়ে পড়ি। তেপান্তরে মাঠের পারে ঘুমন্তপুরীতে ফুলের মালা হাতে রাজকুমারী যেখানে একলা ব'সে আমারই প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে, সেখানে তার নিঃসাড় জাগরণের দ্বারে গিয়ে অতিথি হই। বলি, হে কন্যা, তোমার

প্রেমে তুমি আমার অন্তরের সুপ্ত দীপকে দীপ্ত কর। তোমার গোপন হৃদয়ের কমনীয় মণিদীপের মায়াস্পর্শে জেগে উঠুক আমার গভীর অন্ধকারের মধ্যে প্রাণের অনির্বাণ জ্যোতি। মেঘমুক্ত প্রভাতের স্বর্ণরশ্মি পড়ুক তোমার সদ্য সুপ্তোত্থিত আবিষ্ট চোখে। সেই আলোতে ঘুচে যাক আমার এই বিরহবিধুর চিত্তের তিমিরাবরণ। তোমার কণ্ঠের মুক্তার মালা— শুনতে শুনতে পার্বতীর সযত্নে-গোপন-করা বাসনামথিত প্রাণের গভীর বেদনা তার মুখের উপর প্রকাশ পেয়ে তার চোখ দুটিকে ব্যথিত ক'রে তুললে। তার মনে হ'ল, যেন তারই নিতান্ত গোপন এবং একান্ত পবিত্র প্রেমের প্রতি শচীন্দ্রের এ একটা হৃদয়হীন কৌতুক। এইটুকু কল্পনা ক'রে নিতান্ত-লীলাচ্ছলে-বলা শচীন্দ্রের কথাগুলো তার অন্তরের নিবিড় অনুভূতিকে যেন একটা নিষ্ঠুর অপমানের আঘাত করতে লাগল। অকস্মাৎ অধৈর্য হয়ে সে ব'লে উঠল, থামুন শচীনবাবু, থামুন। রূপকথার রূপকের রাজ্যে আপনার নিরাপদ অভিসারের কথা আমাকে না শোনালেও আপনার পৌরুষ অক্ষুণ্ণ থাকবে। মানুষের অন্তরের যা নিতান্তই পবিত্র, একান্তই যা তার একলার বস্তু, তাকে অপমান করবার নিষ্ঠুরতা থেকে মুক্তি দিলে আপনার বীরত্ব— বলতে বলতে আর কথা খুঁজে না পেয়েই বোধ হয় তার উত্তেজিত কণ্ঠ সহসা নির্বাক হ'ল।

শচীন্দ্র এই কৌতুকরসমণ্ডিত দ্বিপ্রহরের নির্জন ঔপন্যাসিক পরিবেশে উৎসাহিত হয়ে নিশ্চিন্ত লঘুচিত্তে আনন্দিত কলকণ্ঠে বাক্যের পর বাক্য রচনা ক'রে চলেছিল। পার্বতীর এই অভূতপূর্ব উত্তেজনার কারণ অকস্মাৎ তার অপ্রস্তুত মস্তিষ্কের মধ্যে অনুমান করতে না পেরে সে অবাক হ'ল এবং এক সময় ক্রমশ-কঠিন-ক'রে-তোলা তার স্নেহের সুরে অত্যন্ত আহত হয়ে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে শচীন বললে, পার্বতী, তুমি জান, ইচ্ছাপূর্বক তোমাকে কোনরূপ আঘাত করা আমার

পক্ষে একান্ত অসম্ভব। তোমাকে আমি অপমান করতে পারি, এত বড় অপদার্থ অকৃতজ্ঞ আমকে মনে করা তোমার পক্ষে সম্ভব হ'ল কেমন ক'রে? তুমি তো জান— বলতে বলতে থেমে নিজেকে একটু শান্ত ক'রে নিয়ে গভীর ব্যথিত কণ্ঠে সে আবার বললে, তুমি নিশ্চয় জান যে, সাধ্যপক্ষে তোমার দান গ্রহণ করার আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে পারি এমন নির্বোধ আমি নই। তবু যদি এমন হয়ে থাকে যে, তোমার মত মেয়েকেও আমার জীবণে গ্রহণ করা ঘটল না, তবে সে দুর্ভাগ্যের চেয়ে বড় দুঃখ আমার আর কি আছে? তা নিয়ে তুমি যদি আমায় শ্লেষ করতে চাও, কর। কিন্তু— ব'লে শচীন চুপ ক'রে গেল।

শচীন্দ্রের কথার সুরে যে হতাশার বেদনা ধ্বনিত হ'ল, পার্বতীর অভিমানে-আত্মবিস্মৃত চিত্ত তার আঘাতে চেতনা লাভ করলে। সে যে শচীন্দ্রকে কঠিন আঘাত করবে, পূর্বে ঠিক এ কথা পার্বতীর মনে হয় নি। কিন্তু তার প্রত্যাখ্যাত আত্মমর্যাদা বহু দিন অন্তরে অন্তরে তার ধৈর্যের বাঁধকে বোধ হয় ক্ষয় ক'রে এনেছিল, কিংবা শচীন্দ্রের কল্পনার মধ্যে তার প্রতীক্ষমান প্রেমের এমন অবিকল রূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল যে, সহসা পার্বতীর মনে হ'ল, যেন তার হৃদয়ের-রক্তে-লালিত প্রিয়তম গোপন কামনাটিকে শচীন্দ্র ইচ্ছা ক'রেই নির্লজ্জ আঘাত করেছে।

শচীন্দ্রের বেদনার সুরে সে সচেতন হয়ে নিজের অসংযমের জন্যে মনে মনে দুঃখ ও লজ্জা বোধ করতে লাগল। শচীন্দ্রের মুখের দিকে সে আর চাইতে পারলে না। সময়োচিত কোন কথা পার্বতী খুঁজে পেল না এবং কোন প্রকার ক্ষমা-প্রার্থনার কথা বলাকে তার প্রগল্‌ভতা ব'লেই মনে হ'ল। সে মাথা নিচু ক'রে, রোদবৃষ্টিতে-ক্ষ'য়ে-যাওয়া রেলিঙের ধারগুলি নখ দিয়ে ক্রমাগত খুঁটতে খুঁটতে তার আকণ্ঠ উদ্বেলিত অশ্রুরাশিকে প্রাণপণে ফেরাতে চেষ্টা করতে লাগল।

বহু দিনের বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে বিদেশে তাদের জীবন এমন একটি সমাজশাসনশূন্য অতীতের মাঝখানে কেটেছে যে, সে কথা বাংলা দেশে প্রচারিত হ'লে সমস্ত বাংলা দেশের মধ্যে একদিনে তারা বিশ্রুত হয়ে উঠত। দুটি অভুক্ত নরনারী পরস্পরের নিকট নিজেদের অন্তরাত্মাকে সম্পূর্ণ নিরাবরণ ক'রে উদ্ঘাটিত ক'রে দেবার অজস্র অবসর পেয়েছে। কত নির্জন বনচ্ছায়াকীর্ণ উপত্যকায়, কত নদীতটে, পর্বতগুহায় তারা যে পরস্পরের নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গলাভে পরস্পরকে সহজ আনন্দে পরম সম্পদ-রূপে অনুভব করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু শচীন্দ্র তার হারানো-পত্নীর স্মৃতিভারে তখন অনন্যচিত্ত। তাকেই স্মরণ ক'রে বস্তুত তার এই নারীকল্যাণের উদ্যম। এবং সেই উদ্দেশ্যেই তারা দুজনে ইউরোপে নানা নারী-প্রতিষ্ঠান দেখে বেড়িয়াছে। পার্বতীর সঙ্গলাভে তার ক্ষুব্ধ উন্মন চিত্ত যেন একটা পরমাশ্রয় লাভ করেছিল। তবু তখনও সে আশ্রয় পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দুর মত চঞ্চল; বাতাসের লীলায় যখন খুশি সে খ'সে পড়তে পারে।

পরিণতযৌবনা পার্বতীর চিত্ত তখন অপরিসীম তৃষ্ণায় মুখর। মায়ের মত সেবা, বোনের ভালবাসা, বন্ধুর প্রীতি সে তাকে তার সমস্ত চিত্ত উজাড় ক'রে দান করেছে; প্রতিদানে সেও শচীন্দ্রের কাছ থেকে অকপট প্রীতি এবং নির্বিরোধ বন্ধুত্বের অজস্র আত্মনিবেদন লাভ করেছে। কিন্তু তার এই দুরন্ত যৌবন-বিদাহী দীপ্যমান প্রেমের অজস্রতার কাছে সে কতটুকুই বা! সম্পূর্ণ বুঝতে হ'লে পার্বতীর পূর্বতন ইতিহাস একটু আলোচনা করা আবশ্যক।

১৩

বাইরের দিক থেকে পার্বতী নিজেকে অনেকখানি সংযত ক'রে এনেছিল; প্রথমত তার মজ্জাগত বিলাতী শিক্ষার শাসনগুণে, দ্বিতীয়ত

তার স্বাভাবিক আত্মমর্যাদা, প্রত্যাখ্যানকে উচ্ছ্বাসের নাটকীয়তায় পরিণত হতে দেয় নি ব'লে এবং তৃতীয়ত শচীন্দ্রের ইতিহাস এখন তার কাছে আর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল না। অবশ্য, একদিন ছিল যখন পার্বতীর নবোৎসারিত দুর্জয় প্রেম প্রবল বন্যায় তার শিক্ষা, তার অভিমান সব ভাসিয়ে দেবার উপক্রম করেছিল। দোষও তার বড় ছিল না। শচীন্দ্রকে সে প্রথম দেখে প্রবল জ্বরে সংজ্ঞাশূন্য অসহায় অবস্থায়। সুতরাং লজ্জা, সঙ্কোচ এবং শিক্ষিত জনের প্রথম পরিচয়ের আত্মরক্ষণশীলতাকে তার দরজার বাইরেই ফেলে রেখে আসতে হয়েছিল। সে কথা বস্তুত তখন তার মনে রাখবার অবস্থাও ছিল না। শচীন্দ্রের জীবনের মর্মঘাতী দুঃখের ইতিহাস ছিল তার কাছে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। সুতরাং তার নিজের নিরাশ্রয় তরুণ হৃদয়ের প্রথম প্রেমের কূলপ্লাবী উচ্ছ্বাসের আবেগে সে কোন কথা স্থিরভাবে চিন্তা করবার অবসর পায় নি। তাই আজ সে অবাক হয়ে ভাবে, কোথায় ছিল শচীন্দ্রনাথ—ভারতবর্ষ থেকে আগত পত্নীবিরহবিধুর শান্তিসান্ত্বনা-প্রয়াসী এক উদ্‌ভ্রান্ত যুবক, লণ্ডনে অপরিচিত বিদেশীর ঘরে এসে কেনই বা এমন অসুস্থ অসহায় হয়ে পড়ল? আর কোথায় ছিল পার্বতী—বিদেশে বান্ধবহীনা চাকুরিজীবী একটি বাঙালীর মেয়ে? কি অভাবনীয় উপায়েই না পরস্পর পরস্পরের কাছে পরিচিত হ'ল! কি আবশ্যক ছিল এই পরিচয়ের, যদি না তার অন্তরাত্মা পূর্ণতা ও শান্তির আশ্রয় লাভ করতে পারল দৈবদেয় এই অপূর্ব দানের দাক্ষিণ্যে?

লণ্ডনে সেবার ভয়ানক শীত পড়েছে। আপিসের মধ্যে ব'সেও কাজ করা দুরূহ হয়ে উঠেছে। ইডিথ এসে পার্বতীকে বললে, দেখ, বড় মুশকিলে পড়েছি আমরা। আজ কয়েক দিন হ'ল একটি ভারতবর্ষীয় যুবক এসে আমাদের বাড়িতে, নামডু যে-ঘরগুলোয় ছিল, সেই ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়েছে। জাহাজ থেকেই অসুখ নিয়ে এসেছিল বোধ হয়।

আজ দু দিন হ'ল একেবারে জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়েছে। তার সঙ্গে আমাদের ভাল ক'রে আলাপই হয় নি, এমন কোন ঠিকানা তার কাছে পাচ্ছি না, যাতে কাউকে 'তার' ক'রে একটা খবর দিতে পারি। মা তো খুবই ভয় পেয়েছে। তুমি কি গিয়ে একবার দেখবে? ভারতীয় ছেলে ব'লেই তোমাকে এই অনুরোধ করছি। কিছু যদি মনে না কর তবে মা'র অনুরোধ—তুমি অনুগ্রহ ক'রে একবার আমাদের বাড়ি যেও।

ইডিথ পার্বতীদের আপিসেই কাজ করে। তার অমায়িক সরল ব্যবহারে সে পার্বতীর বন্ধুতা অর্জন করেছিল। এর পূর্বেও ইডিথের মার কাছে পার্বতী দু-একবার গিয়েছে। তবে পার্বতী নিজের বিপর্যস্ত ভাগ্য নিয়ে নিজের মধ্যে আবৃত থাকতেই চাইত। তবু নিতান্ত দরিদ্র এই মেয়েটি এবং তার মার সঙ্গে তার পরিচয় অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। তা ছাড়া বিরাট লণ্ডনের জনসমুদ্রের কোলাহলময় নির্জনতার অতলে সে নিজেকে সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্নই রেখেছিল। পার্বতী নিজে সহজে কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে পারত না। কারণও ছিল তার।

১৪

পার্বতীর বাবা ভূপতিনাথ রায় ছিলেন একটু ফিরিঙ্গী-ভাবাপন্ন —ছেলেবেলা থেকেই। সেণ্ট জেভিয়ার্সে পড়াশুনা করেছিলেন এবং তাঁর চিরদিনের বাসনা ছিল বিলাতে গিয়ে বসবাস করা। ভারতবর্ষের কিছুই তাঁর মতে মনুষ্যজনোচিত ছিল না। পিতার অনুমতিও পেলেন। এমন সময় বিলেত যাবার আগেই তাঁর বাবা গেলেন মারা। এবং মারা যাবার পূর্বেই তিনি তাঁর পুত্রের বিদেশে চরিত্রবান থাকবার অব্যর্থ কবচ একটি পত্নীকে তার কণ্ঠলগ্ন ক'রে দিয়ে গেলেন। তখনকার মত তাঁর বিলেতযাত্রায় যবনিকা পড়ল। কিন্তু যাদৃশী ভাবনা যস্য,—

কিছুদিন, অর্থাৎ বছর-পাঁচেক যেতে-না-যেতেই যমরাজের বিশেষ কৃপাদৃষ্টিতে, দুরন্ত কলেরা রোগে তাঁর দুই শ্যালক ইহলোকে ভূপতি এবং তার শ্বশুরমহাশয়ের বিরাট লোহার সিন্দুকের মধ্যের ব্যবধানটুকু লুপ্ত ক'রে দিয়ে, বোধ করি, ভগ্নীপতির আন্তরিক আশীর্বাদের খেয়া-নৌকায় পরলোকের ঘাট-সই ক'রে পাড়ি দিল। যে কদিন এর পর বেঁচে ছিলেন, ভূপতির শ্বশুরমহাশয় জামাইকে ও মেয়েকে তাঁর কাছ-ছাড়া করেন নি। তার পর একদিন ভূপতি ও পার্বতীর মাকে তাঁর ঘরসংসার, লোহার সিন্দুক এবং চাবির তাড়া সমর্পণ ক'রে দিয়ে তিনিও বিদায় নিলেন। পার্বতীর বয়স তখন চার বছর মাত্র।

এর পর তার বাবা পড়লেন তার শিক্ষা নিয়ে। কখনও ভুলেও তার সঙ্গে বাংলায় কথা কইতেন না—একটু বড় হ'লেই লরেটোতে ভরতি ক'রে দিলেন এবং সর্বপ্রকারে যাতে নেটিব-গন্ধবিবর্জিত শিক্ষা পায়, তার জন্যে চারি দিকের শুচিতা বাঁচিয়ে তাকে খাঁটি ফিরিঙ্গী বানাবার অসাধ্য-সাধনে প্রাণপাত করতে লাগলেন।

পার্বতীর মা ছিলেন অতি নিরীহ-মানুষ; তাতে তাঁর বয়সও বেশি ছিল না। স্বামীর প্রভুত্বের কাছে বরাবরই তাঁকে হার মানতে হয়েছে। তবু তিনি প্রাণপণে স্বামীর অগোচরে নিজের সাধ্যমত তাকে গৃহকর্ম এবং বাংলা দেশ ও ভাষার প্রতি অনুরক্ত হতে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন দুর্বল, তাঁর চেষ্টাও ছিল নিতান্ত সীমাবদ্ধ; তার উপর কোনদিন ভূপতি এসব জানতে পারলে অশেষ লাঞ্ছনা না দিয়ে তাঁকে নিষ্কৃতি দিতেন না। একটু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পার্বতী মায়ের অসহায় ভাবখানা বেশ উপলব্ধি করতে পারল, এবং ধীরে ধীরে নিজের অজ্ঞাতেই সে ক্রমে মায়ের ইচ্ছাগুলিকে পিতার অগোচরে পালন ক'রে শেষের দু-এক বছর মার ক্ষুব্ধ চিত্তে যে শান্তি ও

তৃপ্তি দান সে করতে পেরেছিল, উত্তরকালে মায়ের স্বল্পাবশিষ্ট স্মৃতি-ভাণ্ডারে ওইটুকুই ছিল তার সান্ত্বনার কথা।

পার্বতীর মা যখন মারা যান, পার্বতী তখন নিতান্ত বালিকা। বয়স মাত্র তেরো বৎসর। কন্যার জুনিয়ার কেমব্রিজ পরীক্ষা পাসের সংবাদ জেনে যাবার অবসর আর তাঁর হ'ল না। তারপর ভূপতি বেশিদিন আর দেশে বাস করেন নি। টাকাকড়ি যা ছিল, সব গুটিয়ে মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর চিরবাঞ্ছিত স্বর্গধাম বিলেত অভিমুখে রওনা হলেন।

এখানে বছর-দুয়েক খুব আরামেই কেটেছিল। পড়াশুনা নিয়ে ও লাইব্রেরি মিউজিয়ম এবং নানা দেশ দেখে বেড়িয়ে দুটো বছর যে কোথা দিয়ে বেরিয়ে গেল, নূতনত্বের আকর্ষণে আর পড়াশুনোর চাপে পার্বতীর তরুণ চিত্ত তার সন্ধানই করে নি।

এখানে এসেও ভূপতি যথারীতি তাঁর স্বদেশবাসীদের এড়িয়েই চলতেন। পার্বতীর মন মাঝে মাঝে ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠত। ভূপতিকে বলত, বাবা, এখানে তো অনেক বাঙালী ভদ্রলোক আছেন। তোমার কি কারুর সঙ্গেই চেনা নেই? নেমন্তন্ন কর না দু-এক জনকে। নিজের হাতে ডাল-ভাত রেঁধে খাওয়াই, আমার ভারি ইচ্ছে করে।

ভূপতি হেসে বলতেন, আরে পাগলী, যদি এখানে এসেও বাঙালীদের খুঁজে-পেতে আলাপ করতে হয়, তা হ'লে বাংলা দেশটা কি দোষ করেছিল? এত খরচপত্র ক'রে কি বাঙালীদের সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে সাতসমুদ্র পেরিয়ে এলুম? আর এই ঠাণ্ডা দেশে কি ভাত খায় রে পাগলী! নিউমোনিয়া ধরবে যে; ইচ্ছে হয়, বরং একটু সাগুর পুডিং ক'রে আজ খাস। জানিস তো ধান জলাভূমির শস্য, খেলে একেবারে প্লুরিসি, নিউমোনিয়া, হাইড্রোফোবিয়া, যা খুশি হতে পারে—সর্বনাশ! ব'লে কৃত্রিম ভয়ে চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে তুলতেন।

তার বাবার বলার ভঙ্গীতে তার ভয়ানক হাসি পেয়ে যেত।

হি-হি ক'রে হাসতে হাসতে সে বলত, তোমার যে রকম জলের আতঙ্ক দেখছি, শীগগির ডাক্তারকে ডাক। বাংলা দেশে এতদিন কাটানোর দরুন তোমার ইতিমধ্যেই হাইড্রোফোবিয়ার বীজ শরীরে ঢুকেছে কি না পরীক্ষা করা দরকার।

মোট কথা, পার্বতীর পিছনের টান বড়-একটা ছিল না। ছেলেবেলা থেকে মা বাবা ছাড়া অন্য আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বেশি আলাপ করার তার সুযোগ হয় নি। আর চিরকাল সে কলকাতায় মানুষ; সুতরাং বাংলা দেশের বিস্তীর্ণ নদনদী-জলাকীর্ণ বিরাট ব্যাপ্ত প্রকৃতি, ঘনচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন শান্তশ্রী গ্রাম্য-প্রকৃতি বা উচ্ছ্বসিত স্নেহব্যাকুল বাঙালীর মানব-প্রকৃতি তার চিত্তকে গভীরভাবে আকর্ষণ করবার কোন অবকাশ পায় নি। সেইজন্যে বিদেশে যাওয়া তার পক্ষে প্রবাসে যাওয়া ছিল না, এবং দেশের মাটি পরিত্যাগ ক'রে সমুদ্রে যেদিন সে প্রথম ঢেউয়ের দোলায় তার রক্তপ্রবাহে ধরণীর হৃৎস্পন্দন স্পষ্ট অনুভব করেছিল, সেদিন অতিমাত্র বিরহ-ব্যাকুলতায় তার চিত্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে নি। তার দ্রুতধাবনরত কলহাস্যমুখরিত চঞ্চলতার মধ্যে পরিত্যক্ত পরিজনের সজলবেদনার ছায়াপাত হবার সম্ভাবনা ছিল না।

এমনি ক'রে পিতাপুত্রীতে নূতন নূতন দর্শনীয় ও আহরণীয়ের মাদকতায় মশগুল হয়ে বছর-দুয়েক বেশ এক রকম কাটিয়ে দিলে। তারপরই এল তাদের জীবনে বিপর্যয়ের দুরতিক্রম্য দুঃখের ইতিহাস।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, ইদানীং ভূপতিনাথ একটি অনুচ্চ শ্রেণীর ইংরেজ-রমণীর সঙ্গে এমনভাবে মিশতে আরম্ভ করেছিলেন, যাতে ঘরে কন্যার ও প্রতিষ্ঠিত গৃহব্যবস্থার মধ্যে বিরোধ ও বিপর্যয় না এনে তাঁর উপায় ছিল না। প্রথম প্রথম ব্যাপারটা তিনি যথেষ্ট গোপনে রেখেছিলেন। কিন্তু এ নেশায় যাকে ধ'রে, তাল সামলানো তার পক্ষে দুষ্কর হয়ে উঠে। পরে ব্যাপারটা কিছু আর চাপা রইল না। মদ

খাওয়া তাঁর অত্যন্ত বেড়ে গেল। রাত্রে বাড়ি আসা প্রায় বন্ধ হয়ে এল এবং একদা গভীর নিশীথে সেই ইংরেজ-নন্দিনীকে নিয়ে তিনি এসে উঠলেন একেবারে [illegible] কন্যার নিরবলম্বপ্রায় ঘরকরনার অন্তঃপুরে। অতি শোচনীয় হয়ে উঠল জীবনযাত্রা। ক্লারা তার জীবনে অর্থের মুখ বড় একটা দেখে নি। একেবারে এতগুলি অর্থের অধিকারিণী হয়ে ব্যয় এবং অপব্যয়ের মাত্রা রক্ষা করা তার পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠল।

এমনই ক'রে তাদের সংসারে ক্রমে অর্থেরও অনটন ঘ'টে উঠতে লাগল। অত্যধিক অত্যাচারে ভূপতিনাথের শরীর ভেঙে আসছিল। উপরি কিছু আয় করবার ইচ্ছা বা শক্তিতে তখন তাঁর ভাটার টান লেগেছে। পার্ব্বতী গোপনে চেষ্টা ক'রে অল্প বেতনের একটি শিক্ষয়িত্রীর পদ সংগ্রহ করেছিল। কিন্তু এই ভাঙন-ধরা সংসারে সে কতটুকুই বা!

এমনি দুর্দশার অবস্থায় একদিন ডাক্তারে আবিষ্কার করলে যে, তার পিতা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। ক্লারা আর বেশি দিন অপেক্ষা করে নি। একদিন সকলের অজ্ঞাতে সে তার গহনাপত্র ও পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে উধাও হ'ল। দুর্দিনে পার্বতীর ছিল এই একটি-মাত্র সান্ত্বনা। এর পরের ইতিহাস বেশি নয়। নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ ক'রে ভূপতি একদিন অনুতপ্ত চিত্তে তাঁর কন্যার কাছে ক্ষমাভিক্ষা ক'রে ইহসংসার থেকে মুক্তিলাভ করলেন। বিদেশে বন্ধুজনহীন কপর্দকশূন্য হয়ে সে সংসার-সমুদ্রে পাড়ি দিলে।

পিতার ইংরেজ-প্রীতির পরিণামে ইংরেজ জাতিটার উপরেই তার যেন একটা বিতৃষ্ণা জন্মে গিয়েছিল। সে পারতপক্ষে কোন লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করত না। আপিসের কাজ সে মন দিয়ে করত এবং অবসর সময়ে লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়াশুনা ক'রে সময় কাটাত। বছরখানেক হ'ল সে একটা বড় ফার্মে ভাল কাজ পেয়েছিল।

এইখানেই ইডিথ ছিল তার একজন অ্যাসিস্টাণ্ট। ইডিথের অনুরোধে সে তাদের বাড়ি গিয়ে যা দেখলে, তাতে আর সে স্থির থাকতে পারলে না। অন্তরের অন্তস্তলে চিত্ত তার মায়ের প্রিয় বাংলা ভাষা ও বাঙালীর জন্য তৃষিতই ছিল বোধ করি। লাইব্রেরিতে তার প্রধান পাঠ্য ছিল বাংলা। আর আজ বাঙালী একটি চারুদর্শন অসহায় রোগবিমূঢ় যুবককে দেখে তার সেবাপরায়ণ হৃদয় মুহূর্তে উদ্বেল হয়ে উঠল। সে স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দচিত্তে তার সমস্ত ভার আপনার দুর্বল স্কন্ধে তুলে নিলে এবং পরদিনই বিশেষ অনুসন্ধানে নূতন একটি সুয়েট ভাড়া ক'রে তাকে স্বামী ব'লে পরিচয় দিয়ে, অ্যাম্বুলেন্স্ ডেকে শচীনকে সেখানে নিয়ে গেল।

দিনের পর দিন সে প্রায় একাকী এই দুরন্ত রোগের পরিচর্যায় নিজের সমস্ত সঞ্চিত বিত্ত ও অনন্যসাধারণ স্বাস্থ্য ও নৈপুণ্য নিযুক্ত করেছে। তবু এই অসহায় সংগ্রামের সে কি অনির্বচনীয় আনন্দ! মৃতদেহে নবতর প্রাণসৃষ্টির অপরিমেয় আত্মপ্রসাদ! শুধু কি তাই? তার এই বিধাতৃত্বের অন্তরালে তার চিত্ত কি অভূতপূর্ব কোনও অভিনব চেতনায়, কোনও নবতর উষার অরুণালোকের রসমাধুর্য ধারায় প্লাবিত হয় নি? আপনার দেহমনের ক্ষুদ্র জগতের পরিমিত আবেষ্টনের মধ্যে নিজেকে যেন সে আর ধ'রে রাখতে পারে না। বৃহৎ একটা সর্বনাশের দুর্মদ প্লাবনে, সুনিয়ন্ত্রিত সংসারযাত্রার বিরুদ্ধে নিজেকে ভাসিয়ে না দিয়ে যেন তার তৃপ্তি নেই। মানুষের সঙ্গে মানুষের, পুরুষের সঙ্গে নারীর সর্বপ্রকার বিচিত্র সম্পর্কের অনাস্বাদিতপূর্ব মধুর রসে তার চিত্ত বেদনাময় পরিপূর্ণতায় ওতঃপ্রোত হয়েছে। মানবপ্রেমের বিচিত্র রূপকে সে তার অন্তরের রসোপলব্ধির মধ্যে গভীরভাবে অনুভব করেছে, কখনও রোগতাপক্লিষ্ট অসহায় শিশুর জননী রূপে, কখনও স্নেহপরায়ণা সেবানিরতা দিদির মত, কখনও বা দুঃসময়ের অন্তরঙ্গ

বন্ধুর মত। কিন্তু ফল্গুপ্রবাহের ধারা যেমন সংগোপন অথচ সুনিশ্চিত, তেমনই এই সমস্ত সম্পর্কের উপলব্ধির অন্তস্তলে আরও কি এক অনির্বচনীয় মধুরতর রসের আবেশে তার চিত্তলোক অমৃতময় হয়ে উঠেছে। তার সমস্ত প্রাণের আকুলতা দিয়ে সে রোগীর মৃতকল্প শরীরে নবপ্রাণ সঞ্চার করেছে। সে অনুভব করেছে, এই তো তার জীবনের চরম চরিতার্থতা। তার প্রিয়তমকে সে আপনার শরীর মন আত্মার সুনৃততম অংশ দিয়ে সৃষ্টি ক'রে নিয়েছে। সংসার-বিপণিতে বাছাই ও যাচাই করা পণ্যশ্রেণীর নির্বাচন তার নয়। সে তার অন্তরলোকের রসোপলব্ধি, সে তার বহির্লোকের অভিনব আত্মোপলব্ধি, সে তার অন্তর-বাহিরের একান্ত সৃষ্টি।

এই সৃষ্টির অমৃতময় আনন্দে সে সম্পূর্ণ ভুলে বসেছিল নিজেকে। ভুলেছিল যে, যাকে সৃষ্টি করা সহজ তাকে ফিরে পাওয়া সহজ নয়। সৃষ্টির রহস্যই এই। সে এই ভেবেই পরম নিশ্চিন্তে নিরুদ্বিগ্ন ছিল যে, যা একান্ত ক'রে তারই সৃষ্টি তাতে একান্ত ক'রে তারই অধিকার। রূঢ় আঘাতে একদিন তার এই মূঢ় বিশ্বাস চূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু সে কথা পরে হবে।

১৫

অনেকক্ষণ দুজনে চুপ ক'রেই ছিল। কি ব'লে এর পর কথা আরম্ভ করবে, কি কথায় পরস্পরের মনের এই গুমোট কেটে গিয়ে, চিত্ত আবার দক্ষিণ-সমীরণের স্নিগ্ধস্পর্শে আনন্দময় হয়ে উঠবে, দুজনের মধ্যে কেউই তা ঠিক ক'রে উঠতে পারছিল না। শচীন্দ্র ভাবছিল যে, যে সম্পর্ক তাদের মধ্যে কোনদিন সত্য হয়ে ওঠবার রূপ ও সম্ভাবনা সে কিছুতেই কল্পনা ক'রে উঠতে পারে না, সেই সম্পর্কের সম্পদকে জীবনে যে পরমসম্পদ ব'লে গ্রহণ করেছে, তার বঞ্চিত

অভিশপ্ত জীবনের জন্য শচীন্দ্রও কি দায়ী নয়? তবে এমন কোন্ অভিনব আত্মদান সে করতে পারে, যাতে ক'রে পার্বতীর চিত্তে নির্ভরপূর্ণ শান্তি ও আনন্দের সঞ্চার হয়?

পার্বতীর প্রতি স্নেহ ছিল তার অপরিসীম, বন্ধুতার নিরুচ্ছল রসমাধুর্যে সে স্নেহ অমৃতময় করেছিল তার বিরহক্ষত অন্তরকে। এমন কোনও পার্থিব সম্পদের কথা সে চিন্তা করতে পারে না, পার্বতী সম্বন্ধে যা তার অদেয়। অথচ যা তার নিতান্ত অন্তরতম, যে বেদনা তার নিভৃত হৃদয়ের গোপনে থেকে তার সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করেছে, তার জীবনে নিগূঢ়তম উদ্দেশ্যকে প্রেরণা দান করেছে, সেই পবিত্রতম, কঠিনতম, মধুরতম বেদনার গোপন কক্ষে পার্বতীকে সে কেমন ক'রে আহ্বান ক'রে নেবে? তবু তো সে তার দুঃসময়ের একমাত্র বন্ধু, তার প্রাণদাত্রী। দিনে দিনে মুহূর্তে মুহূর্তে অপরিচিত প্রবাসের একান্তে পার্বতীরই অন্তরের সুমধুর পরিচয়ে শচীন্দ্র তার অপরিমেয় দুঃখের মধ্যে আনন্দলোকের পরিচয় লাভ করেছে। সেই পার্বতীকে এমন দুঃখ সে কেমন ক'রে দেবে, যার আঘাতে পার্বতীর নিঃসঙ্গ সংগ্রামক্লিষ্ট জীবন সমূলে ধূলিসাৎ হয়ে যায়?

পার্বতীই প্রথম সেই দুর্বিষহ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলে। বললে, দেখুন, আমাকে বুদ্ধিমতী ব'লে আপনারা অনেক প্রশংসা করেছেন, কিন্তু যদি আমার মনের মধ্যে একবার ঢুকতে পারতেন, তবে আমার আদিম জড় মনের নির্বুদ্ধিতা এবং বিবেকহীন দুর্জয় অন্ধ প্রবৃত্তি দেখে অবাক হয়ে যেতেন। আমি জানি, আমি অতর্কিতে আপনাকে অকারণে কঠিন আঘাত করেছি। আমার উপরে আপনার যে স্নেহ আছে, তার মধ্যে ক্ষমাভিক্ষার অবসর আপনি রাখেন নি। তবু আমাকে—

শচীন বললে, পার্বতী, তোমার স্নেহের ঋণ শোধ দেবার মত ঐশ্বর্য

আমার নাই? তবু যদি তোমার ক্ষুব্ধচিত্তে কোনদিন সামান্যমাত্র শান্তিদান করতে পারি, তবে নিজেকে ধন্য মনে করব।

এমন সময় ভোলানাথ সশব্দে তাদের সামনের খড়খড়ির দরজাটা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল।

পার্বতী হাসিমুখেই জিজ্ঞাসা করলে, কি ভোলাদা', লুকানো ধনরত্ন কি আবিষ্কার করলে? আশা করি, কুঠির সায়েবেরা যাবার সময় তাদের জমানো টাকাকড়ি কোথাও একটা পুঁতে-টুতে রেখে গেছে, কি বল?

কথাটা ভোলানাথের এতক্ষণ মনে হয় নি। সে এর পরিহাসটুকু বুঝতে না পেরে আগ্রহভরে বললে, না দিদিমণি, তা তো দেখার কথা মনে হয় নি। নিশ্চয়ই আছে কোথাও,—দেখতে হবে খুঁজে।

পার্বতী তার বিশ্বাস ও সরলতায় সস্নেহে হেসে বললে, আচ্ছা এখন থাক্। চল, বাড়িটা ভাল ক'রে ঘুরে দেখে আসি। ব'লে সে লঘুগতিতে ভোলানাথের সঙ্গে চ'লে গেল। যাবার সময় ফিরে বললে, আসুন না মিঃ সিংহ, বাড়িটা দেখে আসি।

পার্বতী যত শীঘ্র নিজেকে সংযত ক'রে নিয়ে ভোলানাথের সঙ্গে নিতান্ত সহজভাবে কথা শুরু করলে, শচীন্দ্রের পক্ষে তা সম্ভব হয় নি। সে পার্বতীর এই আচরণকে অল্প বয়সের লঘুচিত্ততা ব'লে মনে ক'রে, কোন্ যুক্তিতে জানি না, নিজেকে যেন অল্প একটুখানি দায়িত্ব থেকে মুক্ত ব'লে অনুভব করলে।

১৬

আজ ক'দিন হ'ল কমলের জ্বর ছেড়ে গিয়েছে। কিন্তু অসম্ভব দুর্বলতায় উঠে বসবার ক্ষমতা পর্যন্ত তার নেই। দীর্ঘ তিন সপ্তাহের মধ্যে একদিনও তার এমন পরিষ্কার জ্ঞান হয় নি যে, সে তার নিজের

অবস্থার কথা কিছুমাত্র বুঝতে পারে। ভালই হয়েছিল। যে দুরন্ত তাণ্ডবের মধ্য দিয়ে তাকে জীবনের সম্পূর্ণ নূতন এক অধ্যায়ে প্রবেশ করতে হ'ল, তার রোগক্লিষ্ট দুর্বল মস্তিষ্ক ও দুর্বলতর হৃৎপিণ্ড সেই বিপ্লবকারী চিন্তার আবেগ সহ্য করতে পারত না। নেচার পাকা নার্স। ঠিক সময়েই সে তার সমস্ত দেহযন্ত্রের সম্পূর্ণ বিশ্রামের ব্যবস্থা ক'রে তার রক্ষার উপায় করেছিল। নইলে রক্ষা পাওয়া সম্ভবই হ'ত না।

তবু এই জ্বরে একটা সর্বনেশে ক্ষতি ক'রে দিয়ে গেল তার। তার মন থেকে নামের স্মৃতি একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল। কত চেষ্টা সে করেছে, তার বাড়ি, তার শ্বশুরবাড়ির নাম মনে করতে ; তাতে পরিশ্রমে তার দুর্বল মস্তিষ্ক শুধু শ্রান্ত হয়েছে। নন্দ ও তার পত্নীকে কিছুকালের জন্য এই অনুসন্ধান-চেষ্টা থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দিয়ে ডাক্তার ব'লে গেলেন যে, স্মৃতি ফেরাবার চেষ্টা জোর ক'রে করতে গেলে হয়তো মস্তিষ্কের অধিকতর ক্ষতি হতে পারে। স্বাস্থ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই বিলুপ্ত স্মৃতি বরং হয়তো ফিরে আসতেও পারে।

আজ সকালে শুয়ে শুয়ে জানালা দিয়ে পাশের বাড়ির চুঁনবালি-খ'সে-যাওয়া দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে তার কেবলই দুই চোখ বেয়ে জল পড়ছিল। এই চোখের জলে তার বেদনার পরিমাণ যেটুকু ছিল, তার অনেকটাই তার নিজের প্রতি অসহায় করুণায়। সে মনে মনে বলতে লাগল, কোনও দোষ তো আমি জেনে-শুনে করি নি ঠাকুর, তবে এই দুঃখিনীর দুঃখের উপরে কঠিনতর দুঃখ কেন দিলে? আর যে পারি না। উঃ, আজ কতদিন তাঁকে দেখি নি! কিন্তু শান্ত-বিগলিত এই অশ্রুধারায় ভগবান এবং এই গৃহবাসী পরিবারের প্রতি তার কৃতজ্ঞতাও ছিল অনেকখানি। সেদিন রাত্রে এই বাড়িতে এসে যে আশ্রয় নিয়েছিল, সে আশ্রয় যদি তার পূর্ব আশ্রয়ের অনুরূপ

অথবা তার চেয়েও সর্বনাশের হ'ত! মনে করতেও তার সারা শরীর ঝিমঝিম ক'রে উঠল।

এমন সময় খোকাকে কোলে নিয়ে মালতী এক বাটি গরম দুধ হাতে ক'রে এসে উপস্থিত হ'ল। মেঝের উপরে খোকাকে কোলে নিয়ে ব'সে বললে, পারি নে বাপু, তোমার এই আহ্লাদে ছেলে নিয়ে। মিছরি দিয়েছে ব'লে দুধ আর মুখে করবে না—একটু সর মুখে ঠেকলে বাবুর খাওয়া মাথায় উঠল। আর ঝিটাও হয়েছে বাহাত্তুরে। এত ক'রে ব'লে দি, তা একটা কথা যদি মাথায় থাকে। খা বলছি মুখপোড়া ছেলে। এদিকে মাছ খুব চিনেছেন। মাছ একবার দেখলে হয়!

দেখারও অবসর হ'ল না। শুনেই হৃদয় তার উথলে উঠল। মাত্ দে।—ব'লে তার টুকটুকে এক কোষ ছোট্ট হাতটি মালতীর দিকে উঁচু ক'রে ধরলে। মালতী হেসে বললে, ওমা, দেখেছ, কি দুষ্টু ছেলে! ঠিক বুঝতে পেরেছে। ব'লে তার হাতটা মুখে চেপে ধ'রে চুমোর ভ'রে দিলে।

মাত দে।

হ্যাঁ, মাছ দেবে বইকি! তা হবে না; আগে দুদু খাও, তবে মাছ পাবে। কমল বললে, ওকে রোজ কাঁচা সদ্য-দোয়া গরম গরম ছাগলের দুধ খাওয়ানো হ'ত। তাই ও জ্বাল-দেওয়া কি মিষ্টি-দেওয়া দুধ খেতে পারে না। আমাদের একজন পুরনো চাকর ছিল, সে-ই ওকে নিয়ে দিনরাত থাকত। এক মুহূর্ত যেন ওকে চোখের আড় করতে পারত না। এখন কেমন ক'রে আছে কে জানে?

বলতে বলতে আবার তার চোখ ভ'রে জল এল। মালতী ক্ষুণ্ণ স্বরে বললে, এমন ক'রে রাতদিন কাঁদলে কি দেহ বইবে দিদি? উনি তো কত চেষ্টা করছেন। একটা সুরাহা ঠাকুর ক'রে দেবেনই।

তোমরা আমার যা করছ বোন, ইহজন্মে তিল তিল ক'রে প্রাণপাত

করলেও তা শোধ হবার নয়। চোখের জল বাধা মানে না, তাই ঝরে। ব'লে আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বললে, খুব ন্যাওটা হয়েছে তোমার খোকন।

না, হবে না আবার! ব'লে দুধের বাটিটা নামিয়ে খোকনকে কোলের মধ্যে চেপে ধ'রে মালতী বললে, কেটে ফেলব না হাত দুটো বেইমানী করলে! তারপর মস্ত একটা চুমো দিল।

১৭

দিন তাদের চ'লে যাচ্ছিল এক রকম। নন্দলাল প্রায় সমস্ত দিন বাইরে বাইরে কাটায়। তার পরিশ্রম অনেক বেড়ে গেছে। উপার্জনের নূতন নূতন পন্থা তাকে অবলম্বন করতে হয়েছে অধিক অর্থাগমের চেষ্টায়। তবু এ পরিশ্রমে তার ক্লান্তি নেই। তার নূতন দায়িত্ব তার মধ্যে যেন নবীন উৎসাহের সঞ্চার করেছে। অর্থের অভাবে যাতে কোন রকমে কমল ও তার শিশুটির কোন কষ্ট না হয়, তার জন্য নিজেকে সে বিশ্রাম দিতে প্রস্তুত নয়। পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যায় সে বাড়ি ফেরে, কিন্তু সে-ক্লান্তিতে কোন অবসাদ নেই। খোকনের জন্য নিত্যই কিছু-না-কিছু শিশুচিত্তহরণ উপহারদ্রব্য নিয়ে আসে এবং বাড়িতে প্রবেশ ক'রেই ডাকে, খোকন! খোকনের উচ্ছ্বসিত আনন্দ যে অন্য একটি চিত্তে সহজেই সঞ্চারিত হয়, সেটি কল্পনা ক'রে মনে মনে তার একটা আত্মপ্রসাদ জন্মায়।

এ কথা আপনারা অবশ্যই অস্বীকার করবেন না যে, ভগবান স্ত্রীলোককে স্বভাবতই আত্মরক্ষণশীল অর্থাৎ সন্দিহান স্বভাবের ক'রে সৃজন করেছেন। অন্তঃপুরের অন্তরালে আবদ্ধ থেকে, সমস্ত বহিঃ-পৃথিবীর অজস্র লোভনীয় আহ্বানের বিরুদ্ধে এমন সকল লোভনতর

ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিকর আয়োজনে নারীর নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে হয়, যাতে ক'রে প্রলুব্ধ পুরুষের বহির্মুখীন বিক্ষিপ্ত চিত্তকে সংহত এবং গৃহানুগত করে। এ বিষয়ে মালতীর স্বাভাবিক অশিক্ষিতপটুত্ব অন্য অনেক রমণীর অপেক্ষা অল্প ছিল, এ কথা মানতেই হবে। যদিচ রসনার সরস পথে, দেহ-মনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানে সে নন্দের তৃপ্তি-সাধনের আয়োজনকে কখনও শিথিল হতে দেয় নি ; তবু এ ক্ষেত্রে তার সন্দেহবৃত্তিকে পরিশুদ্ধ রাখা যে সম্ভব হয় নি, তার গুরুতর কারণ মালতীর নিজের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন ছিল। কমলের প্রতি আন্তরিক করুণা এবং তার সন্তানের প্রতি নিবিড় স্নেহে মালতী আপনার অন্তরকে উন্মুখ ক'রে দিয়েছিল। বিশেষত তার সন্তানহীন মাতৃহৃদয়ে কমলের শিশুপুত্রকে সে এমন গভীর মমতায়, এমন একটি প্রচ্ছন্ন অথচ আকণ্ঠ তৃষ্ণায় আত্মসাৎ ক'রে নিয়েছিল যে, এর থেকে কোন প্রকার বিচ্ছেদ-সম্ভাবনার আভাসও চিন্তার মধ্যে গ্রহণ করা মালতীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। অতএব, নারীচিত্তের আদিমতম সংস্কার—সূক্ষ্ম ও সতর্ক সন্দেহ-তৎপরতা, এ ক্ষেত্রে মালতীর চিত্ত থেকে নির্বাসিত হয়ে তার ভগবদ্দত্ত স্বাভাবিক মহিমাকে যে ক্ষুণ্ণ করেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাই তার গৃহের মধ্যে, তার চক্ষের সমক্ষে, এমন কি তারই অতর্কিত আয়োজনের সহায়তায় তারই নিজের দুর্নিবার দুঃখের কারণ এমন ক'রে ঘনিয়ে উঠবে তা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি।

নন্দলালের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় যে কোথাও কিছুমাত্র শৈথিল্য ঘটেছিল তা নয়। সে নিত্যনিয়মিত পূর্বের মতই সকালে খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে পড়ত এবং সমস্ত দিন নানা ধান্ধায় ঘুরে ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফিরত। মালতী তাকে গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করত, কি গো, কোনও কিনারা হ'ল ? নন্দলাল সংক্ষেপে বলত, না। সন্ধানের উৎসাহ

তার চিত্তে প্রবল নয়। তা ছাড়া এ ক্ষেত্রে সন্ধান যে কি উপায়ে শুরু করবে, তা সে ভেবে উঠতেও পারে না।

মালতী বলে, কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দাও না গা।

নন্দ হেসে বলে, নইলে মেয়ে-বুদ্ধি বলবে কেন! তা হ'লে ওর স্বামী বিজ্ঞাপন দিলে না কেন? বড়ঘরের বউ, জানাজানি হ'লে আর ফেরবার পথ থাকবে?

মালতী হতাশ হয়ে বলে, তা যা হয় কর। বড্ড কান্নাকাটি করে যে!

তারপর খোকনের ডাক পড়ত এবং এই শিশুটিকে উপলক্ষ্য ক'রে নন্দলাল তার হৃদয়ের বাষ্পাবেগ কতকটা মুক্ত ক'রে দেবার সুযোগ পেত। কখনও বা খোকনকে কোলে নিয়ে কমলার কাছে যেত এবং অত্যন্ত মামুলী দু-একটা কুশল-প্রশ্ন করত।

এই তো গেল তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। বাইরের দিক দিয়ে দেখতে গেলে এ যেমন বৈচিত্র্যবিহীন, তেমনই ক্লান্তিকর। কিন্তু মানুষের মন তো বাইরের হিসাবের খাজনা দিয়ে চলে না। সে তার অন্তর্নিহিত অবচ্ছন্ন মনের নিগূঢ় প্রেরণায় নিয়ন্ত্রিত হয়। নন্দলালের চিত্ত কর্ম্মপ্রবাহের এই নিরবচ্ছিন্ন অনবসরের মধ্যে জীবনের একটি অনাস্বাদিতপূর্ব্ব রসের সন্ধান আবিষ্কার করেছিল। তার জীবন, তার কর্ম্মচেষ্টা তার কাছে অকস্মাৎ অধিক অর্থপূর্ণ, অধিক আবশ্যক ব'লে মনে হতে লাগল।

কলেজে পড়ার সময় যে-সব বই তার কাছে নিতান্ত পরীক্ষা-পাসের যন্ত্রস্বরূপ ব'লে মনে হ'ত, এখন আবার তারা তাদের নূতনতর কাব্যরূপ নিয়ে তার মনের মধ্যে এসে সাড়া দিতে লাগল। আবার সে একটু একটু ক'রে পড়াশুনা আরম্ভ ক'রে দিলে। বৈষ্ণবপদাবলী ও রবীন্দ্রনাথের কবিতা সে নূতন ক'রে পড়তে শুরু করলে এবং মাঝে

মাঝে মালতী ও কমলকে নিয়ে রাত্রে তার চিত্তের এই নূতন অনুভূতির আবেগে প'ড়েও শোনাতে লাগল।

মালতী তাকে বললে, কি গো, আবার এগ্‌জামিন পাস দেবে না কি?

নন্দলাল বললে, দেখি না, মুখ্যু হয়ে থেকে লাভ কি?

মালতীর কিন্তু সমস্ত দিন খাটুনির পর এ সব ভাল লাগে না। সে বরং একটু গল্পগাছা করতে চায়। পড়া শুনতে শুনতে হঠাৎ বলে, ওই যাঃ, দইটা পেতে রাখতে ভুলে গেছি! কমল কোন কথা বলে না, চুপ ক'রেই ব'সে থাকে। নন্দলালের কিন্তু উৎসাহের বিরাম নাই। সে উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি ক'রে যায়—

"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।"

আর তার চিত্ত কবিতার সুরে সুরে নূতনতর পরিপূর্ণতর আনন্দময় জগতের মধ্যে সঞ্চরণ ক'রে ফেরে। মালতী আঁচল পেতে মেঝের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে; কিংবা খানিকক্ষণ পরে একটা কাজের নাম ক'রে উঠে পাশের ঘরে গিয়ে খোকাকে নিয়ে শুয়ে পড়ে। কমল দেয়ালে ঠেস দিয়ে জানালার অবকাশপথে খণ্ড আকাশের তারাময় নীরবতার দিকে চেয়ে ব'সে থাকে; কি শোনে তা সে-ই জানে। তার মনের পটে তার পূর্বজীবনের ছবি ওঠে ভেসে। এমনি ক'রে আরও একজন তাকে কবিতা গল্প উপন্যাস প'ড়ে শুনিয়েছে। কত মধুময় জাগরনিশীথ কেটেছে তাদের এই কাব্যচর্চায়; কত মধুরতর অবসানে রাত্রি প্রভাত হয়ে গেছে। সে যেন জাতিস্মর; জন্মান্তরের স্মৃতি বহন ক'রে তাকে বেঁচে থাকতে হয়েছে।

গভীর রাত্রি পর্যন্ত পাঠ চলতে থাকে। দূরে রাস্তার ক্ষীণ শব্দটুকুও ক্ষীণতর হয়ে আসে, ক্লান্ত মালতী গভীর সুষুপ্তির আশ্রয়ে আপনাকে

সমর্পণ ক'রে মেঝের উপর নিশ্চিন্ত আরামে এলিয়ে প'ড়ে থাকে। পাঠের কোন একটা বিরতির অবসরে কমলের মুখের দিকে চেয়ে নন্দলাল তার পরিপূর্ণ অন্যমনস্ক দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে বলে, বড় রাত হয়ে গেছে, না? বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমায়। শুয়ে পড়। আরও অনেকক্ষণ আগে থামা উচিত ছিল, কিন্তু এত চমৎকার যে থামা যায় না। সত্যি ভারি অন্যায় হয়ে গেছে।

নন্দলালকে অনুতপ্ত দেখে সে বলে, না না, রাত্রে তো আমার ঘুম হয় না। তার চেয়ে আপনি কষ্ট ক'রে প'ড়ে শোনাচ্ছেন, এ তো ভালই হচ্ছে।

নন্দলাল পড়বে, কি পড়বে না, এই দ্বিধায় প'ড়ে একটু ইতস্তত ক'রে উঠে পড়ে; বলে, আজ থাক্। অনেক রাত হয়ে গেছে, একটু ঘুমতে চেষ্টা কর। ব'লে, উঠে মালতীকে ডাকে, ওগো, ওঠ। মেঝেতেই প'ড়ে রাত কাটাবে না কি?

ডাক শুনে মালতী ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে—তার নিদ্রাজড়িত মস্তিষ্কে একটা দুঃসংবাদের আশঙ্কা জেগে ওঠে—খোকন!

এই তো বিছানার ওপর। তুমি উঠে শোও। আমি যাই। সিরাপটা দিও শোবার সময়। আর ঘুম না হ'লে একটা পুরিয়ার আধখানা। শুনলে, না, এখনও ঘুম ছাড়ে নি? উঃ, কি ঘুমুতেই পার, বাব্বাঃ!

মালতীর ঘুম-জড়ানো চোখে মুখে সলজ্জ আলস্যজড়িত হাসি ফুটে ওঠে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলে, এই দিচ্ছি ওষুধ।

১৮

এর পর প্রায় দু বৎসর অতীত হয়েছে। নন্দলালের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তার গৃহেরও নানা পরিবর্তন ঘটেছে। সেই ছোট

গলির মধ্যে ছোট বাড়িতে সে আর নেই। একটা অপেক্ষাকৃত বড় বাড়িতে তারা উঠে এসেছে। কমলের নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরেছে বটে, কিন্তু তার স্মৃতি ফিরে আসে নি। কোন নামই সে মনে আনতে পারে না, সুতরাং তার আত্মীয়স্বজনের অনুসন্ধান নন্দলালের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

এই অনুসন্ধান-কার্যে যে নন্দলালের অতিমাত্র আগ্রহ ছিল এবং সর্বপ্রকার সাধ্য প্রয়াসে হতাশ হয়ে তারপর যে সে নিরস্ত হয়েছিল, এমন কথা বলা যায় না। নিতান্ত যতটুকু না করলে নিজের মনকেও স্তোক দেওয়া চলে না, ততটুকু করার উদ্যোগে অবশ্য তাকে সাড়ম্বর প্রয়াস করতে দেখা যেত। মৃত্যুযবনিকার মত দুর্লঙ্ঘ্য অদৃষ্টের অমোঘতার বিরুদ্ধে কমল সম্পূর্ণ নিরাশ এবং অবসন্ন হয়ে অবশেষে তাকে মেনে নিলে। এখানে তার নূতন নাম হয়েছে—জ্যোৎস্না, এবং খোকার নাম—অজয়।

কিন্তু এ সকলের চেয়েও একটা গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছিল সংসারে। নন্দলালের কাজে-কর্মে চলা-ফেরায় কোথাও যে কিছু অশোভনতা প্রকাশ পেয়েছিল তা নয়, তবু সমস্ত বাড়ির মধ্যে একটা কি-যেন-কি ধরনের অস্বস্তিতে সকলের চিত্তকে ভারাতুর ক'রে রেখেছিল। একটু বোধগম্য করতে কমলের বিলম্ব হয় নি যে, নন্দলালের হৃদয় তার প্রতি উদাসীন নয়। আতঙ্কে তার সমস্ত প্রাণ সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল। যথাসম্ভব সে নন্দলালের দৃষ্টিপথ এড়িয়ে চলত এবং গৃহকর্মের তুচ্ছতম ব্যাপারেও সে নিতান্ত অনাবশ্যকে নিজেকে সর্বদা ব্যাপৃত রাখতে চেষ্টা করত। মালতী বাধা দিতে গেলে বলত, ভাই, একটা কিছু নিয়ে তো থাকতে হবে! এতে আমার কোন কষ্ট নেই। কাজ থেকে অবসর দিলে আমি বাঁচব কি নিয়ে, দিদি?

নন্দলালের মন স্বভাবত গৃহধর্মানুকূল। তার গৃহস্থ-মন নিজের

অন্তর্নিহিত বাসনাকে কোন অশোভন অভিব্যক্তির উচ্ছ্বাসে সংসারে কোন অশান্তির কারণ ঘটতে দেয় নি বটে, কিন্তু তার অন্তরের সঙ্গে বাহিরের এই নিয়ত সংগ্রামে তার চিত্ত ক্রমে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। তার পরিতুষ্ট চিত্তের উপর যে দুঃস্বপ্নের ছায়াপাত হতে শুরু হয়েছিল, নন্দের মুখে, তার কাজে, তার প্রত্যেকটি বাক্যে সে তার উপচীয়মান ক্লান্তি ধীরে ধীরে বিস্তার করেছিল। খেতে ব'সে নন্দ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ত, অনেক কাজে তার পূর্বের স্থির অবধানতা আর ছিল না। ব্যবসায়ের গুরুতর বিষয়গুলির গুরুত্বও তার কাছে ক্রমে উপেক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। তবু বিদ্রোহে ভীত, সমাজশাসনে অভ্যস্ত তার পোষ-মানা মন তার অন্তরের সংগ্রাম-চেষ্টাকে শিথিল না-হতে দিতে পণ করেছিল। কিন্তু সে আর পেরে উঠছিল না যেন।

মালতীর অবস্থা অন্য রকম। সে সহজেই সরল সাদাসিধা মানুষ। তাদের অবস্থার উন্নতি তার কাছে পরম উপভোগ্য। এখন আর তাকে রাঁধা, বাসন-মাজা প্রভৃতি যাবতীয় কাজ একলাই করতে হয় না। চাকর-দাসী নিয়ে সে দস্তুরমত গৃহিণীপনার আনন্দেই যেন সকলের প্রতি প্রসন্ন। তা ছাড়া কমলের ছেলে তার অনেকখানি সময় অধিকার ক'রে থাকে। তাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে, তেল মাখিয়ে, খাইয়ে, গল্প ক'রে ঘুম পাড়িয়ে সে পরমানন্দে নিজেকে ব্যাপৃত রাখে। নন্দলাল বাড়ি ফিরলে তাকে খোকার গুণপনার গল্প ক'রে, তার জন্য প্রাত্যহিক ফরমায়েসের কৈফিয়ৎ নিয়ে, নন্দলালকে ব্যস্ত ক'রে তোলে। নন্দলাল হেসে বলে, অত ক'রে ছেলেকে আদর দিও না। ওকে মানুষ হতে দাও। মালতী অত্যন্ত রাগ ক'রে উত্তর দেয়, আহা! আদর আবার কি? ছেলেপিলেকে ভূত সাজিয়ে না খেতে দিয়ে রাখলেই খুব মানুষ করা হবে না? তোমার অত ভাববার দরকার নেই—কাজকে ওর

জন্যে দম্-দেওয়া মোটর গাড়ি একটা বড় দেখে এনে দিও দিখি নি। নন্দলাল ক্লান্তভাবে মৃদু হেসে চুপ ক'রে থাকে।

ক্রমে মালতীর কাছেও কি একটু একটু ধরা পড়তে লাগল? কি একটা বিস্মরণ হওয়ায় মালতী একদিন রাত্রে অনুযোগ ক'রে বললে, তুমি আজকাল বড্ড ভুলে যাও। সেদিন জ্যোতিদিকে চিঠি লিখে দিলাম তোমায় ঠিকানা লিখতে, তুমি জোছ্‌নার নাম দিয়ে এখানকার ঠিকানা লিখে দিয়েছ। জোছ্‌না চিঠিটা খুলে বললে, ও মা, এ কি ভাই, এ যে তোমার লেখা। ভাগ্যিস অন্য কোন ঠিকানায় পাঠাও নি। কি যে ভুল হয়েছে তোমার!

নন্দলাল উদ্বিগ্ন মুখে কৌতুকের প্রয়াস টেনে এনে বললে, বুড়ো হয়েছি তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

মালতী ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, আর ন্যাকরা করতে হবে না, বুড়ো হয়েছেন! ভীমরতির বয়েস হয়েছে, না?

কথাটা চাপা পড়া সত্ত্বেও নন্দলাল নিজের অনবধানতা দেখে লজ্জায় আশঙ্কায় অন্তরে অন্তরে শঙ্কিত হয়ে উঠল। নিজের প্রতি ক্রমে তার বিশ্বাস ক্ষীণ হয়ে আসছে। এই অবস্থায় লোকালয়ে থাকলে কোন দিন একটা হাস্যকর কিছু ক'রে ফেলাও অসম্ভব নয়।

নিজেকে সংযত করার চেষ্টা এবং আনুষঙ্গিক নানা চিন্তায় সে উন্মনা হয়ে পড়ল। দুশ্চিন্তায় তার মুখের উপর বিহ্বলতার ছায়া ঘনিয়ে উঠল। কথা বলতে বলতে মালতী তার মুখের দিকে চেয়ে একটু শঙ্কিত হয়ে উঠল। লণ্ঠনের ছায়া-আলোয় সে দেখলে, নন্দলালের মুখ অসম্ভব ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার শরীরটা ভাল নেই না, কি গো?

ব'লে মালতী তার কপালে হাত দিয়ে দেখলে, জামার ভিতর হাত গলিয়ে দেখলে, না, জ্বর নয়। বললে, শোবে চল। কেমন একটা

অজ্ঞাত আশঙ্কায় তার বুকটা ভ'রে উঠল। হাসির চেষ্টায় মুখটা বিকৃত ক'রে নন্দ বললে, পাগল! ও কিচ্ছু না। বাইরে আমার এখন ঢের কাজ।

হোক কাজ।—ব'লে মালতী তাকে জোর ক'রে নিয়ে গিয়ে পীড়িত দুরন্ত ছেলেটিকে মা যেমন ক'রে শুইয়ে আরামের ব্যবস্থা ক'রে দেয়, তেমনি সযত্নে তাকে শুইয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে তার চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগল। নন্দ যেন অগত্যা মালতীর হাতে নিজেকে সমর্পণ ক'রে প'ড়ে রইল।

বুক ফেটে কান্না আর চেপে রাখা যায় না—নন্দলালের এমনি মনে হতে লাগল। সে মনে মনে বলতে লাগল, দয়াময়, এই দুর্বলতা থেকে, এই নিষ্ঠুর বঞ্চনা থেকে, এই সর্বনাশ থেকে আমায় রক্ষা কর। তুমি দিও না এই শান্তিময় আশ্রয়নীড় চূর্ণ হয়ে যেতে। রক্ষা কর, রক্ষা কর প্রভু, তুমি দয়াময়, দয়াময়, দয়াময়। বলতে বলতে তার দুই চোখের জলে নীরবে তার বালিশ ভিজে যেতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে সে মাথাটাকে মালতীর কোলের কাছে আরও একটু ঘনিষ্ঠ ক'রে এনে উপবিষ্ট মালতীকে দুই হাতে নিবিড়ভাবে বেষ্টন ক'রে ধরলে। একটু তন্দ্রা এসেছিল মালতীর। এই আকস্মিক উচ্ছ্বাসের সুনিশ্চিত অর্থ সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে না। মালতীর দ্বাদশবর্ষব্যাপী জীর্ণপ্রায় বিবাহিত জীবনের অনতিবিচিত্র অভিজ্ঞতায় প্রথম দুই-এক বৎসর ব্যতীত উচ্ছ্বাসের অবসর তারা বড় একটা পায় নি। নন্দলাল বি. এ. পরীক্ষা দেওয়ার পূর্বেই তার পিতা ইহলোক থেকে অবসর গ্রহণ করেন। গ্রামে তার বিধবা মাতা, বৃদ্ধা পিতামহী এবং যুবতী স্ত্রীর অন্নবস্ত্র সংস্থান করতে কলকাতায় অনাহারে অনিদ্রায় অক্লান্ত পরিশ্রমে সে কাটাতে লাগল। তার নিষ্পেষিত চিত্তের কাব্যরস-প্রবৃত্তি অকালে শুষ্ক হয়ে এল। বহু বৎসর পরে মালতীর প্রতি নন্দলালের এই

উচ্ছ্বাস। গৃহকর্মের অবকাশকালে দাম্পত্যের যে-অভিব্যক্তি ইদানীং তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, উদ্বৃত্ত উচ্ছ্বাসের কোন লক্ষণ তাতে ছিল না। নিতান্ত অতি-আধুনিক শিক্ষায় এবং আচারে দীক্ষিত না-হওয়ায় তাদের দাম্পত্যে প্রেমিকপ্রেমিকার উচ্ছ্বাস ও নাট্যলীলা দেখা যেত না। সম্প্রতি নন্দলালের শুষ্কচিত্ত-পাদপ মঞ্জরিত এবং তার হৃদয়ে যে রসোচ্ছ্বাসের সঞ্চার ঘটেছে, সে খবর মালতীর সুখতৃপ্ত চিত্তে বিশেষ ক'রে পৌঁছয় নি। আজ অকস্মাৎ এই নিবিড় আবেষ্টনে আবদ্ধ হয়ে মালতী বিস্মিত হ'ল এবং সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব ও জীবলীলাঘটিত বিশ্লেষণ-বিদ্যা তার অপরিজ্ঞাত থাকায় সে একটু অবাক এবং শঙ্কিত হয়েই জিজ্ঞেস করলে, কি গো, অমন করছ কেন? কি হয়েছে? মিথ্যে ক'রে ব'লো না, আমার ভাল লাগছে না যে গো!

মালতীর ভীতিবিহ্বল প্রায়োচ্চস্বর পাছে পাশের ঘরে গিয়ে পৌঁছায়, এই ভয়ে নন্দলাল মনে মনে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। তার হৃদয়ের রস এবং অনুতাপ-প্রবৃত্তি অকস্মাৎ যেন একটা কঠিন বস্তুর সংঘর্ষে চেতনা লাভ করলে এবং তার অন্তরের ভাবব্যাকুলতার এই বিকৃত সমাদরে তার চিত্ত অন্তরে অন্তরে তিক্ত হয়ে উঠল—এই আদিম নারীর অসংযত স্নেহের উচ্ছ্বাসে। তার ইচ্ছা হতে লাগল, রূঢ় হাতে মালতীর মুখটা চেপে ধ'রে তার এই নির্বোধ উচ্ছ্বাসকে সংযত করে।

সে চোখ-নাক মুছে উঠে বসল এবং যথাসম্ভব স্বাভাবিক-সুরে বললে, না, কিছু হয় নি, কি আবার হবে? বড় তেষ্টা পেয়েছে, এক গ্লাস জল আন তো। জলের যে অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল তা নয়, কিন্তু নিজেকে একাকী সংবৃত ক'রে নেবার তার প্রয়োজন ছিল, এবং মালতী বেরিয়ে গেলে, সে খাট থেকে মাটিতে নেমে একটু পায়চারি করলে, তারপর হঠাৎ এক সময়ে দাঁড়িয়ে মাথাটা ঝাঁকি দিয়ে চাপা কণ্ঠে বললে, না, এমন ক'রে আর চলবে না।

১৭

নন্দলালের ব্যবহারের যে পরিবর্তন ঘটেছে, এ কথা সকলের আগে ধরা পড়ল কমলার কাছে। নন্দলাল সাবধানে সাধ্যমত তার দৃষ্টিপথ এড়িয়ে চলতে লাগল। পূর্বাপেক্ষাও অধিক অভিনিবেশের সঙ্গে তার বিষয়কর্মে সে মনোযোগ দিলে এবং দিবসের অধিকাংশ সময় সে নিজেকে বাইরের কাজে এমন নির্মম ক'রে নিযুক্ত রাখতে লাগল যে, সব দিন দুপুরবেলা তার বাড়িতে খেতে আসবার পর্যন্ত অবসর হ'ল না। মালতী ভারি গোলমাল ক'রে বলতে লাগল, ছাইয়ের ব্যবসা! এমন ক'রে শরীর বইবে কেন?

নন্দলাল বললে, ওগো, শরীরের নাম মহাশয়। ক'টা বৎসর খেটেখুটে একটু জুৎ ক'রে নিতে পারলে আর ভাবনা থাকবে না।

কমলা মুখে কিছু বলতে পারে না। কিন্তু নন্দলালের এই আত্মনিগ্রহে মনে মনে নিজেকে দায়ী ক'রে সে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে। এই পরিবার তাকে অযাচিত স্নেহে আশ্রয় দান ক'রে, অচিন্তনীয় বিপদ থেকে উদ্ধার ক'রে তাদের পরিবারে অন্তরঙ্গের মত আত্মীয়ের অধিকারের মধ্যে নির্বিচারে গ্রহণ ক'রেছে। এখন তার দ্বারা ঘুণাক্ষরেও এদের কোন অনিষ্ট-সম্ভাবনা ঘটলে তার পরিতাপের আর সীমা থাকবে না। সে মনে মনে নিজের অভিশপ্ত অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে চিন্তা করতে লাগল যে, কি উপায়ে নিজের এই দুরদৃষ্টের ছায়াপাত থেকে এদের শান্তিময় জীবনকে সে রক্ষা করতে পারে। আপনার দুর্গ্রহ নিয়ে এই বাড়ি থেকে সকলের অজ্ঞাতে নিজেকে অপসারিত ক'রে নিয়ে যাবার কথা যে তার মনে হয় নি, তা নয়। কিন্তু নিতান্ত অপরিচিত বাইরের জগতের যে অল্প অভিজ্ঞতা সে তার জীবনে লাভ করেছিল, তার কথা চিন্তা করতেও তার মন আতঙ্কে

অবসন্ন হয়ে পড়ে; দ্বিতীয়ত পুত্র, যে তার স্বামীর একমাত্র প্রতীক, তার দুঃখের দিনে একমাত্র সান্ত্বনা, তাকে ছেড়ে সে কোনও মতে দূরে চ'লে যেতে পারবে না। তবু তো তাকে একটা উপায় করতেই হবে, যাতে তার উপস্থিতিতে এই পরিবারের অদৃষ্টাকাশে যে বিপ্লবের দুর্লক্ষণ ঘনিয়ে উঠছে তার প্রতীকার হতে পারে।

অনেক চিন্তার পর একদিন সে মালতীকে বললে, দিদি, অমনি ক'রে শুয়ে-ব'সে সময় তো আর কাটে না। কোন রকম একটা কাজকর্ম শেখার বন্দোবস্ত তোমার স্বামীকে ব'লে যদি ক'রে দাও তো আমি বেঁচে যাই।

মালতী বললে, সে কি ভাই! চাকরি করতে যাবে নাকি ছাতা হাতে ক'রে? ব'লে ছাতা হাতে ক'রে চাকরি করতে যাবার ছবিটা মনে ক'রে সে হেসে উঠল।

কমলা কিন্তু এত সহজে কথাটাকে হেসে উড়িয়ে দিতে দিল না। সে অনেক অনুনয়-বিনয় ক'রে তাকে বোঝাতে লাগল। বললে, সমস্ত দিন নিজেকে নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে, নিজের এই পোড়া কপালের কথা ভাবতে ভাবতে শেষে পাগল হয়ে যাব। তবু যা হোক একটা কাজকর্ম শেখার দিকে মন দিলে নিজের কাছ থেকে একটুখানি রেহাই পাই।

অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর মালতী নন্দলালকে বলতে রাজী হ'ল। বললে, উনি কিন্তু ভাই ভয়ানক রাগ করবেন আমার ওপর।

নন্দলালকে বলাতে সে গম্ভীরভাবে একটি 'হুঁ' ব'লে চুপ ক'রে রইল। মালতী বললে, আমি অনেক ক'রে বারণ করেছি, তা ও কিছুতেই শুনতে চায় না। বলে, এমন ক'রে ভেবে ভেবে শেষে পাগল হয়ে যাবে। তুমি বরং একটু বুঝিয়ে বল।

নন্দলাল আবার ছোট্ট ক'রে বললে, আচ্ছা।

কয়েক দিন কেটে গেল। কোন দিকেই কোন সাড়াশব্দ নেই। নন্দলালের মনে মনে একবার একটু অভিমান হ'ল। এমন কোন দুর্ব্যবহার তো সে জ্যোৎস্নার উপর করে নি, যার জন্যে তার গৃহ পর্যন্ত পরিত্যাগ করা আবশ্যক হতে পারে। দুনিয়ার অন্য সহস্র লোকের সঙ্গে তার যে চরিত্রের কত প্রভেদ, তা সে বুঝতে পারল না। স্ত্রীলোক কি শুধু স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছুই ভাবতে পারে না? একবার তার মনে এমন দুরাশাপূর্ণ সন্দেহও হ'ল যে, জ্যোৎস্নার মনে হয়তো তার সম্বন্ধে কোন দুর্বলতার সঞ্চার হয়ে থাকবে। কিন্তু কখনও কি তা হ'লে সে-কথার আভাস সে পেত না? ভাবলে, কি জানি! সাধে বলে, স্ত্রিয়াংশ্চরিত্রম্। দেখা যাক, ব্যাপারটা কি!

কয়েক দিন পরে কমলা আর থাকতে না পেরে মালতীকে জিজ্ঞেস করলে, বলেছিলে দিদি, আমার কথা?

মালতী বললে, হুঁ, বলেছিলাম।

কি বললেন?

কোন কথা বললে না।

রাগ করলেন নাকি ভাই?

কি জানি ভাই, ওদের ভাব কিছু বোঝা যায় না।

কমলা বললে, না দিদি, তোমায় আর একবার বলতে হবে। এমনি ক'রে চুপ ক'রে থাকতে আমার আর ভাল লাগে না। লক্ষ্মী দিদি, এইটুকু আমার হয়ে তুমি ব'লে দাও।

মালতী আবার গিয়ে নন্দলালকে ধরলে।

নন্দলাল হেসে বললে, ওকে তোমার বিদায় করবার ইচ্ছা হয়েছে বুঝি? বললেই হয় স্পষ্ট ক'রে। না হয়, অজয়কে আর ওকে দেশে মার কাছে রেখে আসি। কি বল?

মালতী ভারি রাগ করলে। গোলমাল ক'রে বলতে লাগল,

কখ্খনো না, আমি কখনও ওকে যেতে বলি নি। আমি বরং মানাই করেছি। ও কিছুতেই ছাড়ে না। তোমার ভারি অন্যায় এ রকম ক'রে বলা। খোকনকে কখ্খনো আমি নিয়ে যেতে দেব না। যাও না, তুমি নিজে গিয়ে জিজ্ঞেস কর দিখি নি, আমি কি বলেছি! বলতে বলতে খোকনকে নিয়ে যাবার কথা মনে ক'রে সে কেঁদে ফেললে।

নন্দলাল বললে, আচ্ছা, আচ্ছা, আমি জিজ্ঞেস করছি। তুমি চুপ কর। ব'লে সে বাইরে চ'লে গেল।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে নন্দ মালতীকে বললে, চল, জ্যোৎস্নাকে জিজ্ঞেস করি কি হয়েছে তার!

মালতী বললে, আমি যাব না।

নন্দলাল আবার একটু ক্ষীণ অনুরোধ করলে, চল না। সুন্দরী নারীর গৃহে রাত্রে একা যেতে মনুর শাস্ত্রে নিষেধ আছে।

মালতী একটু ঝাঁকি দিয়ে বললে, আচ্ছা, আর ভশ্চাজ্জিগিরি ক'রে শাস্তর ফলাতে হবে না। খোকনকে তুলে এখন দুধ খাওয়াতে হবে। এখন আমি যেতে পারব না। ব'লে সে চ'লে গেল।

অগত্যা অনেক কাল পরে রবীন্দ্রনাথের একখানা 'নৌকাডুবি' হাতে ক'রে দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে সে ধীরে ধীরে কমলার ঘরের দিকে অগ্রসর হ'ল। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। নন্দলাল গলা পরিষ্কার করার আওয়াজ দিয়ে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করলে। ভিতরে নড়াচড়া, আলো-জ্বালার একটা শব্দে সে অনুভব করলে জ্যোৎস্না উঠেছে। মনে হ'ল, সে যেন দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর আর কোন শব্দ নেই, খানিকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে নন্দলাল ডাকলে, জ্যোৎস্না! স্বরটা কিছুতেই স্বাভাবিক করতে পারলে না। কমলা দরজা খুলে দিয়ে মাথা নীচু ক'রে নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু ঢোক গিলে নন্দলাল বললে, অনেক দিন পরে একটু পড়তে

ইচ্ছা হ'ল। কিন্তু ন'টা বেজে গেছে—তোমার ঘুমের সময় হ'ল। অল্পক্ষণ পড়লে কি তোমার অসুবিধা হবে ?

কমলা সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করলে, দিদি কোথায় ? তিনি এলেন না ?

বললুম তো তাকে। বললে, খোকাকে তুলে এখন দুধ খাওয়াতে হবে। আর এসে তো প'ড়ে প'ড়ে ঘুমবে। ব'লে একটু হাসলে। এই হাসিটুকুতে যোগ না দিয়ে কমলা বললে, আমি যাই, তাঁকে ডেকে আনি। ব'লে উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল।

নন্দলাল যেন একটু অপমানিত বোধ করলে। একটু রাগও হ'ল। ভাবলে, বাড়াবাড়ি, এত কিসের ভয় ? এত দিন দেখেও কি একটা লোককে এইটুকু চেনা যায় না ? এতটুকু বিশ্বাসও করা যায় না ?—একবার ভাবলে, দূর হোক গে ছাই, ফিরে যাই ; কি এত ! কিন্তু এত যে কি, তার সঠিক উত্তর না পেয়েও তার ফিরে-যাওয়া ঘ'টে উঠল না। নিতান্ত তিক্ত চিত্তেই ঘরে প্রবেশ ক'রে সে একটা মাদুরের উপর গুম হয়ে ব'সে রইল এবং অন্যমনস্ক ভাবে বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাকে কখন যে তার পড়ায় মন ব'সে গেল, তা সে টেরও পায় নি। স্টীমারে খুড়ো আর উপেনের কথা পড়তে পড়তে তার মনের তিক্ততা কখন ঘুচে গেছে। পিড়ীং শাকের আহরণ-কাহিনী প'ড়ে সে যখন একটু হেসেই ফেলেছে, এমন সময় মালতী ঘরে ঢুকল—পিছনে কমলা। মালতী ঢুকে নন্দলালকে হাসতে দেখে খিলখিল ক'রে হাসিতে ভেঙে প'ড়ে বললে, ওমা, কি হবে গো ! অমন একলা একলা ব'সে হাসছ কেন ?

নন্দলাল বেশ গুছিয়ে ব'সে বললে, হাসছি তোমার বোনের আতঙ্কের কথা মনে ক'রে। প'ড়ে শোনাতে এলাম, তা বোধ হয় ভয় হ'ল, পাছে তুমি ক্ষেপে যাও একলা ঘরে স্ত্রীর ভগ্নীকে নিয়ে কাব্যচর্চা

করছি দেখে, তাই আর কথাটি না ব'লে তোমায় খুঁজে-পেতে নিয়ে আসতে গিয়েছিলেন। নন্দলালের মনে মনে যে তিক্ততা তাকে পীড়িত করছিল, তার কতকটা উদ্গীরণ ক'রে সে যেন একটু সুস্থ বোধ করলে।

মালতী রাগ ক'রে বললে, যাও, থাকব না আমি। তখনই জোছনাকে বললাম, আমার ঢের কাজ আছে, তা কিছুতেই শুনবে না। ব'লে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই কমলা তার হাত চেপে ধরলে। মালতী বললে, না ভাই, আমাকে ছেড়ে দাও। এখনও আমায় খাওয়া হয় নি, তারপর ছিষ্টি গুটোতে হবে—আমার ব'সে থাকবার সময় নেই।

কমলা করুণ অনুনয়ের সুরে বললে, অল্প একটুক্ষণ ব'স না দিদি। তারপর আমিও তোমার সঙ্গে যাব। লক্ষ্মীটি, ব'স।

নন্দলাল মনে মনে হতাশ হয়ে বললে, ওগো, একটা মানুষ উপরোধ করছে, একটু কষ্ট ক'রে ব'সই না। তাতে তোমার সোনার সংসার একেবারে সবাই লুটপাট ক'রে নেবে না। না-হয় পড়া আজ থাক্। আজ সেই কথাটাই হয়ে যাক না।

কমলা আর মালতী মাটির উপর বসল। মালতী বললে, কই, জিজ্ঞেস কর না, আমি ওকে যেতে বলেছি, না, ও আমাদের মায়া কাটাতে চাইছে!

এই কথায়, কথাটা পাড়বার সুযোগ পেয়ে নন্দলাল কমলার দিকে চেয়ে বললে, এখানে তোমার দিদি তোমাকে ঝিয়ের মত খাটায় ব'লে নাকি তুমি বলেছ যে, গতর খাটিয়েই যদি খেতে হয় তবে এখানে কেন; একটা কাজ-টাজ শিখে চাকরি ক'রে খাবে?

মালতী ব্যস্ত হয়ে রেগে বললে, না জোছনা, কখ্‌খনো আমি তা বলি নি। যত মিথ্যে কথা আমার নামে। ভারি অন্যায়। ওকে মোটেই সে কথা বলি নি।

মালতীর রাগ দেখে কমলা হেসে ফেললে, ধীরে ধীরে বললে, কথাটা একটু উলটিয়ে নিলেই ঠিক কথাটা হবে। এখানে দিদি সমস্ত দিন ঝিয়ের মত খাটবেন—আমার হাত-পা নাড়ার পর্যন্ত জো নেই। এমন ক'রে মানুষ থাকতে পারে না। তা ছাড়া আমার ভয়ানক ইচ্ছা যে, আমি কোন একটা কিছু শিখি, যাতে আমার জীবনটা মানুষের কাজে লাগাতে পারি। ছেলেবেলা থেকে বাবার ইচ্ছা ছিল আমাকে ডাক্তারি পড়াবার। তার তো এখন আর উপায় নেই। অমনি আর একটা ছোটখাট আমার বিদ্যের উপযুক্ত কিছু কি শেখা যায় না? এই যেমন নার্সের কাজ?

এত কথা একসঙ্গে এ বাড়িতে এসে অবধি সে কখনও উচ্চারণ করে নি। নার্সের কথাটা বলতে তার নিজের মনেও সঙ্কোচ ছিল। তবু বলা হয়ে যাবার পর—তার মনে হ'ল, ব'লে ফেলতে পেরে ভালই হয়েছে।

মালতী তো শুনেই ব'লে উঠল, মা গো, কি ঘেন্না! শেষকালে ধাইমাগীদের কাজ করবে নাকি? না না, সে হবে না। সে ভেবেছিল, ছাতা হাতে ক'রে বড়জোর মাস্টারনী হবার জন্য জ্যোৎস্নার এই উমেদারী। ধাইবৃত্তির মত এত নিকৃষ্ট ঘৃণাজনক কাজে জ্যোৎস্নার রুচি হতে পারে—এ কথা স্বপ্নেও সে ভাবে নি। তার গা যেন ঘিনঘিন ক'রে উঠল।

স্ত্রীর উত্তেজনায় নন্দলালের সংস্কার-প্রবৃত্তি অকস্মাৎ প্রবল হয়ে উঠল। বললে, ঘেন্না আবার কি? সব কাজই সম্মানের কাজ। যারা আমাদের পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ করায়, যারা আমাদের রোগের যন্ত্রণায় মায়ের মত শিয়রের পাশে ব'সে রাত জাগে, তারা আমাদের মা। তাদের কাজ সম্মান পাবার যোগ্য। সত্যেন দত্তর সেই কবিতাটা—

মালতী বললে, থাক্, আর কবিতায় কাজ নেই। চিরকাল এই

ধাইমাগীদের দেখলে আমার গা কেমন করে—দোক্তা ঠুসে একগাল পান চিবুচ্ছে চিবুতে—মা গো, মনে করলেও ঘেন্না হয়! তা মেথররাও তো আমাদের কত উপকার করে—পাঠাও তবে মেথরানী হতে। না না, ওসব হবে না। চললুম, আমার ঢের কাজ আছে, যত বাজে কথা শোনবার আমার সময় নেই। ব'লে সে কারুর জবাবের অপেক্ষা না ক'রে হনহন ক'রে বেরিয়ে চ'লে গেল।

২০

আজ প্রায় বৎসরখানেক হ'ল কমলা একটি দেশীয় হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে রোগচর্যাশিক্ষার কাজে ভরতি হয়েছে। সহজে এ কার্য সিদ্ধ হয় নি। অনেক বাক্‌বিতণ্ডা কান্নাকাটি মান-অভিমানের পালার পর সে মালতীর মতকে এবং নিজের মনকে আয়ত্তে আনতে পেরেছিল। তার নিজের মনেও দ্বিধা ছিল বিস্তর; তবে সে দ্বিধা আর মালতীর আপত্তি এক জাতের ছিল না। কমলা গাজীপুরে থাকতে একটি প্রৌঢ়া ইংরেজ নার্সের সঙ্গে তাদের পরিবারের পরিচয় ছিল। তার চালচলনে শুভ্র পরিচ্ছদ ও পরিচ্ছন্নতা এবং মধ্যে মধ্যে তার নিকট থেকে কেক বিস্কুট লজেঞ্জুস প্রভৃতি এবং জন্মদিনে লোভনীয় উপহারদ্রব্য লাভ ক'রে তার শিশুচিত্তের কল্পনার রঙে নার্স জাতি সম্বন্ধে তার ধারণা উচ্চই ছিল। কিন্তু অপরিচিত বাইরের জগৎ এবং সাধারণত অপরিচিত পুরুষ সম্বন্ধে তার মনে যে সঙ্কোচ এবং আতঙ্ক সঞ্চিত ছিল, তার বাধাই মালতীর প্রবল মতের বিরুদ্ধে তার তর্কের শক্তিকে খর্ব ক'রে রেখেছিল। মালতীর কোন যুক্তি ছিল না; বস্তুত যুক্তির জন্য তার বিশেষ আগ্রহও ছিল না। ধাই-বৃত্তি সম্পর্কে তার ধারণা খুব নীচ শ্রেণীর এবং এরূপ কার্য নির্বাচন ও সমর্থনের জন্য সে তার স্বামী ও কমলাকে তীব্র তিরস্কারে সম্ভাষণ করতে সে ত্রুটি করত না। অসহ

ঘৃণার চেয়ে বড় যুক্তি তার ছিল না এবং তা তার আবশ্যকও ছিল না। তবু একদিন চোখের জলে তাকে টলতে হ'ল। মালতী অবশেষে একদিন এই দেশীয় হাসপাতালে গিয়ে এখানকার শিক্ষার্থিনীদের নিজ চোখে দেখে এল। সৌভাগ্যক্রমে তাদের মধ্যে মালতীর সম্পর্কিতা একটি মেয়ে ছিল। তার কাছ থেকে এখানকার জীবনযাত্রার নানা তথ্য সম্বন্ধে অপরূপ প্রশ্নাদি করার পর সে আর প্রতিবাদ করে নি। বোধ করি, নার্সদের সম্বন্ধে নিজের ধারণায় তার সন্দেহ জন্মেই থাকবে।

এখন কমলাকে আর পূর্বের মানুষ ব'লে প্রায় চেনাই যায় না। গতিতে তার জড়তা নেই, কথায়-বার্তায় তার সে দ্বিধাকুণ্ঠিত বেপথু নেই, তার কাজকর্মের মধ্যে তার সহজ আত্মবিশ্বাস পরিস্ফুট হয়েছে। অকস্মাৎ তাকে দেখলে মনে হয়, যেন তার সমস্ত চেহারাটারই বিবর্তন ঘটেছে। পূর্বের চেয়েও সে যেন লম্বাও হয়েছে অনেকটা। তার কাপড়ের পাড়টুকুর সুবিন্যস্ত ভঙ্গীতে; তার প্রতি পদক্ষেপের সুদৃঢ় মর্যাদায়, তার স্মিতহাস্যের সুসংযত সুষমায়, সহজেই লোকের সম্ভ্রম আকর্ষণ করে। অবশ্য, এই সম্ভ্রমের মূলে তার রূপের দীপ্তিরও অল্প সম্মোহনী শক্তি ছিল না। তার স্বাভাবিক উজ্জ্বল বর্ণ উজ্জ্বলতর হয়েছে, তার দেহ হয়েছে দীর্ঘ ও ঋজু।

সাধারণত সে কারও সঙ্গে বেশি আলাপ করে না। নিজের পড়াশুনা, কাজকর্ম এবং অবসর সময়ে শেলাই নিয়েই তার বেশি সময় কাটে। তার কাছে দেখা করতে আসার লোকের মধ্যে নন্দলাল ও অজয়; আর মালতী কালেভদ্রে।

ইদানীং নন্দলালের সঙ্গে আলাপে কমলার সেই পূর্বের সঙ্কোচ এবং সন্ত্রস্ত ভাব অনেকটা কেটে গিয়েছিল। আপেক্ষিক স্বাধীনতার জড়তাবিহীন আনন্দের উপলব্ধি এবং অপরিচিত পরিবেষ্টনের সঙ্কোচ

দুই-ই তার চিত্তকে নন্দলালের উপস্থিতি এবং আত্মীয়তা সম্বন্ধে অনুকূল করেছিল। যতদিন সে নন্দলালের গৃহ-প্রাচীরের অন্তরালে কেবলমাত্র নন্দলাল-পরিবারের আশ্রয়ে আবদ্ধ হয়েছিল, তত দিন নন্দলালকে সে আত্মীয়ের মত ক'রে দেখতে পারে নি। নন্দের প্রতি তার কৃতজ্ঞতা ছিল প্রচুর, কিন্তু সেই জন্য তার ভার ছিল দুর্বহ। তা ছাড়া নন্দলালের উন্মুখীনতার প্রতি তার কেমনতর একটা অস্বস্তিকর অসহায় ভাব ছিল, যেটাকে সে তাদের সহস্র সহৃদয় ব্যবহারেও কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

জীবনের নানা দুর্ঘটনাময় অভিজ্ঞতায় সাধারণত পুরুষ জাতি সম্বন্ধেই তার চিত্তে অস্বচ্ছন্দ মনোভাব সঞ্চিত ছিল। সুতরাং নন্দলালের সম্বন্ধেও তার মনকে কিছুতেই সে অনুকূল ক'রে তুলতে পারত না; এবং নন্দের গৃহে অসহায় অবস্থায় নন্দলালের প্রত্যেকটি ব্যবহার সম্বন্ধে সে তার সতর্ক সন্দিগ্ধ চিত্তকে জাগ্রত রেখেছিল। নন্দের মনের পক্ষেও তা স্বাস্থ্যকর হয় নি। কিন্তু অধুনা কমলার মনের সেই বিকার অনেকখানি কেটে গিয়েছিল। নন্দলাল তার মনের মধ্যে আত্মীয়-শ্রেণীতে পরিগণিত হয়েছে। এই সহজ আত্মীয়তার মধ্য দিয়ে পুরুষের প্রতি তার অস্বস্তিকর বিরুদ্ধতা অনেকটা হ্রাস পেয়েছিল। তার সহজ সংযত ব্যবহারে সে অল্প কালেই সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। অর্থের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল না এবং সেই জন্যই তার কাছে তার কাজ কেবলমাত্র জীবিকানির্বাহের উপায়স্বরূপ হয়ে ওঠে নি। যে স্বাধীনতার আস্বাদন সে জীবনে এই প্রথম সম্ভোগ করলে, সেই অনাস্বাদিতপূর্ব আত্ম-প্রত্যয়ের মূল্য তার অন্তরকে তার সমস্ত কর্তব্য-সাধনের প্রতি কৃতজ্ঞ ও পরিতুষ্ট রেখেছিল এবং তার কর্মকে মাতৃপাণি-পরিবেশিত সেবার মত সৌন্দর্যে ও আনন্দে পূর্ণ করেছিল।

২১

ডাক্তার নিখিলনাথ ছিল এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের অন্যতম। ইংলণ্ড ও জার্মানি থেকে শিশুচিকিৎসাবিদ্যায় বিশেষ শিক্ষালাভ ক'রে যখন সে ফিরল, ভারতবর্ষে তখন নূতন আর একদল যুবক-যুবতীর চিত্ত বিজাতীয় হিংসাবৃত্তিতে অগ্নিময়।

এই দুর্গ্রহ দলের গুপ্ত চেষ্টার বিরুদ্ধে গবর্মেণ্টের সুনিয়ন্ত্রিত অভিযান কঠোর এবং প্রচণ্ড হয়ে উঠেছিল। দোষী-নির্দোষ-নির্বিচারে সমস্ত যুবক দলের উপর পুলিসের কৃপাদৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছিল। বন্দীশালার বাইরে বড় কেউ ছিল না।

নিখিলনাথ নিজে পঠদ্দশায় এই দুর্বার স্রোতের মধ্যে পড়েছিল, জেলও খাটতে হয়েছিল তাকে। সে প্রায় আজ দশ বৎসর আগের কথা। ইউরোপ থেকে ফেরবার পর অর্থলোভ বা সরকারী উচ্চপদের প্রলোভন তার চিত্তে বিশেষ ক'রে স্থান পায় নি। যে-কোন একটা মঙ্গল-প্রতিষ্ঠানে নিজের অধিগত বিষয়ের চর্চা নিশ্চিন্ত মনে করবার সুযোগ পেলেই সে খুশি হ'ত। এমন সময় নিখিলনাথকে এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষরা সাগ্রহে তাদের কাজের মধ্যে ডেকে নিলেন। কাজ করবার এমন একটা সুযোগ সকলের ভাগ্যে যে সহজে ঘটে না, এ কথা নিখিলনাথের অজানা ছিল না। তার স্বদেশে ও বিদেশে অর্জিত সমস্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নিয়ে সে একেবারে কাজের মধ্যে ডুবে গেল। দেখতে দেখতে এই হাসপাতালের এবং তার শিশু-চিকিৎসার যশ চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল। ক্রমে সে এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষীয়দের একজন হয়ে উঠল। এই স্বল্পভাষী পুরুষটি অধিকবয়স্ক না হ'লেও সকলেই তাকে শ্রদ্ধা ক'রে চলত। দায়টুকুমাত্র সাধন ক'রে এখানকার অধিকাংশ ডাক্তারই উদ্বৃত্ত সময়টা হাস্যামোদে, সিগারেট-সেবনে এবং নার্সদের সম্বন্ধে রসালোচনায় অতিবাহিত করত। তাদের

এই আলস্য এবং চপলতার প্রতি নিখিলের যে একপ্রকার অশ্রদ্ধাপূর্ণ তীব্র কটাক্ষ হিংস, তাকে ভয় করত না, এমন লোক এই হাসপাতালে কেউ ছিল না।

কমলের শেখবার উৎসাহ এবং চেষ্টা ছিল প্রচুর। তার জন্যে সে অবসর সময় বই এবং ডাক্তারদের সাহায্য নিতে ত্রুটি করত না। এক জন সামান্য নার্সের এই চেষ্টায় অধিকাংশ ডাক্তারই কৌতূহল ও কৌতুক অনুভব করত, কিন্তু তার স্বভাবগুণেই হোক বা তার রূপের গুণেই হোক, সাহায্য সে সকলের কাছেই পেত।

সবচেয়ে বেশি উৎসাহ পেত সে নিখিলনাথের কাছ থেকে। শিশুচর্যার নানা রহস্যময় তথ্য সে নিখিলনাথের কাছে সংগ্রহ করত এবং নিজেও সে শিশুদের মধ্যে সেবার কাজে নিযুক্ত থাকতে বেশি ভালবাসত। নিজের বুকের ধনটিকে বাধ্য হয়ে কোল থেকে দূরে রাখতে হয়েছিল, তাই মাতৃহৃদয়ের বেদনান্বিত স্নেহক্ষুধায় চিত্ত ছিল তার ক্ষুধাতুর। এই রুগ্ন অসহায় শিশুগুলির পরিচর্যা তার চিত্তে কতক পরিমাণে সন্তানবিরহের দুঃখকে লঘু ক'রে আনত।

জ্ঞানার্জন সম্পর্কে অন্যান্য লোকের মত নিখিলনাথের সাহায্যও সে মধ্যে মধ্যে গ্রহণ করত। নিখিল তার শত কাজের মধ্যে সপ্তাহে একদিন স্বেচ্ছায় মেয়েটিকে পাঠচর্চায় সাহায্য করত। নার্স-কোয়ার্টারের নীচের একটি ঘরে যেখানে নার্সদের আত্মীয়-পরিজনেরা তাদের সঙ্গে দেখা করতে আসত, সেইখানেই তাদের পাঠচর্চার স্থান নির্দিষ্ট ছিল।

অধিকাংশ নার্সই স্বচ্ছন্দে বাইরে গিয়ে তাদের অভীষ্ট জনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে পেত। সুতরাং এই ঘরে পাঠ-প্রসঙ্গের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটত না। কেবল নন্দলাল যেদিন অজয়কে নিয়ে এসে উপস্থিত হ'ত, সেদিন সব ওলটপালট হয়ে যেত। এই যাতায়াতে

নন্দলালের সঙ্গে এখানকার অনেকগুলি ডাক্তারের কতকটা পরিচয় ঘটেছিল। নিখিলনাথের সঙ্গেও নন্দর দু-এক দিন এই ঘরে সাক্ষাৎকার ঘটেছে। এই সাক্ষাৎকারে নন্দের চিত্ত নিখিলের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, এ কথা বলা চলে না। নিখিলনাথ স্বভাবত কিছু মননশীল উন্মন মানুষ; অধিক আলাপ-পরিচয় করা তার অভ্যাস ছিল না; সুতরাং সহসা লোকে তাকে অহঙ্কৃত ব'লে মনে করতে পারত। নন্দের সঙ্গে পরিচয়েও তার এই স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটে নি; এবং প্রথম আলাপেই স্বভাবতই তার চিত্ত নিখিলের প্রতি বিমুখ হয়ে উঠল।

২২

সেদিন নিখিলনাথ তার খাসকামরায় ব'সে পড়াশুনা করছে, এমন সময় দরোয়ান একটি ছোট চিঠি তার কাছে এনে দিলে। চিঠিতে লেখা, দয়া ক'রে আমাকে এক মিনিটের জন্যে দেখা করতে দিন, আমার বড় দরকার।

এই সময়টা নিখিলের পাঠচর্চার সময় এবং কোন কারণে কেউ তাকে এ সময় যেন বিরক্ত না করে, এমন হুকুম দরোয়ানের উপর দেওয়া আছে। সুতরাং দরোয়ানের দিকে চাইতেই সে বেচারা কৈফিয়ৎ দিতে শুরু করলে, হুজুর, বহ্ শুন্‌তি নহী। মঁয়নে বহুৎ কহা; কিসী তরহ্‌সে উস্‌কো হটা নহী সকা। কহ্‌তি হয় আপ্‌কে সাথ মুলাকাৎ নহী করবানসে পিছে আপ গুস্‌সা হোয়েঙ্গে। আওরৎ হয় সাব। হুকুম মিলে তো—। হুকুম পেলে সে স্ত্রীলোকটির উপর কি জাতীয় বীরত্ব দেখাতে পারে, সে সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ না ক'রে নিখিলনাথ তাকে ডেকে আনতে বললে।

তার নিজস্ব আস্তানায় স্ত্রীজনসমাগম প্রায় ঘটেই না, সুতরাং মনে মনে অবাক হয়ে যখন সে আকাশপাতাল ভেবে কিছু ঠিক করতে পারছে

না, এমন সময় পর্দা সরিয়ে একটি অপরিচিত তরুণী এসে ঘরে প্রবেশ করলে। বিস্ময়ের উপর বিস্ময় অনুভব ক'রে নিখিলনাথ তার দিকে জিজ্ঞাসু চোখ তুলে চাইতে সে এগিয়ে এসে ক্লান্ত ভাবে বিনা আহ্বানেই একখানা চেয়ার টেনে ব'সে পড়ল। নমস্কার বা কোন প্রকার বাহ্য ভদ্রতা প্রকাশের কোন চেষ্টাই সে করলে না। নিখিলনাথ এই তরুণীটির ব্যবহারে উত্তরোত্তর বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। একে তরুণী তার অপরিচিতা, তার অভিজ্ঞতার মধ্যে এমন আর কখনও ঘটে নি। তা ছাড়া এই প্রকার অভিনব বাক্যবিহীন পরিচয়ে সে মনে মনে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। মেয়েটির পরিধানে একটি অনতিপরিচ্ছন্ন ধূসররঙের সিল্কের শাড়ি পিনদ্ধ বেষ্টনে তার তনুদেহযষ্টিকে এক আত্মসম্বৃত মর্যাদা দান করেছে এবং তার কর্মপটুতাকে সুপরিস্ফুট ক'রে তুলেছে। হাতে তার দুগাছি হাতীর দাঁতের প্লেন শাঁখা ছাড়া দেহে অন্য অলঙ্কারের চিহ্ন মাত্র নাই। অনবগুণ্ঠিত মাথার স্বল্পতরঙ্গায়িত কেশ প্রায় অযত্নবিন্যস্ত; মধ্যে ভঙ্গিমাহীন সরল সিঁথি সিন্দুরচিহ্নবিবর্জিত। অবেণীবদ্ধ কেশরাশি মাথার পিছনে অভ্যস্ত হাতে আঁট ক'রে একটা পরিপুষ্ট খোঁপায় বাঁধা। মেয়েটির পায়ে এক জোড়া রবারের হীল-শূন্য জুতো এবং তার অর্ধেক হাতকাটা ব্লাউসের গ্রাস থেকে যে হাতখানি তার কোলের উপর এসে নেমেছে, তাতে লালিত্যের চেয়ে সতেজ সাবলীলতার আভাস সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মেয়েটির চেহারা, পরিচ্ছদ, বসার ভঙ্গী প্রভৃতি সবসুদ্ধ নিয়ে তার মধ্যে যে একটি বৈশিষ্ট্য আছে, এক মুহূর্তে তা চোখে পড়ে। নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে নিখিলনাথ একদৃষ্টে বিস্ময়াবিষ্ট চোখে তাকে দেখছিল। সে সুন্দরী কি না সে কথা মনেই আসে না, বিস্ময়ের সঙ্গে মনে হয়, আশ্চর্য!

প্রায় আধ মিনিট নির্বাক থেকে মেয়েটি বিনা ভূমিকায় বললে,

আপনাকে দয়া ক'রে এখুনি আমার সঙ্গে একটু যেতে হবে। আপনার গাড়ি নিশ্চয় আছে, কিন্তু তাতে হবে না। কষ্ট ক'রে আমার সঙ্গে আপনাকে বাসেই যেতে হবে। দেরি করবার সময় নেই। বেশি দেরি করলে হয়তো আপনি তাঁকে বাঁচাতেই পারবেন না। এ যেন অনুরোধ নয়, অনুজ্ঞা। নিখিলনাথ কি বলবে ঠিক করতে না পেরে একটু ইতস্তত করতে লাগল। তারপর বললে, দাঁড়ান, ইন্-চার্জ যিনি আছেন তাঁকে একবার ব'লে আসি। মেয়েটি এবার একটু হাসল। সে হাসিতে দাক্ষিণ্যের কোন ভাষা ছিল না, বললে, কাউকে না ব'লে গেলেই আপনার পক্ষে বেশি নিরাপদ হবে। তাই বলছি, যেমন আছেন তেমনি আমার সঙ্গে বেরিয়ে আসুন। প্রশ্ন করবার কৌতূহল থাকে, পরে করবেন। তা ছাড়া যাঁকে দেখতে যাচ্ছেন, তাঁকে দেখলে আপনার প্রশ্ন করবার আবশ্যকও হয়তো আর থাকবে না। নিন, এখন দেরি করবেন না, আপনার স্টেথিস্‌কোপ এবং দু-একটা শেষ সময়ের ইন্‌জেক্‌শনের সরঞ্জাম পকেটে ক'রে আমার সঙ্গে বেরিয়ে আসুন। ডাক্তারী ব্যাগ নিয়ে বেরোবেন না, অন্যান্য আবশ্যক জিনিস আশা করি সেখানেই পাবেন। ব'লে মেয়েটি অত্যন্ত নিশ্চয়তার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে উঠল। নিখিলনাথ আর যেন দ্বিরুক্তি করবার শক্তি সঞ্চয় ক'রে উঠতে পারলে না। অত্যন্ত বাধ্য ছেলেটির মত দরকারী জিনিসগুলো পকেটস্থ ক'রে মেয়েটির পিছন পিছন বেরিয়ে পড়ল।

মেয়েটির সঙ্গে বেরিয়ে নিখিলনাথ মনে মনে তার পঠদ্দশার কথা স্মরণ করতে লাগল। কেমন ক'রে যেন তার মনে হ'ল যে, এর মধ্যে থেকে সেই দূর অতীতের গন্ধ পাওয়া য'চ্ছে। এই মেয়েটির ঋজু দেহ, দৃঢ় পদক্ষেপ, সতেজ কণ্ঠ নিখিলনাথের নারীপ্রভাবপরিশূন্য চিত্তে যে একটা মোহ এনেছিল, হঠাৎ তাকে একটা রূঢ় আঘাতে ভেঙে দিয়ে মেয়েটি তাকে বললে, আপনি অমন ক'রে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলবেন

না, এখান থেকেই বাসে উঠবেন। তারপর লেশমাত্র হৃদ্রতা না ক'রে কিংবা তার আদেশ এই পুরুষ-মানুষটি পালন করল কি না, সেদিকে দৃক্‌পাত মাত্র না ক'রে নিঃসংশয়ে সে পরের বাস-স্টপের দিকে এগিয়ে চ'লে গেল। স্ত্রীজাতির বিনয় বা রূঢ়তা তাকে যে এমন ভাবে বিচলিত করতে পারে, নিখিলনাথের এ অভিজ্ঞতা পূর্বে ছিল না। সে যেন হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে তার স্বপ্নলোক থেকে জেগে উঠল এবং তার আলুথালু মনটাকে সংহত ক'রে নেবার জন্যে বাস্-স্টপে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে তার পাইপটা বের ক'রে ধরিয়ে নিলে।

হাওড়া স্টেশনে মেয়েটি তার পাশ ঘেঁষে যাবার সময় ব'লে গেল, শ্রীরামপুর। পূর্বে এ সমস্ত ব্যাপারে যদিও সে একেবারে অনভ্যস্ত ছিল না, তবু এ কথা সে মনে না ক'রে থাকতে পারল না যে, তাদের যুগে তাদের দুঃখকে এমন শ্রীমণ্ডিত করবার উপায় তাদের ভাগ্যে ঘটে নি। যাই হোক, একেবারে কলকাতা ছেড়ে যে তাকে বাইরে যেতে হবে— এ কথা সে ভাবে নি। একবার তার মনে হ'ল যে, হাসপাতালের লোকেরা তার খোঁজ করবে; এবং বাইরে যাবার যে ক্ষীণ ছুতো সে দরোয়ানের কাছে দিয়ে এসেছে, এই মেয়েটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার রূপটা শ্রোতাদের কাছে বেশ একটু রোমাণ্টিক হয়েই দাঁড়াবে; ভেবে সে একটু মুচকে হাসলে।

শ্রীরামপুর স্টেশনে নেমে এদিক-ওদিক চেয়ে সে কোথাও মেয়েটিকে দেখতে পেল না। হঠাৎ তার মনে হ'ল যে, কোন চক্রান্তের কুহকে প'ড়ে কোন ব্যক্তিগত বিপদের মধ্যে পড়বে না তো! কিন্তু তখনই তার মনে তার ঘরের মধ্যেকার অসহায় ক্লান্ত অথচ আত্মসমাহিত সেই মেয়েটির ছবি জেগে উঠল। মন থেকে সমস্ত দ্বিধা দূর ক'রে দিয়ে সে এগিয়ে গেল গেটের দিকে। এখানেও মেয়েটির সন্ধানে সে সাবধানে চার দিকে চেয়ে দেখলে, তখন সন্ধ্যা প্রায় সমাগত। গেট থেকে শহরের

রাস্তায় বেরিয়ে সে কোন্ দিকে যাবে ঠিক করতে না পেরে সামনেই একটা খাবারের দোকান দেখে সেখানে গিয়ে কিছু খাবার কিনলে। ইচ্ছা এই যে, জল খাওয়ার ছলে এখানে অপেক্ষা ক'রে দেখবে যে, মেয়েটির কোন হদিস করতে পারে কি না।

নানা চিন্তায় অন্যমনস্কভাবে সে এদিক ওদিক দেখছে। একটা বাংলা কুকুর তার কাছে এসে দাঁড়াল; অল্প অল্প খাবার ভেঙে সে তাকে দিচ্ছে আর দেখছে। একটা ছাড়া-গরু শুকনো শালপাতার ঠোঙা চিবিয়ে অনির্বচনীয় আনন্দ-রস সম্ভোগ করছে। যেসব লোক যাতায়াত করছে তার অধিকাংশই ওড়িয়া কুলি। নিখিলনাথ ভাবলে, উঃ, এরা কি সমস্ত বাংলা দেশে ছেয়ে ফেলেছে! সাহেবের-পোশাক-পরা একটা লোক এমন ক'রে রাস্তায় দাঁড়িয়ে খাবার খাচ্ছে দেখে তারা মাঝে মাঝে তাদের কুতূহলী দৃষ্টি তার দিকে নিক্ষেপ করছে। একটি নিম্নজাতীয়া মেয়ে চলেছে, হাতে একটা ময়লা গামছার পুঁটলি, বয়স হয়েছে, তবু পাড়াগাঁয়ের সাবলীলতা তার চলনে। নিখিলনাথ তার দিকে একবার চেয়ে মনে মনে শহরের কলেজের মেয়েদের সঙ্গে তুলনা ক'রে বিরক্ত হয়ে ভাবলে, ওরাই আবার দেশের মা হবে! আবার কুকুরটাকে খানিকটা খাবার দিয়ে শালপাতাটা গরুটার দিকে ফেলে দিলে। পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে মুখ মোছবার সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার দৃষ্টি মেয়েটির দিকে আপনা থেকেই ফিরল। মেয়েটি তখন একটু দূরে গিয়েছে। এমন সময় ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটি তার দিকে একবার চেয়ে আবার আপন মনে চলতে লাগল।

এক মুহূর্তে নিখিলনাথের চমক ভেঙে গেল। তার স্পষ্ট মনে হ'ল, মেয়েটি সে-ই। মেয়েটির এই আশ্চর্য পরিবর্তনে সে একেবারে অবাক হয়ে গেল এবং মনে মনে তারিফ না ক'রে থাকতে পারল না।

সাবধানে মেয়েটির উপর নজর রেখে সে দূরে দূরে তাকে অনুসরণ ক'রে

খাবারের দাম চুকিয়ে দিয়ে মেয়েটির অনুসরণ করলে। পথ তখন মোড় ফিরেছে, মেয়েটিকে আর দেখা যায় না, তবু এবার সে নিশ্চিন্ত হয়েই চলতে লাগল। অনেক ঘুরে গিয়ে পথটা দু-ভাগে চ'লে গিয়েছে। তার একটা কাঁচা রাস্তা। কোন্ পথে যাবে যখন ভাবছে, তখন ঘুরে সেই কাঁচা রাস্তা পার হয়ে মেয়েটিকে সে একটা আমবাগানের মধ্যে ঢুকতে দেখল। এমনি ক'রে নানা রাস্তা ঘুরে, আমবাগানের মধ্যে দিয়ে, এঁদো পুকুরের পাড় ভেঙে ঘণ্টাখানেক পরে মেয়েটির সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড বাগানের মধ্যে একটা পোড়ো বাড়িতে গিয়ে উঠল।

চারদিকে বড় বড় আমগাছ যেন প্রেতলোকের প্রহরী। দু-তিনটা ঘর পার হয়ে একটা বড় হল-ঘর। তার এক কোণে একটা মাদুরের উপর কে একজন শুয়ে।

মেয়েটি এসেই একটা লণ্ঠন ধরালে। নিখিলনাথ দেখলে যে, ঘরে কোনও আসবাব নেই। কেবল রোগীর বিছানার পাশে একটা মাটির কলসী, গেলাস আর একটা মালসা। মেয়েটি রোগীর পাশে গিয়ে ব'সে আস্তে আস্তে তার কপালে হাত দিলে।

কে, সীমা? ব'লে রোগী একটা কাতর ধ্বনি করলে।

হ্যাঁ, দেখুন কে এসেছেন।

নিখিলনাথ এগিয়ে এল। সীমা লণ্ঠনটা তুলে ধরলে। আলো-ছায়ায় মিশিয়ে মুমূর্ষুর মুখটা ভীষণ দেখাচ্ছে। চোখ দুটো কোটরে ব'সে গেছে, নাকটা খাড়া হয়ে উঠেছে; একটা ক্ষুধার্ত শকুনি যেন। নিখিলনাথ স্টেথিস্কোপটা বের ক'রে ডাক্তারের কর্তব্যসাধনের উদ্দেশ্যে মাদুরের কাছে গিয়ে উবু হয়ে বসল। উঃ; কি ভয়ানক চোখ লোকটার, কালো কাগজের জমির উপর যেন ভূতের চোখ আঁকা; তেমনি পাকানো, তেমনি নির্মম। লোকটা একটা হাত বের ক'রে ডাক্তারের হাত ধরলে। শিরদাঁড়াটা বেয়ে যেন একটা বরফের বিদ্যুৎ চমকে

গেল। মৃত্যুর অন্ধকার-কবরের ভিতর থেকে বাড়ানো সেই হাত। অনেক দিন পর্যন্ত নিখিলনাথ সে স্পর্শ ভোলে নি। রুগী যেন স্পষ্ট তার নাম ধরে ডাকলে, নিখিল! নিখিল অবাক হয়ে গেল। এই ব্যক্তি কি তার পরিচিত? এ কে? এ মুখ সে কখনও দেখেছে ব'লে তো মনে করতে পারে না! আকাশ-পাতাল নানা চিন্তা করতে করতে সে রোগীর নাড়ী দেখতে লাগল। এইবার রোগী আবার সুস্পষ্ট স্বরে বললে, চিনতে পারছিস না, নিখিল? আমার এই হাতখানা দেখলে কি কারুর স্টীমারঘাটে গোরা ঠ্যাঙাবার কথা মনে পড়বে?

এক মুহূর্তে নিখিলের চোখের উপর থেকে অতীতের বিরাট কালো পর্দাটা উঠে গেল—সে চেঁচিয়ে উঠল, সত্যদা!

চুপ, চেঁচাস নে ভাই। তুই ডাক্তার হয়েছিস নিখিল, বেশি যন্ত্রণা আর না পেতে হয় এমন একটা ব্যবস্থা কর্। বাঁচবার আর ক্ষমতা নেই, ভাই—সাধ নেই, তা বলছি নে। অনেক সাধই বাকি র'য়ে গেল। পাগলীটা বোঝে না, তাই ডাক্তার ডাক্তার ক'রে আমায় অস্থির করে। তোর কাছে পাঠিয়েছিলুম, বাঁচবার জন্যে নয়, ওকে তোর জিম্মায় দিয়ে যাব ব'লে॥ তুই নিজে যদি কোন দিন ওর পরিচয় পাস, তো দেখবি এমন রত্ন জগতে বেশি নেই।

নিখিলনাথ অবাক হয়ে সত্যবাবুকে দেখছিল। সেই দৃঢ়পেশী, ছ-ফুট-লম্বা, বুক-চওড়া, নির্ভীক দেশভক্ত সত্যদা—তাদের দলের নেতা, সে কি এই! তখনকার দিনে, সত্যদাকে কি ভালই বাসত সকলে! সত্যদার একটা হুকুমে অনায়াসে প্রাণ তুচ্ছ করতে পারা ওদের পক্ষে কিছুই কঠিন ব্যাপার ছিল না।

নিখিলের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। বললে, সত্যদা কেমন ক'রে এ দশা তোমার হ'ল? তোমাকে তো ধরতে পারে নি!

সত্য বললে, ছিঃ, ভাই নিখিল! তুই এমন দুর্বল হয়ে গেছিস!

চোখের জল ফেলছিস! ছি! ব'লে সে সস্নেহে নিখিলের হাতে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, ধরতে পারে সি বটে, কিন্তু যাদের ধরেছিল তারাই বুঝি বেঁচে গেছে রে! কি ক'রে যে আমাদের দিন কেটেছে পাঁচটা বছর, তা বলতে পারবি নে। তারপর ভেলোয়াবের জঙ্গলে ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। পুলিসের সঙ্গে চার কিস্তি লড়াইয়ে আমাদের পাঁচজনই মারা গিয়েছিল, তারপর রসদ গেল ফুরিয়ে। কেবল দু-দুটো গুলির চোট খেয়েও এই প্রাণটা বের হয় নি। পুলিসও অল্প বীরত্ব দেখায় নি। তাদের মধ্যে চারজন ইন্‌স্‌পেক্টর ধ'রে মৃত্যু-সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল তিয়াত্তর জন। তবু দু দিন ধ'রে তারা সমানে লড়েছে, বার বার হটে গেছে, আবার নতুন বিক্রমে লড়েছে। নিখিল স্তব্ধ হয়ে শুনতে লাগল।

২৩

আবৃত লণ্ঠনের স্বচ্ছতিমিরালোকে জীর্ণ গৃহ-কঙ্কালের শ্মশানক্ষেত্রে স্তিমিতপ্রায় প্রাণশিখার শেষ বহ্নিজ্বালা উদ্গীরণ ক'রে সত্যবান তার জীবনলীলার অচিন্তনীয় অদ্ভুত কাহিনী ব'লে গেল। শুনতে শুনতে নিখিলনাথ তার চোখের জল সামলাতে পারে নি। সত্যবানের অসীম ধৈর্য, তার সঙ্গীদের অদম্য একনিষ্ঠতা, সীমার একাগ্র দেশভক্তি তাকে সম্পূর্ণ অভিভূত ক'রে ফেলেছিল।

কথা মোটামুটি শেষ ক'রে সত্যবান বললে, সব কথা শুনলে তোর মনে হবে, সত্যদা তোকে একটা উপন্যাস শোনাচ্ছে। তা ছাড়া সব কথা বলবার মত সময়ও বোধ হয় আর হবে না। আজ কদিন হ'ল ভিতর থেকে একটা কাঁপুনির মত ধরছে থেকে থেকে। তুই এসেছিস, বেশ হয়েছে। এটা কথা না ব'লে আমি মরতে পারছিলুম না।

নিখিল বাধা দিয়ে বললে, মরার তোমার দেরি আছে সত্যদা!

তোমার কাজ তো ফুরোয় নি এখনও। এখনই তোমার মুখ থেকে মরার কথা শুনতে আমরা রাজি নই। হাতটা একটু দেখি!

এই ব'লে নিখিল তার চিকিৎসকের কর্তব্যে প্রবৃত্ত হ'ল। সত্যবান একটু মৃদু হাসলে, কিন্তু বাধা দিলে না। বাধা দেবার ক্ষমতাও তার আর বেশি ছিল না। অনেকক্ষণ ধ'রে খুব ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে আশার কোন কিছু অবলম্বন আছে ব'লে নিখিলনাথের মনে হ'ল না।

সত্যবানকে একদিন সে নিজে প্রাণ দিয়েই ভাল বেসেছে, গুরুর মত ভক্তি করেছে। দুর্জয় জীবনবহ্নির সেই দীপ্তশিখা আজ স্তিমিত-প্রায়। অজ্ঞাত অখ্যাত প্রতাড়িত সত্যবান, তার ওই কঙ্কালটুকুর মধ্যে কোথাও কি এতটুকু স্ফুলিঙ্গ জীবিত নেই, যাকে তার সমস্ত চিকিৎসাবিদ্যার মন্ত্রশক্তিতে আবার সেই প্রদীপ্ত শিখায় পরিণত করতে পারে? ব্যথিত ব্যাকুল চিত্তে সে চুপ ক'রে রইল।

নিঃসহায় নিরাশার ম্রিয়মাণ ছায়া সম্ভবত তার মুখে প্রকাশ পেয়ে থাকবে। সত্যবান তার মুখের দিকে চেয়ে হেসে বললে, আমাকে কি ছেলেমানুষ পেয়েছিস রে? চিকিৎসার জন্যে আজ তোকে আমি ডাকি নি। সহজে আমার কথা বুঝবে এমন লোক আর আমার মনে পড়ল না। তাই তোকে এই বিপদের মধ্যে ডেকে এনেছি, নইলে কাকে আর বিশ্বাস করতে পারি, বল্‌? অথচ না ব'লেও তো আমার নিস্তার নেই। তাই তোকে বারণ করছি যে, যে কয় ঘণ্টা বেঁচে আছি তোর চিকিৎসার উৎপাত থেকে আমায় রেহাই দে।

কিন্তু নিখিল ডাক্তার, তার কর্তব্য তাকে করতেই হবে। সে তার পকেট-কেস বার ক'রে সরঞ্জাম প্রস্তুত করতে করতে বললে, দাদা, আমরা কি প্রাণ দেবার মালিক? কে বলতে পারে, প্রাণশক্তি কখন কোন্ অবস্থায় কেমন ক'রে ধীরে ধীরে নিজেকে প্রকাশ করে, কেমন ক'রে আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎবাণী ব্যর্থ ক'রে দিয়ে নিজের কাজটুকু

ক'রে তোলে। এই ব'লে সে একটা ইন্‌জেকশান দেবার পূর্বে অগ্নিমাত্রগায় একটা বাহুতে অ্যালকোহল ঘষতে লাগল। অনেকক্ষণ কথা বলার জন্যই বোধ করি একরকম নিশ্চেষ্ট হয়ে সত্যবান চুপ ক'রে প'ড়ে রইল।

২৪

সে দিন বৃহস্পতিবার। নন্দ অজয়কে নিয়ে কমলার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে।

কমলা নন্দকে বললে, দেখুন, এখন আমি অনায়াসে বাড়ি গিয়ে খোকাকে দেখে আসতে পারি। তাতে দিদির সঙ্গেও দেখা হয়; আর আপনারও কাজের ক্ষতি ক'রে ওকে নিয়ে ছুটোছুটি করতে হয় না।

নন্দ বললে, ভারি তো সপ্তাহে দু-এক দিন! এতে আর আমার কাজের কি-ই বা ক্ষতি হবে? আর তা ছাড়া সমস্ত সময়টাই তো কাজের ঘানিতে জুতে থাকি; তার থেকে মুক্তি পেয়ে আর এই সময়টুকু তবু একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচবার অবসর পাই। আর বাড়িতে গেলে তোমার দিদির আঁচলের তলায় তুমি এমনই গা-ঢাকা দাও যে, তোমার তো পাত্তাই পাওয়া যায় না।

তা কি করব? দিদি বেচারী একলা একলা চিরটা কাল দাসীবৃত্তি ক'রে মরল। তার উপরে তো খোকার দৌরাত্ম্য আছেই।

আর আমাদের খাটুনিটা বুঝি দেখতে পাও না! সকাল থেকে দিন ক'রে এই ব্যবসার বোঝা টেনে টেনে হয়রান হয়ে যাচ্ছি! লাগামটা খুলে দুটো সরস তৃণখণ্ড মুখে ক'রে মুখের স্বাদটা বদলাব, তা বুঝি আর সহ্য হয় না! চিরটা কাল ঘরে ফিরে আমার সেই দানা ছাড়া বুঝি আর গতি নেই!

কথায় এমন স্পষ্ট ইঙ্গিত নন্দলাল ইতিপূর্বে কোন দিন করে নি। কথাটা ব'লে যেমন তার সঙ্কোচ হ'ল, কথাটা ব'লে ফেলতে পেরে তেমনি তার মনের অনেক দিনকার প্রচ্ছন্ন একটা অত্যন্ত অস্বস্তিকর ভার যেন অনেকটা লঘু বোধ করতে লাগল। আসলে চিত্ত তার অন্তরে অন্তরে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। চিরকাল এমনি একটা মূক অভিব্যক্তিহীন জড়তার অনিশ্চয়তার চাপে হৃদয়ের সমস্ত ক্ষুধাকে নিষ্পিষ্ট ক'রে মারতে হবে—সংসারে এই বা কি নিয়ম! প্রকৃতির অপরাজেয় বুভুক্ষার নিরন্তর তাড়নার বিরুদ্ধে তার সামাজিক ভদ্রতায় অভ্যস্ত অন্তঃকরণ যুদ্ধ ক'রে ক'রে শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। কত দিন সে আর সকলের মুখ চেয়ে নিজেকে এমন ক'রে বঞ্চিত করতে পারে! তাই সে আজ এই সামান্য ইঙ্গিতটুকু ক'রেও যেন একটু স্বস্তি অনুভব করলে,—রক্তমোক্ষণ ক'রে নিলে রক্তের চাপে ব্যথিতমস্তিষ্ক রোগী যেমন আরাম পায়।

কমলার মুখের কোন পরিবর্তন হ'ল না। নন্দলাল অনেক লক্ষ্য ক'রেও বুঝতে পারলে না যে, কথাগুলোয় জ্যোৎস্নার মনে কোন ভাবান্তর জন্মিয়েছে কি না! কমলা সহজ করুণার সুরেই বললে, সত্যিই আপনাকে খুব খাটতে হয়। সেই সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি বিশ্রামের সময় তো পানই না, তার ওপর খোকনকে নিয়ে যদি দৌড়াদৌড়ি করতে হয়—। তাই বলছিলাম যে, এখন তো নিজেই আমি আপনার বাড়ি যেতে পারি,—আপনার কষ্ট হয়, তাই ভেবেই বলছিলাম। তা ছাড়া সত্যিই দিদির সঙ্গে দেখা তো হয়েই ওঠে না। সে বেচারার সেই রান্না আর ভাঁড়ারের আবর্জনা ঠেলেই প্রাণটা গেল। আপনারা শুধু ইচ্ছে করলেই দশটা জায়গায় যেতে পারেন, দশখানা বই প'ড়ে মনের খোরাক বানাতে পারেন; দিদির তো তাও নেই। তাই ইচ্ছে করে, গিয়ে তাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে গল্পগাছা ক'রে তাঁর মনটাকে একটু বিশ্রাম দিতে।

তবেই হয়েছে, তা আর দিতে হয় না। মনে নেই, বই প'ড়ে শোনাতে গেলে, হয় নাক ডাকিয়ে ঘুম দিত, আর না হয় 'ঐ বাসনগুলো বুঝি ভগলু ফেলে দিলে', 'ঐ যা, খোকনকে দুধ খাওয়ানো হয় নি' ব'লে স'রে পড়ত! মাছটা জল থেকে ডাঙায় ওঠালে তার বায়ুপরিবর্তন হয় বটে, তবে কিছু উৎকট রকমই হয়। প্রকৃতি সকলের জন্যই এক ব্যবস্থা করেন নি, বুঝলে? ব্যবস্থাটা হয় স্বভাব অনুসারে। স্বভাব কারো স্থাবর, কারো বা জঙ্গম। কাউকে টেনে বাড়ি থেকে বার করা যায় না, আবার কেউ বা একদণ্ড বাড়িতে তিষ্ঠুতে পারে না।

যেমন আপনি, না? বাড়িতে তিষ্ঠোতে পারেন না!

বাপ, তোমার দিদির দাপটে তিষ্ঠোবার জো আছে? বাড়িতে ঢুকেছ কি এক কাহন ফর্দ আর নালিশ আর কৈফিয়ৎ।

হ্যাঁ, তা বই কি! দিনরাত কোথায় আপনার ত্রিফলার জল, কোথায় মিশ্রির জল, আপনি কি খাবার ভালবাসেন—এই সব ক'রে ক'রে মরে কিনা? দিদি টিকটিক না করলে তো স্নানটা পর্যন্ত ভাল ক'রে করেন না, ময়লা কাপড়ের ওপর ধোপ-জামা প'রে বেরিয়ে যেতেও আটক নেই। নখগুলো পর্যন্ত দিদি ধ'রে কেটে দিলে তবে কাটা হয়।

শেষটা করে আত্মরক্ষার্থে, বুঝলে কিনা।

কমলা হেসে বললে, কেন, দিদিকে কি খামচে দেবার ভয় দেখান নাকি?

না, শ্বাপদসঙ্কুল জায়গায় বসবাস করতে হ'লে সশস্ত্র থাকতে হয়।

হ্যাঁ, তাই তো, আমরা সব শ্বাপদ, আর আপনি?

আপদ। মাঝে মাঝে আসি ব'লে বিদায় দেবার ফন্দী আঁটছিলে এক্ষুনি।

এবারেও বাণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল। কমলা কথায় কিছুমাত্র কর্ণপাত

দা ক'রে উঠে বললে, একটু বসুন, দিদির জন্যে একটা জিনিস দেব, নিয়ে যাবেন। এই ব'লে সে খোকনকে নিয়ে ভিতরে চ'লে গেল।

নন্দলাল এবার মনে মনে একটু লজ্জিত এবং নিজের উপর এক রকম বিরক্তই হ'ল। সে চুপ ক'রে ব'সে ভাবতে লাগল, এমন সময় ঘরে এসে ঢুকল নিখিলনাথ।

২৫

সতেজ সরল দেহ, উন্নত ললাটে প্রতিভার দীপ্তি। তার গঠনের মধ্যে, তার গতিভঙ্গীতে এবং তার অযত্নন্যস্ত ঈষৎ তরঙ্গিত কেশবিন্যাসে যে একটি স্বাতন্ত্র্যের, একটি জ্ঞানীজনসুলভ আভিজাত্যের প্রভাব পরিস্ফুট হয়েছে, সেইটেই সকলের চোখে পড়ে। দেখলেই মনে হয়, লোকটি জনতার মধ্যে থেকেও জনতা থেকে স্বতন্ত্র ও সুদূর। একে অবহেলা করবার মত ধৃষ্টতা সঞ্চয় করা চলে না, আবার এর সঙ্গে সহসা আত্মীয়তা করতে অগ্রসর হওয়াও যেন ধৃষ্টতা। ইংরেজী পোশাকটাও এর অঙ্গে একটি বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে ব'লে মনে হয়।

নিখিলনাথ ঘরে ঢুকতে নন্দলাল নিজের অজ্ঞাতসারেই চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল। কেন জানি না, সে একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল মনে মনে, এবং এই লোকটির সামনে নিজেকে কেমন খেলো মনে হতে লাগল। নিজের এই চাঞ্চল্যে বিরক্ত হয়ে, নিজের আহত আত্মমর্যাদাটুকুকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যেই বোধ করি, সে উদ্ধতভাবে গিয়ে আবার চেয়ারে চেপে বসল। পূর্বের পরিচয় সত্ত্বেও কোন প্রকার সময়োচিত সম্ভাষণ তার মুখ থেকে বেরতে চাইল না, এবং অকারণেই একটা অস্বস্তির সঙ্গে মনে হতে লাগল যে, জ্যোৎস্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসার জন্যে এই লোকটার কাছে একটা কৈফিয়ৎ দিতে হবে। মনটা তার বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চাইলে। নিখিলনাথের

দিক থেকে জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে সে কাঠ হয়ে ব'সে রইল এবং একটা সঙ্গত কৈফিয়ৎ খাড়া ক'রে তুলতে কেনই যে সে নিজের অগোচরে মাথা ঘামাতে লাগল, তা পরে নিজেই সে বুঝতে পারলে না।

নিখিলনাথ শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করলে, আপনাকে এখানে আর একদিন দেখেছি, না? আপনি তো জ্যোৎস্না দেবীর কাছে এসেছেন? দরোয়ানকে বলেছেন তো?

-নন্দলাল খানিকটা ন'ড়ে চ'ড়ে ব'সে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। ব'লে অকারণে এতক্ষণ পরে অকস্মাৎ একটা নমস্কার করলে। তারপর বিনা প্রশ্নেই ব'লে যেতে লাগল, ওঁর ছেলেটিকে নিয়ে আসতে হয় কিনা; মানে, ছেলেটি আমাদের কাছেই থাকে তাই তাকে নিয়ে— মাকে ছেড়ে থাকে নি, ছেলে মানুষ— তাকে নিয়েই উপরে গেছে—আসবে এখুনি। দরোয়ানকে বলব আপনি এসেছেন?—কথাগুলো যেন নির্বোধের মত শোনাচ্ছে—সহসা এই রকম অনুভব ক'রে নন্দ নিজের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে থেমে গেল।

নন্দলালের অদ্ভুত কথাবার্তায় একটু অবাক হ'লেও নিখিলনাথ আর কোন বাক্যব্যয় না ক'রে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে কমলের জন্তে অপেক্ষা করতে লাগল।

নন্দলাল মনে মনে তার নিজের কথাগুলো আলোচনা ক'রে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। রাগও হ'ল নিজের উপর। ভাবলে, লেখাপড়া শিখে এত মানুষ চরিয়ে এসে একটা ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতে শিখলাম না। সে একটু ভেবে-চিন্তে নিজেকে সংযত ক'রে নিয়ে সহজভাবেই জিজ্ঞাসা করলে, জ্যোৎস্নাকে আর কতদিন থাকতে হবে? ওর কোর্স তো শেষ হয়ে এল, না?

নিখিল বললে, হ্যাঁ, আর মাস চারেক। তারপর অবশ্য ওঁর ইচ্ছা হ'লে এইখানেই কাজ পেতে পারবেন।

নন্দ ভালমানুষের মত জিজ্ঞাসা করলে, এখান থেকে যারা পাস করে, তাদের সকলকেই আপনারা কাজ দেন বুঝি ?

না, তা কেমন ক'রে দেব! যারা সব চেয়ে ভাল তাদের মধ্যে দুজনকে প্রতিবছর আমরা এক বছরের জন্যে কাজ দি। ওঁর কাজে এবং ব্যবহারে সকলেই খুব খুশি, সুতরাং কাজ যদি উনি করেন তো আমরা সকলেই খুব খুশি হব।

এত খুশি হাওয়ার খবরে নন্দর মনটা আবার ভারী হয়ে উঠল। সে অত্যন্ত সংক্ষেপে একটি মাত্র 'হুঁ' দিয়ে চুপ ক'রে রইল। সংসারে অনভিজ্ঞ নিখিলনাথ জ্যোৎস্নার আত্মীয়ের কাছে জ্যোৎস্নার গুণের কথা বললে তিনি আনন্দ পাবেন মনে ক'রে বললে, কি আশ্চর্য অধ্যবসায় ওঁর! এত অল্পদিনের মধ্যে উনি এত চমৎকার ক'রে সব আয়ত্ত ক'রে নিয়েছেন—দেখলে অবাক হতে হয়। শেখবার ইচ্ছাও ওঁর খুব।

নন্দলাল অনাত্মীয় একজন পুরুষের এই প্রশংসায় মনে মনে উত্তপ্ত হয়ে উঠল। কিন্তু আবার একটা 'হুঁ' ব'লে সে চুপ ক'রেই রইল। অন্যমনস্ক নিখিল নন্দের মনোভাব বুঝতে না পেরে ব'লে যেতে লাগল, আর সকলের চেয়ে আশ্চর্য এই যে, শুধু কাজের জন্যে নয়, ওঁর চরিত্রের গুণে উনি সকলেরই শ্রদ্ধা লাভ করেছেন—যা এখানকার কোন নার্সের ভাগ্যেই প্রায় ঘটে না।

এইবার নন্দর কৌতূহল উদ্দীপ্ত হ'ল, বললে, কেন? এক নিমেষে তার বাঙালীর প্রাণটা একটা কুৎসার আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল।

নিখিল সেদিকে লক্ষ্য না ক'রে ব'লে গেল, তার কারণ অধিকাংশ নার্স ই ডাক্তারদের মন যুগিয়ে চলে,—অর্থাৎ তাদের চলতে হয়। তাদের চাকরি, তাদের সম্পূর্ণ ভবিষ্যৎ সবই সেই ডাক্তারদের কৃপার উপরই প্রায় নির্ভর করে কিনা। লেখাপড়া বা কালচার ব'লে কোন বস্তুর সংস্পর্শ এদের অধিকাংশই কখনও তো পায় না, কাজেই অল্প

উপায়ে ডাক্তারদের মনস্তুষ্টি করতে। তাদের বাধেও না—আর। ভেবে দেখলে তা ছাড়া তাদের গতিই বা কি?

নন্দ মনে মনে ভাবলে একবার জিজ্ঞেস করে, খুব বুঝি চলে! এই রসাল সংবাদটা নেবার জন্যে তার মনটা লোভিয়ে উঠল। কিন্তু তার ভরসায় কুলোল না। নিরীহ ভাবে বললে, তাই তো, নার্সদের তো তা হ'লে বিপদ কম না!

না, সেটা অবশ্য যার যার চরিত্রের বা মতিগতির উপর নির্ভর করে। জ্যোৎস্না দেবী সম্বন্ধে ওকথা একেবারেই খাটে না। দেখুন না, এখনকার একটা বদ রীতি আছে—ডাক্তারেরা নার্সদের 'তুমি' ব'লে সম্বোধন করেন। কেবল ওঁরই বেলায় দেখি ব্যতিক্রম হয়েছে। অথচ আশ্চর্য এই যে, ওঁর বয়স বেশি নয়।

জ্যোৎস্নার প্রসঙ্গ যে এই অল্পভাষী গম্ভীর মানুষটিকে বাঙ্ময় করেছে, এ কথা বুঝতে নন্দলালের বিলম্ব হয় নি। কিন্তু কেন? এই প্রতিষ্ঠানের এত বড় একজন ডাক্তারের একা সামান্য নার্স সম্বন্ধে এত উৎসাহ কেন? এটা তো ভাল কথা নয়! মানুষ কি কোথাও একটু নিশ্চিন্ত হবার জায়গা পাবে না? বয়স বেশি নয়! বয়স বেশি নয় তো তোমার কি? নার্স—নার্স! তার বয়স বেশি কি কম—এসব কথা ওর মনে হবেই বা কেন? আর জ্যোৎস্নাই বা কেমন? পড়াশুনা করবে, কাজ শিখবে, বাস্, চুকে গেল। তা নয়, এই সব ডাক্তারকে বাড়িতে ডেকে আড্ডা দেবার মানে কি?

ভাবতে ভাবতে নন্দর মনে আর শান্তি রইল না।

এমন সময় খোকাকে নিয়ে কমল এসে উপস্থিত হ'ল; এবং নিখিলনাথকে দেখে 'ওমা, আপনি কতক্ষণ এসেছেন?' ব'লে একটু অনুনয়ের সুরে বললে, আজ আমায় ছুটি দিতে হবে। ইনি আমার স্বামী। সেদিন তো আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম, না, ডাক্তার রায়?

হ্যাঁ, এতক্ষণ ওঁর সঙ্গে আপনারই কথা হচ্ছিল। আজ তবে আমি যাই। কাল দুপুরবেলা তা হ'লে আপনাকে ক্যাম্বেলে নিয়ে যাব ওদের মিউজিয়মটা দেখাতে। আপনি প্রস্তুত থাকবেন।

কমল বিনীতভাবে মাথা হেলিয়ে বললে, আচ্ছা।

২৬

নিখিলনাথ নন্দকে নমস্কার ক'রে বেরিয়ে গেল। কমল নিতান্ত ভদ্রতা এবং সম্ভ্রম ক'রেই তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল।

এক মিনিট নন্দ এবং কমল দুজনেই নিস্তব্ধ হয়ে রইল। উঠে গিয়ে বিদায় দিয়ে আসবার মত আদিখ্যেতায় নন্দর গাত্রদাহ উপস্থিত হয়েছিল। বস্তুত নিখিলনাথের সম্বন্ধে কমলের কোন ব্যবহারকে বিকৃত ক'রে না-দেখার মত শিক্ষা, চরিত্র বা মেজাজ তার নয়। সে গুম হয়ে ব'সে রইল; এবং কমল তার এই আকস্মিক গাম্ভীর্যের কারণ বুঝে উঠতে না পেরে মনে মনে একটু অবাক হ'ল। অল্পক্ষণ পূর্বেও তো নন্দ তার সঙ্গে লঘু আনন্দের সঙ্গে আলাপ করেছে।

কমল এই গুমোটটাকে হাল্কা করবার জন্যে একটু হেসে বললে, এইটে দিদিকে দেবেন। আমি ব'সে ব'সে নিজ হাতে এই ব্লাউজটা তৈরি করেছি। দেখুন তো কাজটা পছন্দ হয় কি না? দিদি নিশ্চয় খুব খুশি হবে।

নন্দলালের মন থেকে নিখিলনাথ-ঘটিত উত্তাপ তখনও জুড়িয়ে যায় নি। বিশেষত নিখিলনাথের সঙ্গে জ্যোৎস্নায় ক্যাম্বেলে বেড়াতে যাওয়ার কথাটা (নন্দ ওটাকে বেড়াতে যাওয়ার অছিলা ব'লেই ধ'রে নিয়েছিল) তার মনে যে জ্বালা ধরিয়েছিল, একটু বিরক্তির মধ্যেই তার ঝাঁজটুকু নন্দর মুখ থেকে বেরিয়ে এল। সে বললে, [illegible] ডাক্তারদের সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েছ দেখছি। তোমাকে এখানে

যত নার্স আছে, সকলকেই কি তিনি পালা ক'রে অমনি অনুগ্রহ বিতরণ করেন, না ওটা তোমার বেলাতেই তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ?

কমল প্রথম কথাটা ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারে নি। তার ঝাঁজটুকুতে যে অপমান লুকিয়েছিল, তা রূঢ়ভাবেই তাকে আঘাত করলেও সে আত্মসম্বরণ করবার প্রয়াসে শুধু বললে, মানে?

মানে, অনুগ্রহটা কোন্ তরফের—আমি হতভাগাই শুধু বঞ্চিত হলাম?

কমল নন্দলালের কাছ থেকে এই রকম কথা কখনও আশা করে নি। কখনও শোনেও নি।

এতদিন নন্দলালের সমাজশাসিত চিত্ত নিজের অশোভন চেষ্টার লজ্জায় নিজেকে প্রাণপণে সংযত ক'রে এসেছে—কমলকে তারই আশ্রয়ে একান্ত অসহায় এবং বঞ্চিত জেনে। কিন্তু আজ তাকে অন্যের সঙ্গসুখে সুখী কল্পনা ক'রে তার অনুকম্পা শুষ্ক হয়ে গেল এবং মুহূর্তে তার লোভাতুর চিত্ত নিষ্ঠুর হয়ে উঠল।

যদিও নন্দলালের চিত্তের উন্মুখীনতার কথা কমলের অবিদিত ছিল না, তবু নন্দলালকে সে ভদ্র সংযত এবং তার প্রতি করুণার্দ্র ব'লেই জেনে এসেছে। অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে এমন রূঢ় কুৎসিত কথা নন্দলালের কাছ থেকে শুনে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। নন্দলালের কথা-গুলো খানিকক্ষণ তার আহত মস্তিষ্কে প্রবেশ করবার পথ না পেয়ে একটা দুর্বৃত্ত মানুষের মুখের মত প্রত্যক্ষগোচর হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে যেন তাকে বিদ্রূপ করতে লাগল। কি করবে, কি উত্তর দেবে, কেমন ক'রে এই ভদ্রবেশী দুর্বৃত্তকে এই অপমান করার অত্যাচার থেকে নিবৃত্ত করবে, কিছুই যেন ভেবে উঠতে পারল না। এবং দিশাহারা অসহায় চিত্তের আকস্মিক উত্তেজিত আবেগের তাড়নায় হঠাৎ এক নিমেষে উঠে খোকনকে কোলে নিয়ে দ্রুত ভিতরে চ'লে গেল। পাশের

কারো চোখে পড়ে, এই ভয়ে সে স্নানের ঘরে ঢুকে প'ড়ে তার বড় আদরের দুলাল, তার সংসারের একমাত্র বন্ধন খোকাকে প্রাণপণে বুকে চেপে ধ'রে ঝরঝর ক'রে কান্নায় যেন ভেঙে পড়ল। কী তার দুঃখ, তা তার কাছে স্পষ্ট রইল না, এবং কি উপায়ে এ দুঃখের অবসান হবে তাও সে জানে না, শুধু একটা অন্ধ অসহায় তীব্র বেদনা আকস্মিক কালবৈশাখীর মত তার বান্ধবহীন আশ্রয়শূন্য চিত্তকে সমাচ্ছন্ন ক'রে ফেললে। খোকন মাকে এমন কখনও দেখে নি। সে ভয় পেয়ে তার কচি একটি হাত মা'র মুখের উপর দিয়ে 'মা, মা রে' ব'লে কাঁদ-কাঁদ হয়ে ডাকতে লাগল। এই আদরের একটুখানি কচি সুন্দর স্পর্শ পেয়ে সে যেন প্রকাণ্ড একটা আশ্রয় লাভ করলে। খোকনের কান্নায় তার সম্বিত ফিরে এল। চোখ মুছে সে নিঃশব্দে তার মুখের উপর মুখ রেখে নিবিড় ক'রে তাকে তার সমস্ত সত্তার চেতনার মধ্যে অনুভব করতে লাগল।

অল্পক্ষণ পরে সে খোকাকে কোলে ক'রে উপরে তার ঘরে গিয়ে বাক্স থেকে বিস্কুট, একটু প্লাম কেক বের ক'রে তাকে কোলে বসিয়ে খাওয়াতে বসল। ইতিপূর্বেই খোকনের একদফা খাওয়া শেষ হয়েছিল। খাবার ইচ্ছে তার বড় একটা ছিলই না, তবু তার শিশুচিত্তে সে কেমন ক'রে যেন বুঝতে পেরেছিল যে, আজ এই স্নেহটুকু প্রত্যাখ্যান ক'রে মা'র মনে আঘাত করা চলবে না। প্রায় চেষ্টা ক'রেই সে একটু একটু খেতে লাগল। কমল আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলে, মাসীমা কেমন আছে রে খোকন? মা'র এইটুকু প্রশ্নেই তার ছোট মন থেকে যেন মস্ত একটা বোঝা নেমে গেল এবং মাকে তার দুঃখে সান্ত্বনা দেবার সুযোগ পেয়ে খুশি হয়ে কলবল ক'রে কথা ব'লে মাকে ভুলিয়ে রাখবার প্রয়াসে নিযুক্ত হ'ল।

কমলা হঠাৎ উঠে চ'লে যাবার পর নন্দলাল নিজের নির্বোধ অভদ্র আচরণ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল। অত্যন্ত অনুতাপ হ'ল তার এবং

সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘনিশ্বাসে এ কথাও তার মনে হ'ল যে, আজ নিজেরই নির্বুদ্ধিতায় তার আশার সামান্য অঙ্কুরটুকুকে সে নিজে হাতে উৎপাটন করেছে। ক্ষমাপ্রার্থনার সম্ভাবনা সে মনে মনে আলোচনা করতে লাগল এবং পকেট-বুক থেকে কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে লিখলে—আমি নির্বোধ পশু, তাই তোমাকে অপমান করতে সাহস করেছি। ক্ষমা পাবার যোগ্য আমি নই; তবু তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আমার উপর রাগ ক'রে তোমার দিদিকে ত্যাগ ক'রো না। সে তোমাকে সত্যি ভালবাসে। 'ভালবাসে' কথাটা লিখতে তার কলম যেন আড়ষ্ট হয়ে এল। তাড়াতাড়ি ওটা কেটে লিখলে, নিজের বোন ব'লেই মনে করে। এইটুকু লিখে সে দরোয়ানের হাতে চিঠিটাকে উপরে পাঠিয়ে দিয়ে চঞ্চল চিত্তে অপেক্ষা করতে লাগল।

খোকন তখন আপন উৎসাহে মাসীর নামে এক কাহন নালিশ শুরু ক'রে দিয়েছে, মাসী তাকে কেবল কেবল দুধ খাওয়ায়, তাকে ভগলুর সঙ্গে রাস্তায় যেতে দেয় না, খালি খালি তেল মাখায়, ইত্যাদি। শুনতে শুনতে কমল তার মুখের দিকে চেয়ে নিজের দুঃখ ভুলে গেল। জিজ্ঞেস করলে, মাসী তোকে ভালবাসে না, না রে? ভারি দুষ্টু! মাসীকে দুষ্টু বলায় খোকার ভাল লাগল না। সে তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত হয়ে আপত্তি জানালে, বললে, ধ্যেৎ, দুষ্টু বলতে নেই। এবং অবিলম্বে মাসীর গুণগান ক'রে তার প্রতি মাসীর ভালবাসা প্রমাণ করতে লেগে গেল। বললে, তুমি বাঘের গপ্প বলতে পার? মাসী বাঘের গপ্প বলে। এই ব'লে মাসীর কাছে বারংবার-শোনা মনুষ্য-চরিত্রের আদর্শরূপী এক ধার্মিক ব্যাঘ্রের উপাখ্যান সাড়ম্বরে বলতে শুরু করলে। বালকের রজতধারার মত স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বরে কমলের চিত্তের সন্তাপ ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল।

এমন সময় দরোয়ান নন্দলালের ছোট চিঠিখানি নিয়ে তার দরজায়

এসে ডাকলে। চিঠির ভাষায় অনুতাপ প্রকাশের অভাব ছিল না, কিন্তু তবু তার মনে গিয়ে তা যেন ঠিক সুরে বাজল না। সে অনেকবার চিঠিটা পড়ল এবং এই অনুতপ্ত আশ্রয়দাতৃ সম্বন্ধে তার আহত চিত্তকে করুণার্দ্র করবার জন্যে নিজের মনকে বোঝাতে লাগল। কিন্তু সম্প্রতি তার মন তার এই আবেদনকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না। দরোয়ানকে ডেকে বললে, এই খোকাবাবুকে নিয়ে ওই বাবুর কাছে দিয়ে এস। বল, আমি এখন যেতে পারছি না। তারপর খোকাকে কোলে ক'রে বারংবার চুমু দিয়ে সে দরোয়ানের কাছে দিয়ে দিল।

নন্দলাল যদিচ আশা করে নি যে, পত্র প্রাপ্তি মাত্র জ্যোৎস্না তার সমস্ত দুর্ব্যবহার বিস্মৃত হয়ে তার কাছে এসে ধরা দেবে; তবু দরোয়ান একলা খোকাকে নিয়ে ফিরল দেখে তার অন্তর্নিহিত পুরুষ মানুষটি পৌরুষের অভিমানে আঘাত পেয়ে উত্তপ্ত হয়েই উঠল। নিখিলনাথ সম্বন্ধে তার চিত্ত অধিকতর সন্দেহাকুল এবং এমন কি প্রায় ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে তার মনকে তিক্ততায় ভ'রে তুললে। অজয়ের হাত ধ'রে সে অকারণেই অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে টেনে নিয়ে চলল তাকে। ভয়ে বেচারী একবার মেসোমশায়ের মুখের দিকে অসহায়ভাবে চেয়ে প্রাণপণে তার চলার সঙ্গে তাল রাখবার জন্য দৌড়তে চেষ্টা ক'রে গেল প'ড়ে। তার উদ্দাম গতির এই আকস্মিক বাধায় নন্দলাল অত্যন্ত বিরক্ত এবং নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। হাত ধ'রে রূঢ়ভাবে একটা টান দিয়ে সে তাকে টেনে তুলতেই বালক ভয়ে কেঁদে ফেললে। অজয়ের সেই অসহায় কান্নায় নন্দলালের চমক ভাঙল। অজয়কে সে সত্যই ভালবাসত। তা ছাড়া সে কমলের দুলাল, তাকে দুঃখ দিয়ে কমলের বিরূপতা অর্জন করতে সে পারে না। কিন্তু আজ বারংবার তার ক্ষতবিক্ষত অবমানিত হৃদয় বঞ্চিত ভিক্ষুকের মত নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল; এবং কোন-একটা প্রতিশোধের ছিদ্রপথে হৃদয়ের পুঞ্জীভূত বিষবাষ্পকে

মুক্তি দিতে না পারলে তার চিত্তকে কিছুতেই সে শান্ত করতে পারছিল না। এই সামান্য ঘটনার ধাক্কায় সে চেতনা লাভ করলে এবং অজয়কে তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিয়ে বারংবার চুমো দিয়ে তাকে শান্ত করতে লাগল।

২৭

গ্রামের নাম দেওয়া হয়েছে কমলাপুরী। প্রমীলার রাজ্য যেন বিস্মৃত ইতিহাসের কল্পনার আশ্রয় থেকে সজীব হয়ে উঠেছে। নদীর ধারের এই ছোট গ্রামখানি পুরুষের সম্পর্কশূন্য। গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করলে মনে হয়, আলাদীনের প্রদীপের মন্ত্রে হঠাৎ জেগে উঠেছে পাতালপুরীর ঘুমের রাজ্য থেকে। লাল সুরকির রাস্তাগুলি সরলরেখায় সমকোণে বিভক্ত করেছে পরস্পরকে : ছোট ছোট কুটিরগুলি পরিচ্ছন্ন সুরুচিসঙ্গত। নদীটির ক্রোড় থেকে একটা চওড়া রাস্তা গেছে সোজা একটা দোতলা অট্টালিকার দরজা পর্যন্ত। আমাদের পূর্বপরিচিত এই অট্টালিকাটি এই গ্রামের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যনিবাস। নদীর ঘাটের কাছে একটি ছোট বাড়িতে নেত্রীর বাসস্থান। কিছু দূরে একটা প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণের চতুর্দিক বেষ্টন ক'রে বড় বড় ঘর—কোনটাতে অনেকগুলি তাঁত, কোনটাতে বই বাঁধাবার ব্যবস্থা, কোনটায় শেলাইয়ের কল চলছে, কোনটায় চিত্রকলা শেখাবার ব্যবস্থা আছে—ইত্যাদি অনেক। সমস্ত গৃহ যেন কর্মের চঞ্চলতায় সজীব। গ্রামের বাইরে ক্ষেতগুলিকে বেষ্টন ক'রে একটি চওড়া বাঁধানো রাস্তা দুই দিকে দুটি ঘাটে গিয়ে নেমেছে। এইখান থেকে গ্রামের শিল্পদ্রব্য বাইরে রপ্তানি হয়। নারীরাজ্যের এইখানেই অবসান। গ্রামটি ছোট কিন্তু অত্যন্ত সুসজ্জিত, একেবারে ছবির-মত। পাঠকের বুঝতে বাকি নেই যে, এইটিই শচীন্দ্রের পরিকল্পিত সেই নারী-প্রতিষ্ঠান।

আয়তন হিসাবে এখানকার জনসংখ্যা অল্পই। দরিদ্র ভদ্রগৃহস্থের কর্মক্ষম বিধবাদের জন্য এই আয়োজন। 'কোর্স' পাঁচ বৎসরের, এবং এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে এদের বাড়ি যাবার নিয়ম নেই। প্রায় একশো ছাত্রীর এখানে থাকবার সুবন্দোবস্ত আছে। দুটি ক'রে ঘরওয়ালা পঞ্চাশটি কুটিরের স্থান এখানে নির্দিষ্ট।

শচীন্দ্রের বিপুল অর্থ এবং পার্বতীর অক্লান্ত পরিশ্রমে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানটি গ'ড়ে উঠতে পেরেছিল।

২৮

তিন বৎসর অতীত হয়ে গেছে। পার্বতীর নাম এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাংলাদেশময় ছড়িয়ে পড়েছে, অথচ প্রতিষ্ঠাতার নাম প্রায় কেউই জানে না। সমস্ত কাজই পার্বতীর নামে চলে। সুতরাং কমলাপুরী সম্পর্কে পার্বতীর নামই বাংলা দেশে বেশি পরিচিত।

একদা পার্বতী প্রতিষ্ঠানের অফিস-ঘরে ব'সে কাজ করছে, এমন সময় একটি মেয়ে এসে একটি নূতন ছাত্রীর আগমনবার্তা জানাল। পার্বতী উঠে ঘাটের দিকে গেল এবং লঞ্চে গিয়ে তার অভিভাবকের সঙ্গে দেখা করলে।

ভদ্রলোকটি বৃদ্ধ। পার্বতী নমস্কার ক'রে ভদ্রলোক ও মেয়েটিকে নিয়ে নেমে এল। এই রকম লোক এসে কয়েক ঘণ্টা নেত্রীর বাড়িতে অতিথি হ'ত। আহারের পর পার্বতী বললে, আপনাকে বিকেলের লঞ্চে ফিরে যেতে হবে। আপনি ইচ্ছে করলে আমাদের গ্রাম দেখে যেতে পারেন।

বেশ, আমিও ভাবছিলাম আপনাকে বলব। তা, চলুন।

টাইপ-লিপি, প্রেস, মাটির খেলনা-বাসন গড়ার ঘর, ছুতোরঘর, তাঁতঘর, শেলাইঘর, ছবিঘর, চরখাঘর প্রভৃতি নানা শিল্পের ব্যবস্থা

দেখতে দেখতে তাঁরা পাঠগৃহে এসে পৌঁছলেন। তাঁদের আগমনে গৃহে কাজের কোন বিরতি বা শৈথিল্য দেখা গেল না।

ভদ্রলোক একটু অবাক হয়ে বললেন, কই, আপনাকে দেখে এরা দাঁড়াল না তো ?

দাঁড়াবে কেন ?

সম্মান করবে না আপনাকে ?

সম্মানই তো করছে। আমি যে কাজ দিয়েছি সেটা তারা মন দিয়ে করছে, এটাই তো সম্মান।

ভদ্রলোক একটু অবাক হয়ে চুপ করলেন। প্রত্যেক ঘরে শিক্ষক তাদের কোন-না-কোন বিষয়ে ছায়াছবি কোথাও বা ছোটখাটো সিনেমা, কোথাও বা মডেল দেখিয়ে কিছু বলছেন। মেয়েদের কারো কাছে বই নেই, কেউ পড়া দিচ্ছে না, কেউ পড়া নিচ্ছে না, শুধু শুনছে আর মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছে। ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞাসা করলেন, এদের বই নেই ?

না।

তবে ওরা কি পড়ে ?

ওরা তো পড়ে না, ওরা শোনে, বার বার ক'রে বুঝিয়ে বলা হয় আর ওরা বার বার ক'রে শোনে। তারপর রাত্রিতে গিয়ে সেগুলি নিজেদের মত ক'রে লিখে রাখে।

পরীক্ষা কবে হয় ?

পরীক্ষা তো হয় না।

হয় না ? তবে শেখে কি ক'রে বোঝেন ?

শেখেই। না বুঝলে আবার জিজ্ঞেস করে, আবার শোনে। নইলে লিখে রাখবে কি ক'রে ? লিখতেই হয়। সেইটাই ওদের নিজেদের পরখ।

এক জায়গায় পাঁচ বছর বন্ধ থেকে এরা কূপমণ্ডুক হয়ে পড়বে না ?

তাই তো প্রতি সপ্তাহে পালা ক'রে দশ জন মেয়েকে নিয়ে কলকাতার সব দেখিয়ে আনা হয়। প্রতি বছরে একটি মেয়ে অন্তত পাঁচ বার যায়। পোস্ট অফিস, ব্যাঙ্ক, গভর্মেণ্টের দপ্তর, বাজারে কেনাবেচা সব কি ভাবে চলে, সব বুঝিয়ে দেওয়া হয়। সব ওরা চোখে দেখে শেখে। দেখবেন ? আচ্ছা! বলে তিন বৎসর আছে এমন দুটি মেয়েকে ডেকে বললে, সব দেখিয়ে আন। ব'লে অন্যত্র চ'লে গেল।

মেয়ে দুটি তাদের তাঁতের কাজ, আসবাব, শতরঞ্চি প্রভৃতি নানা হাতের কাজ দেখানোতে তিনি খুশি হলেন। পার্বতীর অনুপস্থিতিতে চক্ষুলজ্জার হাত থেকে রেহাই পেয়ে তাদের নানা প্রশ্নও করতে লাগলেন। দেশের এবং বিদেশের তাঁর নিজের জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত বহু বিষয়ে তারা অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে তাঁকে ব'লে যেতে লাগল। মেয়ে দুটিকে চলতি জগতের ঘটনা সম্পর্কে এত আশ্চর্য রকমের ওয়াকিবহাল দেখে ভদ্রলোকটি খুবই অবাক হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন যে, এই বনবাসে ব'সে এত খবর তারা জানল কেমন ক'রে ? বড় মেয়েটি হেসে বললে, আমাদের ভূগোলের ঘর দেখেছেন তো ? ওইখানে রোজ পার্বতী দেবী নিজে সমস্ত বিদ্যালয়ের মেয়েদের খবরের কাগজ থেকে সব খবর প'ড়ে শোনান আর বুঝিয়ে দেন। পশ্চিমের দেয়ালটা জুড়ে ওই যে পৃথিবীর মানচিত্রটা আছে, তা ছাড়া ওর পাশেই পাশেই আমাদের যাদুঘর, দেখছেন তো ? ওইসব দেখিয়ে দেখিয়ে পড়ান কিনা। কোন বই না পড়িয়ে, ইংরেজী না শিখিয়ে, কোন পরীক্ষা না নিয়ে যে সত্যি এত সহজে এত জ্ঞাতব্য বিষয় শেখানো যায়, তা দেখে তিনি আশ্চর্য হলেন।

যাবার পূর্বে বৃদ্ধ পার্বতীকে তার প্রতিষ্ঠান এবং আতিথেয়তার জন্য

সাধুবাদ দিয়ে বললেন, এত বড় একটা প্রতিষ্ঠানকে আপনি নিয়মানুবর্তী রাখেন কি ক'রে? ধরুন, কেউ যদি রীতিমত নিয়ম না মানে?

পার্বতী হেসে বললে, না মানবার উপায় নেই। প্রতিজ্ঞাপত্র আপনি দেখছি ভাল ক'রে পড়েন নি। অবাধ্যতার এখানে কোন শাস্তি নেই। একেবারেই আশ্রম হতে নির্বাসন। সেই নির্বাসন এরা চায় না। তার দুটি কারণ আছে। প্রথম, এত সস্তায় নিজেকে মানুষ ক'রে তোলবার জায়গা আর নেই। দ্বিতীয়ত, এখানে হাতের কাজ বেশি শেখানো হয় ব'লে ভর্তি হবার অল্প কিছুদিন পর থেকেই এরা প্রত্যেকেই নিজের এবং প্রতিষ্ঠানের আয়ের দিকে কিছু-না-কিছু সাহায্য করতে পারে। নিয়ম আছে যে, প্রত্যেকটি উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়-লব্ধ লাভের দুই-তৃতীয়াংশ শিল্পীর নামে ব্যাঙ্কে জমা হয়। পাঁচ বৎসর এমনি ক'রে তার কিছু কিছু অর্থ সঞ্চিত হতে থাকে এবং এই প্রতিষ্ঠানটি পরিত্যাগ ক'রে যাবার সময় সুদসমেত তাকে তার অর্জিত এবং সমপরিমাণ অর্থ দিয়ে দেওয়া হয়, যাতে সে বেরিয়ে কোন রকম ছোট-খাট ব্যবসা নিজেই অবলম্বন করতে পারে। চরিত্রে, ব্যবহারে বা নিয়ম-পালনে কোন ব্যতিক্রম ঘটলে এই অর্থ সম্পূর্ণ বাজেয়াপ্ত হতে পারবে। এই নিয়ম থাকায় এখানকার কাজে ছাত্রীদের যেমন উৎসাহ, সুচারুরূপে নিয়মাধীন থাকার দিকে তেমনি তাদের দৃষ্টি।

২৯

বৎসরের পর বৎসর আসে এবং যায়। একাগ্র পরিশ্রমে পার্বতী তার কাজ ক'রে চলে। তার কোথাও বিরাম নাই, কোন ব্যতিক্রম নাই। বিলাতী শিক্ষার গুণে তার কর্মপটুতা এবং কর্মশৃঙ্খলা ছিল প্রচুর এবং কাজ করবার শক্তিও ছিল তার অক্লান্ত। তবু সমস্ত কর্মের অবসানে গভীর রাত্রে নদীর দিকের বারান্দার উপর সে যখন একখানি

ডেক-চেয়ারে তার কর্মক্লান্ত দেহটি এলিয়ে দিয়ে তারা-ভরা আকাশের দিকে চেয়ে প'ড়ে থাকে, তখন হঠাৎ এক-এক দিন তার মনটা আবার সেই সুদূর ইউরোপের পর্বতমালাবেষ্টিত বন-উপবন-চিত্রিত ছায়া-আলোর ঝালর-কাটা স্নিগ্ধোজ্জ্বল দিনগুলির জন্য আকুল হয়ে ওঠে। অন্তরে অন্তরে নিজেকে শ্রান্ত, এমন কি বয়োবৃদ্ধ ব'লে মনে হয়; সমস্ত জীবন থেকে অমৃতের আস্বাদ যেন লুপ্ত হয়ে যায়; অকারণে তার চোখ থেকে জল ঝরতে থাকে এবং পরমাকাঙ্ক্ষিত অনাস্বাদিত রস-সম্পূরিত এক অনাগত জীবনের বিরহে তার সমস্ত প্রাণ যেন এক প্রকার ব্যর্থতার অভিমানে ভ'রে ওঠে। হঠাৎ মনে হয়, সে যেন বন্দিনী। এই বৃহৎ অনুষ্ঠানের কর্মবহুলতার শত পাকে তার সমস্ত চিত্ত, সমগ্র স্বাধীনতা, সমস্ত জীবন যেন বাঁধা পড়েছে; এর থেকে উদ্ধার পাবার কোন রাস্তা নেই। পাথরের দেবতার পূজায় সে তার সমস্ত অন্তরাত্মাকে বলি দিয়েছে। মাথা কুটে মরলেও যেন তাঁর কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া যাবে না।

তবু সে তার এই পূজা-মন্দির ছেড়ে কোথাও যেতে পারে না। এরই দুয়ারে সে তার শ্রান্ত মাথা ঠেকিয়ে বলে, বাঁচাও, ওগো, নিয়ে যাও আমাকে এই কর্মের কারাগার থেকে তোমার স্নেহবন্ধনের অবাধ মুক্তির মধ্যে। দিও না আমাকে এমনি ক'রে বিপুল আড়ম্বরপূর্ণ ব্যর্থতার মধ্যে অবসান পেতে। কর্মের দুর্নিবার মত্ততার অবসাদে আমার দেহমন অবসন্ন। এস, ওগো আমার রাজপুত্র, আমার সুপ্ত আত্মাকে জাগাও তোমার সোনার কাঠির অমৃতস্পর্শে। তোমার বেদনাতুর উত্তপ্ত মাথাটাকে আমার স্নেহব্যাকুল ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়ে শীতল শান্ত করবার অধিকার দাও আমাকে। ওগো, নিয়ে যাও উদ্ধার ক'রে যেখানে সকল কর্মের অবসানে তোমার সুপ্ত-দীপ অন্ধকারকক্ষে তুমি তোমার সমস্ত পৃথিবী থেকে স্বতন্ত্র মুক্ত, অবিমিশ্র সেই অখণ্ড তোমার নিবিড় অস্তিত্বের অব্যাহত আলিঙ্গনের মধ্যে।

রাত্রির অন্ধকার তার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের উপর কুহকজাল বিস্তার করে। সে তার কর্মপরিবেষ্টনের কোলাহলময় বাস্তব থেকে কোন সুপ্তিমগ্ন দিগন্তরেখাহীন কল্পনারাজ্যের মধ্যে নীত হয়, যেখানে এই দুরতিক্রম্য পৃথিবীর অসংখ্য নরনারী একটিমাত্র সংখ্যাতীত পরমেপ্সিত অনধিগম্য মানুষে এসে ঠেকে—প্রদোষান্ধকার পরিপূর্ণ ক'রে যার আভাস ওতপ্রোত হয়ে থাকে, অথচ সমস্ত বিদীর্ণ বক্ষের আকুল আহ্বান যার কানে পৌঁছায় না। এমনি ক'রে তার কত রাত্রির অবসান হয়ে গেছে শয্যাহীন ডেক-চেয়ারের কোলে, তা কেউ জানে না।

শচীন্দ্রনাথ এই প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শক হিসাবে পরিচিত। মাসে একদিন আশ্রমের কাজকর্ম পরিদর্শন এবং আশ্রমের সংবাদ নেবার জন্য শচীন্দ্রকে কমলাপুরীতে আসতে হয়। এই দিনটির অপেক্ষায় পার্বতীর মাসের বাকি উনত্রিশ দিন কর্মশৃঙ্খলার আয়োজনে কেটে যায়। বিশেষ উৎসাহে এই দিনটিকে সে এক প্রকার উৎসবের দিনে পরিণত করবার চেষ্টা করে। সমস্ত গ্রাম সেদিন বিশেষভাবে মার্জিত হয়, ছাত্রীরা বিশেষভাবে শুভ্র বসনে নিজ নিজ নির্দিষ্ট কর্মে নিযুক্ত থাকে, ব্যায়াম-ক্রীড়ার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয় এবং আশ্রমের আহারে বিশেষ রসনা-পরিতৃপ্তিকর আয়োজনের প্রাচুর্য থাকে। আহারের স্থানে কোন পুরুষের আহার নিষিদ্ধ থাকায় পার্বতীর গৃহেই শচীন্দ্রের আহারের ব্যবস্থার নিয়ম আছে; এবং এই একদিন পরম যত্নে স্বহস্তে শচীন্দ্রের জন্যে রান্না ক'রে তাকে খাইয়ে তার সামান্য সেবাযত্ন ক'রে যে তৃপ্তিটুকু সে লাভ করে, শচীন্দ্রের অনুপস্থিতিতে মাসের অন্য দিনগুলিতে সেইটুকুই তার সম্বল।

সমস্ত মাসের অন্তে আজকাল শচীন্দ্রও এই দিনটির জন্য প্রতীক্ষা ক'রে থাকে। কমলের অনুসন্ধানের নিরন্তর ব্যর্থতায় তার স্নেহাতুর চিত্ত ক্রমে যেন নিরাশ্রয় হয়ে পড়ছিল। তার পত্নীর ঐকান্তিক প্রেমের

পরমনির্ভরশীলতা যে নিবিড় বেদনায় তার বিরহাতুর চিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে রেখেছিল, তার কোন বৃহৎ মূল্য দান না ক'রে সে শান্ত হতে পারছিল না। তাই তার বিপুল অর্থ এবং প্রেমের রচনা এই কমলাপুরী বাংলার অসহায় নারীদের সেবার সূত্রে তার চিত্তকে একটি পরম সান্ত্বনার আশ্রয় দান করেছিল। নারী-প্রতিষ্ঠানের কর্মের জনতায় এবং নব নব কল্পনার উত্তেজনায় তার চিত্ত যখন বিভোর, তখন ধীরে ধীরে বৎসরে বৎসরে কখন তার নিজেরই অজ্ঞাতে কমলের বিরহবেদনার তীব্রতা যে ম্লান হয়ে এল, তা সে লক্ষ্যও করে নি। কমলের স্মৃতি তার কাছে ক্রমে একটি স্নেহপূর্ণ করুণ ইতিহাসের সামগ্রী হয়ে উঠল; এবং এই পরিপূর্ণ পরিব্যাপ্ত বিস্মৃতির প্রদোষান্ধকারে পার্বতীর কর্মনিরত স্নেহপ্রভাব তার তমসাচ্ছন্ন চিত্তাকাশে শুভ্র ছায়াপথের স্নিগ্ধতা বিকীর্ণ ক'রে বিরাজ করতে লাগল।

৩০

সেদিন সমস্ত কাজকর্মের অবসানে সন্ধ্যাবেলা শচীন্দ্র পার্বতীর বাসগৃহের বারান্দায় অর্ধমুদ্রিত নেত্রে আরাম-কেদারায় শুয়ে আছে নদীর বাতাসে তার ক্লান্ত দেহ মেলে দিয়ে। সন্ধ্যার গাঢ় ছায়াপাতে জলস্থল যেন দিনের মুখরতার উপর নৈঃশব্দ্যের যবনিকা টেনে দিয়েছে। তারার আলোকে আকাশের অন্ধকার তখনও স্বচ্ছ হয়ে ওঠে নি। অনতিদূরে নদীর পরপারে, চষা-ক্ষেতের মাঝখানে চাষীর কুটির থেকে প্রক্ষিপ্ত একটি ক্ষীণ প্রদীপের আলোকরেখা সেই অন্ধকার যবনিকা ভেদ ক'রে শচীন্দ্রের মনের উপর একটি অপরূপ মোহ বিস্তার করছে। তার মনে হচ্ছে, ওই কালো পর্দাটার অন্তরালে মানব-জীবনের সব সুখ-শান্তি আনন্দ-আরামের নিরবচ্ছিন্ন প্রাণধারা ব'য়ে চলেছে। সেখানে কৃষক-বধূ তার নিপুণ হাতে পরিষ্কার ক'রে উঠানটি নিকিয়ে রেখেছে, পিতলের

বাসনগুলি পরম যত্নে মেজে-ঘ'ষে উজ্জ্বল ক'রে রেখেছে, সন্ধ্যাবেলায় নদীর ঘাট থেকে গাটি ধুয়ে তার মাটির ঘটটি পূর্ণ ক'রে নিয়ে গেছে। সেখানে নিজের মধ্যে সমস্ত সম্পূর্ণ, সমস্ত পরিতৃপ্ত, সমস্তই পর্যাপ্ত। ওই সূক্ষ্ম ক্ষীণ আলোকধারাসূত্র যেন তারই নিশ্চিন্ত শান্তিপূর্ণ সহজ সুন্দর স্বর্গচ্যুত অনাবিষ্কৃত জীবনধারার শান্ত মধুর ইতিহাস বহন ক'রে আনছে।

গৃহাভ্যন্তরে পার্বতী গৃহকর্মে ব্যস্ত। ক্ষণে ক্ষণে তার মৃদুপদধ্বনি, তার কাজের ছোটখাট শব্দের পরিচয় শচীন্দ্রের অবচ্ছন্ন চেতনার উপর, পরপারের চাষীর কুটির থেকে প্রক্ষিপ্ত আলোকপাতে, তার অন্তরের প্রেক্ষাগৃহে এক অনির্বচনীয় রূপকথাকে চলচ্চিত্রে প্রভাসিত ক'রে তুলেছে। নিজের অজ্ঞাতেই গৃহকর্মনিরত পার্বতীর এক অপরূপ কল্যাণী মূর্তি কখন এক সময় সেই প্রচ্ছদপটের উপর প্রতিফলিত হয়ে তার বহুদিনবিস্মৃত শান্তিময় গৃহ-নীড়ের একটি মনোরম প্রতিচ্ছবি তার বুভুক্ষু অন্তরাত্মাকে অমৃতের আস্বাদনে পূর্ণ ক'রে তুললে। এই স্বপ্নালোকের মধ্যে আত্মবিস্মৃত হয়ে কতক্ষণ কেটেছে, সে জানতেও পারে নি।

হঠাৎ সে চমকে উঠল পার্বতীর কণ্ঠস্বরে।—এবারকার অঙ্কের হিসাবটা আপনাকে নিতান্তই ভাবিয়ে তুললে দেখছি। অন্ধকার হাতড়ে তার বিশেষ কিছু সুরাহা হবে ব'লে তো বোধ হয় না। তার চেয়ে বিলেতী হাতের দেশী রান্না খাবার সাহস থাকে তো আমার সঙ্গে উঠে আসুন।

এই কৌতুকের সমস্তটা তার মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নি, এমনি ক'রে শচীন্দ্র পার্বতীর দিকে চেয়ে রইল।

পার্বতী আবার বললে, খিদে-তেষ্টা কি ভুলে গেছেন না কি? রাতদিন ভাবলে যেটুকু বুদ্ধি বাকি আছে, তাও ক্ষয়ে ফুরিয়ে যাবে যে।

এতক্ষণে শচীন্দ্র প্রকৃতিস্থ হয়ে সময়োচিত হাসি মুখে টেনে এনে বললে, আমাকে আখমুনে কৈলেস ঠাউরেছ, না? নইলে বিকেলে তোমার ছাত্রীদের হাতের—

তা অত না খেলেই হ'ত মেয়েদের খুশি করবার জন্যে? ও হবে না; কিছু না খেলে ভাল হবে না ব'লে দিচ্ছি।

বেশ তো। আমি কি বলেছি, খাব না? তবে ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করতে একটা যে সময়ের আবশ্যক, তাকে অযথা সংক্ষেপ করতে গেলে—

কে বলছে সংক্ষেপ করতে? এই আমি বসলাম—দেখি, কতক্ষণে আপনার ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হয়। ব'লে পার্বতী একটা চেয়ার টেনে এনে তার পাশে বসল।

অন্ধকার ঘনতর হয়ে সমস্ত আকাশ এবং পৃথিবীর সম্পর্ক নিবিড়তম ক'রে তুলেছে। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে ব'সে এই পরম নিবিড়তার মোহময় অনুভূতি দুজনে উপভোগ করতে লাগল।

শচীন্দ্রের মনের মধ্যে যে চিন্তাগুলি তার চিত্তকোষের চতুর্দিকে অন্ধ মৌমাছির মত গুঞ্জন ক'রে ফিরছিল, তারা এক সময় সহসা যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। শচীন্দ্র আরাম-কেদারার উপর সোজা হয়ে উঠে বসতেই পার্বতী একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসু চোখ তুলে চাইলে; এবং সেই মুহূর্তেই শচীন্দ্রের কাছে অস্পষ্ট রইল না যে, যে কথা প্রকাশের ব্যাকুলতায় আজ এই রহস্যময় নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় তার চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, সে কথা তার কাছে কিছুমাত্র সত্য নয়। সে যেন স্পষ্ট ক'রে অনুভব করলে যে, কমলের বিলীয়মান স্মৃতি কালের প্রভাবে তার প্রত্যক্ষগোচর নয়—এইমাত্র। তাই যখনই সে নিজের বিরহবিধুর চিত্তকে পার্বতীর প্রত্যক্ষ প্রেমের অভিমুখে অগ্রসর ক'রে দেবার চেষ্টা করেছে—শুকতারার পানে নিশীথরাত্রির অভিসারের মত—তখনই তার মানস-সরোবরের গভীর অদৃশ্য গোপনতল ভেদ ক'রে কমলের স্মৃতি কখন উষার আলোকে তার সহস্র দল মেলে ফুটে উঠেছে। তবে এ কী! বারম্বার কেন তার এই মোহ!

যে নারী তার প্রতি একনিষ্ঠ প্রেমে তারই প্রেয়সীর স্মৃতিসমাধির পরিচর্যায় নিজেকে একান্তভাবে উৎসর্গ করেছে, তার নিবেদিত প্রেমের অর্ঘ্যকে সে বারম্বার প্রত্যাখ্যান করতে কুণ্ঠিত হয় নি—এই ভাবান্তর কি তার প্রতি করুণায়? এর মধ্যে কি শুধু তার জীবনদায়িনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কোন বস্তু নেই? এ কি সহজলভ্যের প্রতি তার বাসনার বিলাস? তা হ'লে তার চেয়ে অবমানকর পার্বতীর সম্বন্ধে আর কী হতে পারে? সে কি জেনে-শুনে পার্বতীকে এই অবমাননার মধ্যে আহ্বান করতে অগ্রসর হয়েছে? নিজের মনে মনে নিজেকে সে ধিক্কার দিলে।

সে প্রতিজ্ঞা করলে যে, পার্বতীকে সে তার নিজের স্বার্থপূর্ণ কর্মবন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেবে। পার্বতীর অভিভূত চিত্তকে কোনমতেই আর তার এই আত্মবিলোপের অন্ধকূপে প'ড়ে থাকতে দেবে না। এতে তার নারী-প্রতিষ্ঠান যদি লোপ পায়, তাতেও তার দুঃখ নেই। পত্নীর যে স্মৃতিকে সে বাইরে রূপ দিতে চেয়েছে, চিরদিন অপরূপ হয়ে সে তার অন্তরে প্রতিষ্টিত রইল। এই ব'লে মনের মধ্যে কমলার স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলবার চেষ্টায় নিজের অনন্য প্রেমের আত্মপ্রসাদ মনে মনে সে অনুভব করতে লাগল।

৩১

এই কর্মজালের বন্ধন থেকে মুক্তি দেবার কথাটা কেমন ক'রে পার্বতীর কাছে উপস্থিত করবে, শচীন্দ্র এই চিন্তায় আবিষ্ট হয়ে কপালের উপর নিজের বাহু ন্যস্ত ক'রে আবার আরাম-চেয়ারে শুয়ে পড়ল। পার্বতী একটু অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চাইলে। শচীন্দ্রের এমন ভাব-বৈলক্ষণ্য তার অভিজ্ঞতার মধ্যে ছিল না। শচীন্দ্র যে কোন একটা

বিশেষ কথা তাকে বলতে গিয়ে সঙ্কোচে চুপ ক'রে রইল, এইটুকু বুঝতে তার দেরি হয় নি।

সে নিজের গলাটা একটু পরিষ্কার ক'রে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে, আপনার কিছু বলবার আছে ব'লে মনে হচ্ছে, যেটা বলতে আপনি বাধা পাচ্ছেন। যদি আশ্রম-সংক্রান্ত কিছু হয়, তবে আপনি নিঃসঙ্কোচে বলতে পারেন। কারণ ইচ্ছে ক'রে না হ'লেও দোষত্রুটি সহজেই হতে পারে। তা ছাড়া নির্জনে, এই চক্রে আবর্তিত কার্যপরম্পরা দিনের পর দিন সম্পন্ন ক'রে যেতে মনের মধ্যে মাঝে মাঝে যে অবসাদ আসে, তা আমি স্বীকার করছি।

শচীন্দ্রের মনটা যে সুরলোকের বীণার সুরে এই সন্ধ্যার তমসাচ্ছন্ন মোহময় মায়াজালের প্রভাবে রণিত হচ্ছিল, সেখানে সহসা কঠিন বস্তুজগতের আঘাত পেয়ে সে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি পার্বতীকে থামিয়ে বললে, এ কথা কেন বলছ পার্বতী? এই সামান্য কয়েক বছরের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানকে তুমি যে ভাবে গ'ড়ে তুলেছ, পৃথিবীতে অন্য কোনও মেয়ের পক্ষে তা কখনই সম্ভব হ'ত না। আমার কতটুকুই বা শক্তি ছিল যে, একে আমি রূপ দিতে পারতুম! কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে তোমাকে ছোট করতে চাই নে। কিন্তু কেন বল তো? এই নির্বাসনের আত্মবিলোপী অন্ধকারের মধ্যে তোমার এমন অমূল্য জীবনকে বলি দিতে বসেছ কেন? প্রতি মুহূর্তে এতে যে আমার মন অপরাধে সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে; আজ সেই কথাই তোমাকে বলবার চেষ্টা করছি। এই অন্ধকূপ থেকে জোর ক'রে না বেরিয়ে পড়লে তোমার পরিত্রাণ নেই।

পার্বতী চুপ ক'রে রইল। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে শচীন্দ্রই আবার শুরু করলে, পার্বতী, তোমার অভাব এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যে কতদূর ক্ষতিকর, তা আমি জানি। তবু আমি এই কলের জাঁতায়

তোমার জীবনটাকে চূর্ণ হয়ে যেতে দিতে পারি না। স্বার্থপরতারও একটা সীমা থাকা উচিত।

সম্প্রতি শচীন্দ্রের অন্তরে অন্তরে পার্বতী সম্বন্ধে তার পূর্বতন সহজ বন্ধুতার পরিবর্তে যে একটা ভাবপ্রবণ ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কের আভাস ঘনিয়ে উঠেছে, তার রূপ পার্বতীর কাছে সম্পূর্ণ স্পষ্ট না থাকলেও সম্পূর্ণ অগোচরও ছিল না।

পার্বতীর চিত্তে নানা সন্দেহ আশা-নিরাশার দোলায় আসা-যাওয়া করতে লাগল। কিন্তু শচীন্দ্রের মনের কথা ঠিকমত কল্পনা করতে না পেরে শান্ত কণ্ঠে তর্কের সুর মিশিয়ে বললে, দেখুন, মানুষের জীবন কার কি ভাবে সার্থক হয়, তা কি কেউ ঠিক বলতে পারে? আমার শক্তি দিয়ে জগতের মঙ্গল সাধনে যদি কিছুমাত্র সহায়তা হয়ে থাকে তো সেই কাজের মধ্য দিয়েই আমি কি সার্থক হই নি? আপনার অর্থ, আপনার অন্তরের প্রেরণা, এমন কি আপনার মৃত পত্নীর প্রতি আপনার যে অক্ষয় প্রেম, তাজমহলের মত কি তা এই প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সার্থকতা লাভ করে নি? কথাটার মধ্যে একটা মৃদু শ্লেষের আভাস ছিল কি না কে জানে! কিন্তু শচীন্দ্র সেটুকু কল্পনা ক'রেই বোধ করি একটু তর্কের উত্তেজনা মিশিয়ে বললে, হয়তো করেছে। কিন্তু—

এর মধ্যে 'কিন্তু' কোথাও নেই শচীনবাবু। যে অনন্যনিষ্ঠ প্রেম আপনাকে এই কাজে অনুপ্রেরণা দিয়েছে, সে একমাত্র আপনাতেই সম্ভব, এটাই কি আপনি মনে করেন? ছোটখাটো হ'লেও প্রত্যেক মানুষই নিজের শক্তি অনুসারে জগতে এই তাজমহল গ'ড়ে চলে। মহত্তর কিছু করবার প্রেরণা তারা তাদের অন্তর থেকেই পায়। দ্বিধাশূন্য পার্বতীর সুস্পষ্টপ্রায় উক্তি দ্বিধাগ্রস্ত শচীন্দ্রের চিত্তকে যেন ত্রস্ত ক'রে তুললে। কোনও অমোঘ অপরিবর্তনীয় সমাধানকে স্বীকার

ক'রে নেবার জন্যে মন তার প্রস্তুত নয়। অথচ পার্বতীর অনতিক্রম্য প্রভাবে চিত্ত তার মোহাচ্ছন্ন আবিষ্ট।

নিজেকে সংযত ক'রে নিয়ে শচীন্দ্র ধীর শান্ত গভীর স্বরে বললে, পায়। কিন্তু তাদের পিছনে থাকে তাদের সার্থক প্রেমের অমৃত উৎস। চিরদিন তাজমহলের মরীচিকা গ'ড়ে তুলতে তোমাকে আমি দিতে পারব না। এর থেকে আমি তোমাকে ছুটি দিতে চাই পার্বতী।

ম্লান হাসিতে পার্বতীর মুখটা বিকৃত ক্লিষ্ট হয়ে এল। কষ্টে নিজেকে সম্বরণ ক'রে নিয়ে ব্যথিত কণ্ঠে বললে, ছুটি দিলেই কি ছুটি পাওয়া যায়? ছুটি নিলে আমি থাকব কি নিয়ে বলুন তো? কথাটা ব'লেই সে নিজের অসংযমে বিরক্ত ও লজ্জিত হয়ে উঠল এবং সেটা চাপা দেবার জন্যেই বোধ করি হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে হেসে বললে, কিন্তু তত্ত্বালোচনা ক'রেই কি আজকের রাতটা আমাদের কাটবে নাকি? উঠুন, যা হয় দুটো মুখে দিয়ে নিন। নইলে অনেক রাত ক'রে খেলে আবার আপনার ঘুম হবে না। ব'লে সে দ্রুতপদে ঘরের ভিতরে চ'লে গেল।

শচীন্দ্র সেখানে ঈজি-চেয়ারে চুপ ক'রে প'ড়ে ভাবতে লাগল। পার্বতীর কথাগুলোর মধ্যে তার ব্যর্থ জীবনের যে গভীর নিরাশা ও বেদনার সুর বেজে উঠেছিল, তার মধ্যে শচীন্দ্রের প্রতি কি একটা অভিমানের আভাস ছিল? শচীন্দ্রের বিচলিত চিত্ত নিজের সঙ্গে যেন কোন মতে বোঝাপড়া ক'রে উঠতে পারছিল না। তার মন কি সত্যই এখনও কমলের মৃত্যুঞ্জয়ী স্মৃতিকে আশ্রয় ক'রে চলেছে তার অনন্ত যাত্রায়? না, এ শুধু পত্নীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গের আত্মপ্রসাদ? তার মন তার এত দিনের অভ্যাসকে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারছে না তাই কি? উদ্‌ভ্রান্ত শিবের মত কমলার স্মৃতিকঙ্কাল বহন ক'রে বেড়ানোর লৌকিক মূল্যের ভিক্ষাপাত্র এবং আত্মবিমোহনের নাগপাশ

কি তার সমস্ত সত্যকে, সমগ্র অন্তরাত্মাকে মোহাবিষ্ট ক'রে ফেলেছে এত দিন ধ'রে ? সে তার অন্তরের ধ্যানলোকে তার নিরুদ্দিষ্টা পত্নীর মুখ ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করতে লাগল ; কিন্তু সেই বিরাট তারা-খচিত ম্লান অন্ধকারের পটে কোথাও তাকে যেন সে খুঁজে পেল না। সে বিশেষ ক'রে ত্রিবেণীর গঙ্গাতীরের সেই শেষ দৃশ্যের মাঝখানে তার হারানো স্ত্রীর কৌতূহলোদ্দীপ্ত ছবিখানি মনের মধ্যে আঁকতে চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু সেই বিপুল চলচঞ্চল শোভাযাত্রার ভিড়ে সে যেন এলোমেলো হয়ে মিলিয়ে গেল। সে তার মনের দৃষ্টিকে সুদূর অতীতের মধ্যে প্রসারিত ক'রে দিয়ে প'ড়ে রইল। কিন্তু তার পত্নীর প্রতিকৃতি তার চিত্তপটে জাগিয়ে তোলবার চেষ্টার মধ্যে সে মুখ হারিয়ে হারিয়ে গেল। এমনই ক'রে বহুক্ষণ ব্যর্থ চেষ্টায় হতাশ হয়ে এই ব্যর্থতাকে কমলার স্মৃতি থেকে বিচ্ছিন্নতা ব'লে কল্পনা ক'রে তার উত্তেজিত মস্তিষ্কের চিন্তাস্রোতকে ফিরিয়ে ভবিষ্যতের গৃহরচনায় প্রবৃত্ত করলে, এবং সেই গৃহে পার্বতী সহজ আনন্দে দীপ্তিময়ী কল্যাণীরূপে বিরাজ করছে—এমনই একটা সুখচ্ছবিকে সে মনের মধ্যে গ্রহণ করতে চেষ্টা করতে লাগল। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে এই চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে থেকে এক সময় অকস্মাৎ সচেতন হয়ে দেখলে যে, বহু চেষ্টাতেও এতক্ষণ যার ছবি সে ফোটাতে পারে নি সেই অর্ধবিস্মৃত নারী কখন তার সমস্ত কাল্পনিক ভবিষ্যৎ চিত্র মুছে ফেলে অভ্যস্ত অতীতের বাস্তব গৃহচিত্রের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে আর চুপ ক'রে ব'সে থাকতে না পেরে বারান্দায় উঠে পায়চারি করতে লাগল। একবার মনে করলে, পার্বতীর কাছে যায়, গিয়ে বলে—পার্বতী, এমনই ক'রে তুমি নিজেকে আবদ্ধ রেখে আমাকে বেঁধো না। তোমার উপযুক্ত মূল্য দিতে আমি অক্ষম। আমার এই দুর্গ্রহ নিয়ে আমাকে একলা দুঃখ ভোগ করতে দাও। কিন্তু সে কিছুতেই মন স্থির ক'রে উঠতে পারলে না। তার পায়ের শব্দ পেয়ে পার্বতী এসে

নিঃশব্দে অন্ধকারে দরজা ধ'রে চুপ ক'রে ভাবতে লাগল। শচীন্দ্রের এই অস্থিরতার সঠিক কারণ সে যেন বুঝে উঠতে ভরসা পায় না। আশা-আশঙ্কা-আকাঙ্ক্ষার উত্তেজনায় তার হৃদয়ের মধ্যে রক্তস্রোত উত্তাল হয়ে উঠল। সে তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে নিজের নিভৃত শয়ন-কক্ষে বিছানার উপর বালিশটাকে বুকে প্রাণপণ বলে চেপে ধ'রে উপুড় হয়ে প'ড়ে রইল।

অনেকক্ষণ পরে সে বারান্দায় ফিরে এল ; দেখলে, শচীন্দ্র বারান্দার একটা থাম ধ'রে স্থির হয়ে পরপারে কৃষক-কুটিরের সেই অচঞ্চল রশ্মিরেখার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পার্বতী ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে এল এবং কিছু না ব'লে চুপ ক'রে তার পাশে এসে দাঁড়াল। তার মনের সুগভীর অন্তরালে অশ্রুর যে উৎস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে চাইছিল, তাকে অন্তরের মধ্যে প্রাণপণ বলে চেপে ধীরে ধীরে সে সস্নেহে চিন্তাতাপক্লিষ্ট শচীন্দ্রের একখানি হাত তার হাতে তুলে নিলে। স্নেহাভিব্যক্তির এই কোমল স্পর্শের মধ্যে এই চিরবঞ্চিতা নারীর তাকে সান্ত্বনা দেবার গভীর করুণাটুকু শচীন্দ্রের মনে এসে একটা অনুশোচনার মত আঘাত করলে এবং নিজের দুর্বলতায় সে মনে মনে লজ্জা অনুভব করতে লাগল। পুরুষের যে আত্মসমাহিত দৃঢ়তা, যে আত্মপ্রত্যয়, নারীর নিকটে তাকে নির্ভরযোগ্য আশ্রয়, তার সহজ আত্মদানের প্রতিষ্ঠাভূমি করে, নিজের মধ্যে সেই অবিচলিত পৌরুষের দৈন্য অনুভব ক'রে মনে মনে সে নিজেকে তিরস্কার করলে, না, এমনি ক'রে পার্বতীর নিরাশ্রয় মনের উপর তার নিজের পীড়িত চিত্তের ভার সে চাপাতে দেবে না। হয় সে পার্বতীকে তার নিরবলম্ব শূন্যতা থেকে নিজের অন্তরের মধ্যে নিঃসঙ্কোচে টেনে নেবে, না হয় তাকে নিশ্চিন্ত মুক্তি দান করবে। এমনই ক'রে নিজের প্রতি করুণায় পার্বতীকে পীড়িত হতে দেবার তার কোন অধিকার নেই। এবং এক সময়

ভূমিকামাত্র না ক'রে অতি ধীরে পার্বতীর হাত থেকে হাতটা মুক্ত ক'রে নিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললে, চল, খেতে যাই। যদিও শচীন্দ্রের ব্যবহারে বা স্বরে কোন রূঢ়তা প্রকাশ পায় নি, তবু এই সামান্য একটু ভঙ্গী এবং তার কণ্ঠস্বরের অতর্কিত শান্ত নীরসতায় পার্বতী একটু আশ্চর্য হ'ল, এবং কেন জানি না কেমন একটু আঘাতও পেল যেন। তবু সে নিজেকে সংযত রেখে প্রায় স্বাভাবিক গলায় 'এক মিনিট অপেক্ষা করুন' ব'লে ঘরের দিকে চ'লে গেল এবং টেবিল সাজাবার নানা কাজে ব্যস্তভাবে নিজেকে ব্যাপৃত ক'রে দিয়ে নিজের কাছ থেকে নিজেকে যেন কাজের মধ্যে হারিয়ে ফেলতে চাইলে।

হাতখানা অমন ক'রে টেনে নেবার ইচ্ছা শচীন্দ্রের ছিল না; তবু তার অনতিপূর্ব মুহূর্তে নিজের মনের যে দুর্বলতা এবং দ্বিধায় তার অন্তর্নিহিত পৌরুষ অবমানিত হয়েছিল, এই হাত ছাড়িয়ে নেওয়াটা বোধ করি তারই অনিচ্ছাকৃত মূঢ় প্রতিক্রিয়া।

পার্বতী যে একটু আহত হয়ে চ'লে গেল—এই বোধ শচীন্দ্রকে মনে মনে অস্বচ্ছন্দ ক'রে তুললে। সে এক প্রকার অনুতপ্ত হয়েই পার্বতীর আহ্বানের অপেক্ষা না ক'রে একেবারে খাবার-ঘরের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

ঘরটি ছোট। মাঝখানে একটা টেবিল সাদা ধবধবে চাদর দিয়ে ঢাকা। টেবিলের উপর দু-বাতির একটা শেজ জ্বলছে। খাবার সরঞ্জাম সব সাজানো হয়ে গেছে। পার্বতী কি একটা গরম করবার জন্য মাটিতে একটা স্টোভে স্পিরিট জেলে সামনে ব'সে আছে। আগুনের এবং বাতির আলোয় তাকে অস্বাভাবিক রকম ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। শচীন্দ্র দেখলে যে, একদৃষ্টে সেই ক্রীড়ারত অগ্নিশিখাটুকুর দিকে চেয়ে তার চোখের জল আর বাধা মানছে না। মনটা তার অনুশোচনায় ভ'রে গেল, এবং এক মুহূর্তে পার্বতীর কৈশোরের

দুঃখের ইতিহাস থেকে শুরু ক'রে প্রত্যেকটি প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ঘটনা প্রচ্ছন্ন গভীর বেদনার রূপ নিয়ে যেন তার কাছে অকস্মাৎ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। নিজের অপেক্ষাকৃত সহনীয় বিরহবেদনাকে এই স্নেহশালিনী নারীর দুঃখের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো স্বার্থপরতার নামান্তর ব'লেই মনে হতে লাগল। পার্বতীর অশ্রুস্নাত মুখের দিকে চেয়ে শচীন্দ্রের চিত্তের সমস্ত অবরুদ্ধ স্নেহ করুণা প্রীতি কৃতজ্ঞতা উদ্বেল হয়ে উঠে ভাবরসবন্যায় তার হৃদয়ের বিচারক্ষেত্রের সুস্পষ্ট রেখাগুলিকে প্লাবিত ক'রে একাকার ক'রে দিয়ে গেল। সেই ভাববন্যার আবেগে তার অন্তরের হৃদয়োচ্ছ্বাসকে সে প্রেম ব'লেই মেনে নিলে। এই জটিল চিন্তার তরঙ্গাঘাতে বিপর্যস্ত তার চিত্ত নিজেকে বিশ্লেষণ করবার ধৈর্য আর স্বীকার করতে চাইলে না। অল্পক্ষণ পূর্বে সে যে তার পত্নীর প্রতি একনিষ্ঠতার অভিমানে আত্মপ্রসাদ সম্ভোগ করছিল, সে কথা তার মনে রইল না।

ঘরে ঢুকে পার্বতীর কাছে এসে বললে, আমাকে ক্ষমা কর পার্বতী।

পার্বতী এত নিবিষ্ট হয়ে নিজের চিন্তায় মগ্ন ছিল যে, হঠাৎ শচীন্দ্রের আগমনে সে চমকে একটা অব্যক্ত শব্দ ক'রে উঠল, তারপর নিজেকে সামলে নিলে। শচীন্দ্রের কথার মধ্যে থেকে তার অনুকূল চিত্তের দক্ষিণ পবনের স্নিগ্ধতা যেন তার ললাটকে এসে স্পর্শ করলে। চোখ মোছবার কোন চেষ্টা না ক'রে মৃদু হেসে আস্তে আস্তে বললে, নটি বয়! ব'লে উঠে হৃদয়োচ্ছ্বাস-প্রকাশে-সমুদ্যত শচীন্দ্রের মুখের উপর একটা হাত চাপা দিয়ে হাত ধ'রে তাকে একটা চেয়ারে নিয়ে বসাল।

শচীন্দ্র নিজের আনন্দ এবং উচ্ছ্বসিত অভুক্ত হৃদয়ের প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ পার্বতীর হাতটা মুখের উপর চেপে ধরলে। পার্বতী বাধা দিলে না, শচীন্দ্র মুঠোর মধ্যে তার নরম হাতটুকু নিয়ে আদর ক'রে ধ'রে রইল।

শচীন্দ্রের এই আত্মনিবেদনের ইঙ্গিতে পার্বতীর বুকের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল। কিন্তু তার অশ্রুজলের করুণায় বিগলিত শচীন্দ্রের এই নিবেদন তার সম্মোহিতপ্রায় আত্মমর্যাদাকে সচেতন ক'রে তুললে ; এবং ধীরে—অতি ধীরে অথচ সুস্পষ্ট নিশ্চয়তার ভঙ্গীতে, কোন কথা না ব'লে, সে নিজের হাতটা মুক্ত ক'রে নিয়ে নিবে-যাওয়া স্টোভটা জ্বালাবার চেষ্টায় গিয়ে শচীন্দ্রের দিকে পিছন ফিরে বসল।

শচীন্দ্রের পুরুষের মন বাধা মানতে চায় না। তার নিবেদিত প্রেমকে স্বীকার না করার সুব্যক্ত ইঙ্গিতে তার আত্মাভিমান অনাহত রইল না, এবং তার প্রেম যে অবিমিশ্র প্রেমই, কোন একটা অকাট্য প্রমাণের দ্বারা তা জানিয়ে দিতে তার মনটা উদ্যত হয়ে উঠল। কিন্তু পার্বতীর মুখের দিকে চেয়ে সে চুপ ক'রে গেল। পার্বতীর স্নেহশীলতার অন্তরালে যে একটি আত্মসমাহিত দূরত্ব তাকে সর্বদা ঘিরে থাকত, সেই ব্যবধান শচীন্দ্রের মনে শাসিত চপল বালকের মত একটা সলজ্জ সম্ভ্রম জাগিয়ে কোনরূপ উচ্ছ্বাস প্রকাশের চপলতা থেকে তাকে নিরস্ত ক'রে রাখলে।

৩২

খাওয়া-দাওয়ার পর লঞ্চে ফিরে যাবার পথে পার্বতী তাকে বললে, আপনি কেন আজ এত বিচলিত হয়েছেন? আপনার কাছে আমার এই অনুরোধ যে, এ-রকম মন নিয়ে কোন কিছু স্থির করবেন না। তাতে ফল ভাল হয় না। নিজেকে সম্পূর্ণ বোঝবার অবসর বা অবস্থা মানুষের তখন থাকে না, যখন—

বাধা দিয়ে শচীন্দ্র বলতে লাগল, কিন্তু যে কথা আজ আমি প্রকাশ করতে চেয়েছি, সে কথা আজকের বিচলিত মন নিয়ে আমি ভাবি নি। আমি অনেক দিন থেকেই যা নিয়ে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার

চেষ্টা করছি, তাকেই তোমার কাছে বলতে চেয়েছিলাম। বলতে ঠিকমত পারি নি, কিন্তু জানি, সে তুমি একরকম ক'রে বুঝে নিয়েছ।

বুঝেছি ব'লেই তো আপনাকে প্রশ্রয় দিতে আমার বেধেছে। আপনি সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে চিন্তা করবার অবসর নিন। আমার প্রতি আপনার করুণার অবকাশে আপনার চিরদিনের অনুশোচনার কারণ আমি ঘটতে দেব না। তা ছাড়া আমার পক্ষেও তো সেটা খুব সম্মান—। ব'লে সে থেমে গেল।

পার্বতীর কথাগুলির মধ্যে আহত অভিমানের নীরসতা এমন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল যে, শচীন্দ্রের অভিমানকে তা আঘাত না ক'রে পারল না। তবু একটু শুষ্ক পরিহাসের হাসি মুখের উপর টেনে এনে সে বললে, দুঃখের কারণই তো এতদিন ছিল, নিজের প্রতি নিষ্করুণ ছিলুম ব'লে। আজ তারই প্রতিকার করতে চাইছি। এখন করুণাটা তোমার উপর, না, আমার নিজের উপর, তাই আজ পরখ ক'রে দেখতে চাই। নইলে দেখছ না—

পার্বতী স্পষ্টই দেখলে যে, শচীন্দ্রের চিত্ত আজ তার কথা গভীর-ভাবে গ্রহণ করবার অবস্থায় নেই। সে আজ সকল কথাকেই লঘুতার স্পর্শে আপাতমনোরম ক'রে তুলতে চায়; এবং তার নিবেদিত-প্রেম একপ্রকার যেন 'মঞ্জুর'—এই ভাবে কথাটাকে আপাতত চাপা দিয়ে বিদায় নিয়ে যাওয়া তার অভিপ্রায়। সে শচীন্দ্রের কথা অসমাপ্ত রেখে তাকে বাধা দিয়ে বললে, আপনি আমার কথা ঠিক বুঝতে পারেন নি। ব'লে কথা কটিকে একটি একটি ক'রে উচ্চারণ ক'রে ব'লে যেতে লাগল, দিনে দিনে তিলে তিলে যার স্মৃতি আপনার সমস্ত জীবন সমগ্র অস্তিত্বকে পূর্ণ করেছে, সার্থক করেছে, একটি মাত্র প্রতিজ্ঞাতেই তার মহা অবসান ঘটল, এমন মিথ্যা কথা আপনি নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করবেন না; আমাকেও না।

শেষ কথাগুলিতে শচীন্দ্রকে যেন কষাঘাত করলে। সে চুপ ক'রে চলতে লাগল। নিজের বাচালতা ও লঘুতায় নিজেকে এমন মূল্যহীন করাতে নিজের উপর তার বিরক্তির আর সীমা রইল না। তার অভিমানমূঢ় চিত্ত পার্বতীর উক্তির সূত্রে যেন আপাতমুক্তির পথ খুঁজে পেল। সে নিজেকে এই ব'লে বোঝাল যে, পার্বতীর কথাই ঠিক। সত্যিই পার্বতীর দুঃখদৈন্যপূর্ণ বঞ্চিত জীবনের প্রতি করুণাতেই তার এই 'রজ্জুভ্রম'। হয়তো কৃতজ্ঞতাকেই সে প্রেম ব'লে মনে করেছে। হয়তো পার্বতীর গুণের প্রতি অতিমাত্র পক্ষপাতিত্বকে সে প্রেম ব'লে ভুল করেছে। নিজের অন্তরের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে সে দেখলে, সে তার নিরুদ্দিষ্টা পত্নীর স্মৃতিকে চিরজাগ্রত রাখার চেষ্টায় তিলে তিলে পলে পলে নিজের সমস্ত শক্তি সমস্ত জীবনকে উৎসর্গ ক'রে চলেছে। দেখলে যে, এই দীর্ঘ চার-পাঁচ বৎসরের মধ্যে এ ভিন্ন তার অন্য কাজ ছিল না, অন্য চিন্তা ছিল না; এই প্রতিষ্ঠানকে সুন্দর সম্পূর্ণ করবার প্রয়াস ব্যতীত স্বতন্ত্র অন্য ব্যক্তিত্ব পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল না। সে আরও দেখলে, এই নারী—যার প্রতি আকর্ষণকে সে আজ প্রেম ব'লে কল্পনা করছে—এই নারীও সেই বৃহৎযজ্ঞের সমিধ মাত্র; দ্বিধাহীন নিঃসঙ্কোচে সে তাকে এই যজ্ঞে বলি দিতে কুণ্ঠিত হয় নি। যে স্মৃতি এত বৃহৎ হয়ে তার সমস্ত জীবনকে ওতপ্রোতরূপে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে, তাকে তার জীবন থেকে বাদ দেবে সে কোন্ উপায়ে?

এমনি ক'রে নিজেকে বুঝিয়ে বিদায় নিয়ে সে লঞ্চে গিয়ে উঠল।

পার্বতীর দুঃখের প্রকৃত স্বরূপ স্পষ্ট ক'রে উপলব্ধি করার মত মন তার স্বচ্ছ ছিল না। চিন্তা সে সূক্ষ্মভাবেই করত, কিন্তু সে চিন্তা ছিল আত্মকেন্দ্রিক। পার্বতীর মনের মধ্যে যে তরঙ্গ তুলে তার চিরবিধুর চিত্তের শান্তি এবং শ্রান্ত নয়নের নিদ্রা হরণ ক'রে নিয়ে তাকে তার শূন্য গৃহে এবং শুষ্ক কর্মক্ষেত্রে বিসর্জন দিয়ে গেল, শচীন্দ্রের

আত্ম-প্রতারিত চিত্তে তার খবর বিশেষ ক'রে পৌঁছল না। অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে চিন্তা না ক'রে নিতান্ত সহজ ভাবে নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই এ কথা তার কাছে অস্পষ্ট থাকত না যে, চার বৎসর পূর্বে তার পত্নীকে স্মরণ ক'রে যে-উদ্যোগ সে আরম্ভ করেছিল, তার পত্নী সেই বিপুল আয়োজনের অন্তরালে একদিন নিশ্চিহ্ন-সমাধি লাভ করেছে। কত দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়েছে, কমলা তার মনের স্মৃতিপটে ছায়াপাত মাত্র করে নি; কমলাপুরী হয়েছে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার সৃষ্টি এবং সেই সৃষ্টির প্রত্যেক বর্গইঞ্চি তার চিত্তে পার্বতীর জীবন্ত প্রত্যক্ষতায় পরিপূর্ণ।

নিজের গৃহকোটরের মধ্যে প্রত্যাবর্তন ক'রে একটা অসীম শূন্যতা পার্বতীর সমস্ত বুকের মধ্যে হাহাকার ক'রে উঠল। শয়নকক্ষের তপ্ত আবেষ্টন পার্বতীর কাছে মৃত্যুপারের নিশ্বাসনিরোধী সমাধিগহ্বরের মত মনে হতে লাগল। দ্রুতপদে বারান্দায় বেরিয়ে সে শচীন্দ্রের পরিত্যক্ত, তার নিত্য আশ্রয়দাত্রী আরাম-কেদারাটির ক্রোড়ে এসে এলিয়ে পড়ল।

শচীন্দ্রের সাগ্রহ আত্মনিবেদনের উচ্ছ্বাসকে রূঢ় আঘাতে সংযত ক'রে তার নিজেরই উন্মুখ বুভুক্ষিত চিত্তকে যে সে বঞ্চিত করেছে, সে কথা তার মনে এল না। ওই যে বিরহ-বিধুর বৃহৎ শিশু নিতান্ত নির্ভরপরায়ণ হৃদয়টিকে নিয়ে একান্ত ব্যাকুল বিশ্বাসে এসে তার হৃদয়-বাতায়নে স্নেহের আশ্রয় আকাঙ্ক্ষা ক'রে তার দিকে হাত বাড়িয়েছিল, মূঢ় অনাথ বালকের মত শচীন্দ্রের সেই মুখের ভাবখানা পার্বতীর প্রেমার্ত চিত্তকে পীড়িত করতে লাগল। তার নিজের আচরণ তার কাছে অহঙ্কারপ্রসূত কৃত্রিম আত্মসম্মানের অভিনয় ব'লে মনে হ'ল। শচীন্দ্রের গভীর স্নেহের বাস্তব স্পর্শ যেন সে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করলে। তার অনুতপ্ত চিত্ত মনে মনে শচীন্দ্রের ব্যথিত মূর্তিকে কল্পনায় তার ক্রোড়ে টেনে নিয়ে

স্নেহে সমাদরে এবং একান্ত উৎসারিত করুণায় বারম্বার সান্ত্বনা দিতে লাগল। উচ্ছ্বসিত অশ্রুরাশি বাধা মানতে চাইল না, এবং মনে মনে সে সঙ্কল্প করলে যে, এমন বেদনাপীড়িত চিত্তে শচীন্দ্রকে সে বিদায় নিয়ে যেতে দেবে না। ভোরবেলা নদীর ধারে গিয়ে হাসিমুখেই সে শচীন্দ্রকে বিদায় দিয়ে আসবে; জানিয়ে আসবে যে, তার মনের তিক্ততা দূর হয়ে গেছে, তার মনে আর কোন ক্ষোভ নেই।

ভোরের দিকে চেয়ারের উপরেই তার ক্লান্ত মাথাটা হেলিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকালের রোদের রূঢ় আঘাতে চোখ মেলে যখন তার ঘুম ভাঙল, লঞ্চ তখন গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূরে চ'লে গিয়েছে। মনটা তার অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হয়ে গেল, কিন্তু কাল রজনীর অনুতাপের তীব্রতা তার মনের মধ্যে যেন স্থান পেল না। শচীন্দ্রের প্রতি তার আচরণের রূক্ষতা তার মনে বেদনার সঞ্চার করলেও তার গোপনতম চিত্তের নিভৃতে যেন একটা সত্যভাষণের প্রসাদ তার ব্যথিত হৃদয়কে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

পার্বতী নিজেকে এই অলস কল্পনাময় ভাবরাজ্যের অবসাদ থেকে জোর ক'রে ছিনিয়ে তার দৈনন্দিন কর্মজীবনের নীরন্ধ্র অনবসরের মধ্যে টেনে উপস্থিত করলে। মনে মনে বললে, না, শান্তিপূর্ণ রসোত্তপ্ত গৃহবিলাস আমার জন্য নয়; আমৃত্যু এই সমাধিগহ্বরে ব'সে মৃতদেহে জীবন-সঞ্চারের ব্রত আমার। দুর্বল হ'লে আমার চলবে না।

ভোরবেলা লঞ্চ ছেড়ে যাবার সময় শচীন্দ্রের অভ্যাসমত সে লঞ্চের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। আকাশে শুকতারা তখন ম্লান হয়েছে, আকাশ উজ্জ্বল হতে দেরি নেই। আসন্ন আলোকোচ্ছ্বাসের পূর্ববর্তী স্বচ্ছতিমিরাবরণে জল-স্থল-আকাশের উপর যেন একটা অসাড়তার মোহ। গ্রামের প্রান্তবর্তী ঘাটটুকু যখন ছাড়িয়ে গেল, তখন শচীন্দ্রের মনটা হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে পড়ল। কালকের বিদায়-সম্ভাষণের মধ্যে

কোথায় যেন একটা বিদারণ-রেখা প'ড়ে গিয়েছে। সেই কথাটাই যে তার মনের মধ্যে সারা রাত একটা চাপা স্বপ্নের মত বেঁতে বসেছিল, এতক্ষণ সে কথা মনে হয় নি। প্রতিবারকার বিদায়ের মধ্যে আগামী বারের মিলনের আশা নিয়ে তারা দূরে যায়। তার সঞ্জিবনীশক্তি তাদের সমস্ত কর্মচেষ্টাকে প্রাণে, আনন্দে, সৌন্দর্যে একে অন্যের কাছে আরও মধুরতর নিকটতর ক'রে তোলে। পার্বতীর শেষ কথার কোন উপযুক্ত প্রত্যুত্তর সে দেয় নি; অথচ তার ব্যবহারে পার্বতীকে আঘাত করেছে অল্প নয়। বিদায়-মুহূর্তে পার্বতীর বেদনাদীর্ণ মুখ, এবং হাত না বাড়িয়ে 'গুড বাই' বলার ভঙ্গীটা স্মরণ ক'রে তার মনটা পীড়িত হতে লাগল। এতক্ষণে সে নিজের আচরণের বিসদৃশতা অনুভব করতে পারলে। বুঝতে পারলে যে, উচ্ছ্বাসের আবেগে পার্বতীকে প্রেম-নিবেদন করাও চলে না, আত্মরক্ষার্থে সাধু সাজাও তার কাছে নিষ্প্রয়োজন। আর যাই হোক, পার্বতীর সঙ্গে আচরণে লঘুতা চলবে না। পার্বতীর সমাজ নেই, কোন মিথ্যা আচারের আবরণ তার আবশ্যক করে না। তার সঙ্গে ব্যবহারে খাঁটি হওয়া চাই, সেই শক্তি মনের মধ্যে তাকে পেতেই হবে—তা সে পার্বতীকে গ্রহণ করার দিক থেকেই হোক বা তাকে প্রত্যাখানেই হোক। এখনই লঞ্চ ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে পার্বতীর কাছে ক্ষমা চাইতে পারলে তার মনটা যেন সুস্থ হয়, এমনি তার মনে হতে লাগল। কিন্তু তার চিত্ততলে গোপনে কোথায় একটা আহত পৌরুষের অভিমান তাকে যেন নিশ্চেষ্ট ক'রে রেখে দিলে।

নদীর তীরে তীরে গ্রামের ঘাটে তখন ভোরের জাগরণ শুরু হয়েছে। সেই সরল স্বচ্ছন্দ নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার অনাময় শান্তি তার মনেকে অকারণে ব্যথিত ক'রে তুললে। বিক্ষিপ্ত বিধ্বস্ত জলরাশি বিদীর্ণ ক'রে লঞ্চ তখন পূর্ণ বেগে ছুটে চলেছে। একান্ত অসহায়

বন্দীভাবে শচীন্দ্র সেই বিধূনিত ফেনপুঞ্জের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

৩৩

নিরবচ্ছিন্ন কর্মপ্রবাহের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণ ভোলবার চেষ্টায় পার্বতী নিজেকে কিছুতেই অণুমাত্র বিশ্রাম দিল না। নব নব উন্নতির পন্থা উদ্ভাবন ক'রে আশ্রমকে সে যেন আবার নূতন রূপ দিয়ে গ'ড়ে তোলবার উদ্যমে প্রাণপাত করতে লাগল। এই উৎসাহের স্রোত অগোচরে পার্বতীর কর্মপ্রবণ হৃদয়কে, তার ক্ষুব্ধ অন্তরের মৃত্যু-সমাধি থেকে আবার কখন যে ধীরে ধীরে আশা-আনন্দ-আলোকময় সঞ্জীবন-রসধারাপ্রবাহে আপন দয়িতের সুখ-শান্তি-সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের প্রতি স্নেহাতুর ক'রে তুললে, তা সে জানতেও পারে নি। সমস্ত মাসের অন্তে শচীন্দ্র যখন এসে উপস্থিত হবে, তখন এই নূতন সৃষ্টির বিস্ময়ের অর্ঘ্য দিয়ে সে শচীন্দ্রের ক্ষুব্ধচিত্তে যে নিরাময় আনন্দের সঞ্চার করবে, সেইটুকু কল্পনা ক'রে তার মহাশ্রম মনে মনে যেন প্রসাদ লাভ করতে লাগল। তার চিত্তের সকল সংশয় অপসারিত হয়ে গেল।

দিনের পর দিন যায়, তার বুভুক্ষু চিত্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা-বেদনার উত্তেজনায় আন্দোলিত হতে থাকে। যে প্রসাধন সম্বন্ধে কোনদিন তার রুচিতে আগ্রহের ছোঁয়াচ লাগবার অবসর পায় নি, সেই প্রসাধন সম্বন্ধেও নিজের অজ্ঞাতসারে সে যেন একটু সজাগ হচ্ছে। বাঙালী রান্নার নানা বিচিত্র জটিল রহস্য আয়ত্ত করবার উদ্দেশ্যে ওখানকার ছাত্রীদের কাছে প্রশ্ন ক'রে ক'রে বিস্ময়াবিষ্ট ক'রে তুলেছে তাদের। বাঙালী পরিবারের গৃহস্থালী সম্পর্কে গল্পের ছলে মেয়েদের কাছে নানা তথ্য সংগ্রহ করেছে—এমনি ক'রে দিন যায় তার ভবিষ্যজ্জীবন রচনার ভূমিকা-বিন্যাসে।

মাস অতীত হতে চলল ; শচীন্দ্রের কাছ থেকে কোনও আগমনী-বার্তা এখন এসে পৌঁছল না। পার্বতী ভাবে, নিশ্চয় জমিদারির কাজে অবসর পান নি তাই

আজ মাসের শেষদিন। শচীন্দ্রের আগমন-প্রতীক্ষায় পার্বতী গিয়ে নদীর ধারে দাঁড়িয়েছে। তার বেশভূষায় কোথাও আতিশয্য না থাকলেও পারিপাট্যের অভাব নেই। মুখ তার আশা ও আনন্দের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। দূরে বাঁকের মুখে লঞ্চের আভাস দেখা দিয়েছে। আর দশ মিনিটের মধ্যেই লঞ্চ এসে ঘাটের কাছে পৌঁছবে। কিন্তু এই সময়টুকু যেন কাটতে আর চায় না। সারেঙটা যেন কি! লঞ্চের গতি যে নৌকারও অধম হ'ল! তবু সময় যায়। লঞ্চ ঘাটের কাছে এসে পৌঁছয়। কিন্তু কই, শচীন্দ্র তো বারান্দায় দাঁড়িয়ে নেই! ক্যাবিনে গেছেন নিশ্চয়—কোনও কাজে।

লঞ্চ ঘাটে লাগতেই পার্বতী এগিয়ে গেল। কিন্তু শচীন্দ্র কই? ভোলানাথ এগিয়ে এসে গড় ক'রে একটা কাগজের মোড়ক পার্বতীর হাতে দিলে। শচীন্দ্র আসে নি। কোনও কঠিন অসুখ করে নি তো? জিজ্ঞেস করতে যেন সাহস হয় না। সেই যে বিলেতে একবার—উঃ, কত কষ্ট ক'রেই না তাকে বাঁচিয়েছিল!

এক মুহূর্তের মধ্যে পার্বতীর মনে সম্ভব-অসম্ভব লক্ষ কথার চুমকি তুবড়ির ফুলঝুরির মত মনের মধ্যে ঝ'রে ঝ'রে পড়ল। শক্ত মেয়ে সে ; মনের এই উত্তাল উচ্ছ্বাস কঠিন বলে চেপে সে জিজ্ঞেস করলে, ভোলাদা, ভাল আছ তো? তোমার বাবু এলেন না যে? ব'লে সে প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে না দিয়ে ক্রমাগত কথা ব'লে যেতে লাগল—যেন, পাছে কোন দুঃসংবাদ ভোলাদার মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে, এই ভয়।

উঃ, কত দিন পরে তুমি এলে বল তো, ভোলাদা? দেখ, সব বদলে গেছে। বলতে হবে—দিদিমণির ক্ষমতা আছে। তোমার বাবু এলে

অবাক হতেন। কিন্তু এলেন না তো! কিছু খেয়েছ সকালে? চল, আমার বাড়ি চল, বিশ্রাম ক'রে নাও। তার পর সব শুনব এখন। ইত্যাদি অনেক—শুধু নিরাশার উদ্বেল বেদনার উপর কথার পর কথা চাপা দিয়ে চলা।

চলতে চলতে ভোলানাথ এক সময়ে অবসর পেয়ে বললে, বাবু পশ্চিমে গেল, দিদিমণি। তা বাবুকে কত বললুম, বাবু, আমারে সঙ্গে নাও—তা শুনলে না। বললে, না ভোলাদা, তুই বরং তোর দিদিমণির কাছে থাক্ তদ্দিন, আমি কটা দিন পশ্চিমটা একটু ঘুরে আসি। তুই থাকলে তবু আমি একটু নিচ্চিন্দি হতে পারি। তা দিদিমণি, আমি জ্ঞান কিনে। ও আর কোথাও না; বাবু গেছে ওই প্রাগে। তুমি দেখে নিও। বউমারে কি ভালই না বাসত বাবু! আমারে এই টাকা আর পত্তর দিয়ে পাঠিয়ে দিলে।

স্নেহশীল ভোলানাথের এই সরল উক্তি পার্বতীর মনে শচীন্দ্র সম্বন্ধে আবার দ্বিধা উপস্থিত করলে। তবে কি সত্যই সে শচীন্দ্রকে তার কর্তব্যের পথ থেকে বিচ্যুত করতে চায়!

জোর করে মন থেকে সে আপাতত এই চিন্তা সরিয়ে দিলে, এবং ভোলানাথের আতিথ্যের ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে সে চিঠিপত্র নিয়ে তার ঘরে প্রবেশ করলে।

প্রথম প্যাকেটটায় কিছু টাকা, তার পরেরটায় হিসাবপত্রের একটা খসড়া। এই রকম আরও দু-তিনটা। তারপর কয়েকখানা চিঠি—তার মধ্যে মেয়ে পাঠাবার দরখাস্ত থেকে আশ্রম-সংক্রান্ত নানা বিষয়ের চিঠি। একখানা চিঠিতে অনিন্দিতা দেবী 'কলিকাতা নারীভবন' থেকে লিখছেন, আপনার ও আপনার আশ্রম সম্বন্ধে অনেক প্রশংসা শুনিয়াছি। আশ্রম দেখিতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে। আমিও সামান্যভাবে একটি 'নারীভবন' খুলিয়াছি। আপনার নিকট হইতে সাহায্য পাইলে উপকৃত

হইব। দয়া করিয়া আপনার প্রতিষ্ঠান দেখার ব্যবস্থা করিলে বাধিত হইব।

নারী-প্রতিষ্ঠানে আসতে হইলে, পার্বতীকে লঞ্চের ব্যবস্থা করতে হয়—নতুবা কলকাতার ঘাট, যেখানে থেকে লঞ্চ ছাড়ে, সেখানে অত্যন্ত অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে টিকিট কিনে লঞ্চে যাওয়া চলে। তাই চিঠিখানা সে আলাদা ক'রে রেখে দিলে; সপ্তাহে মাত্র দু দিন এই লঞ্চ যাতায়াত করে।

শেষ পত্রখানি একটা খামে মোহর করা। শচীন্দ্রের হস্তাক্ষর। পার্বতীর মনটা ব'লে উঠল, না গো না, এমন্ ক'রে বিচ্ছেদ হতে পারে না। না, না, না। ব'লে সে পত্রোন্মোচনের পূর্বে নিজেকে যেন সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতে লাগল।

চিঠি ইংরেজীতে এবং সংক্ষিপ্ত। চিঠিতে লেখা, যাহা বলিয়া তোমাকে সম্বোধন করিলে উপযুক্ত হয়, ভাষায় এমন শব্দ পাই না। তুমি আমার চিত্তের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য গ্রহণ কর। তাহাকে প্রেম বলিতে চাও বল, না বলিতে চাও, যাহা ইচ্ছা বলিও, কিন্তু তাহাকে অস্বীকার করিও না। আমার পত্নীর প্রতি আমার যে প্রেম তাহার মহামৃত্যু ঘটিতে পারে না, সেই কথাটাই জানিবার জন্য বাহির হইলাম। তারপর পুনশ্চ দিয়ে লেখা আছে, ব্যাঙ্কের সহায়তায় নিয়মিত টাকা পঁহুছিবে, আশা করি, তাহাতে কাজের অসুবিধা হইবে না।

চিঠিতে প্রত্যুত্তরের জন্য কোনও ঠিকানা দেওয়া নেই।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে সে দীর্ঘকাল বাইরের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইল। তারই ভৎর্সনার আঘাতে কতখানি অভিমানের আবেগে যে পত্রখানি রচনা করা, সেই কথা মনে ক'রে শচীন্দ্রের দুর্ভাগা জীবনের প্রতি করুণায় প্রেমে তার চিত্ত পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। মনে মনে নিজের কর্তব্য স্থির ক'রে চিঠিখানি বাক্সে রেখে সে বারান্দায় গিয়ে বসল।

৩৪

সীমা এসেই চ'লে গিয়েছিল রোগীর পথ্যের ব্যবস্থা এবং অতিথি-সৎকারের অবস্থানুকূল আয়োজন করতে। ঘণ্টাখানেক পরে সে ফিরে এল। একটা অ্যালুমিনিয়মের পাত্রে একটু জলসাগু আর কয়েকটা বিস্কুট নিয়ে এসে সত্যবানকে বললে, প্রায় সমস্ত দিন তো আপনি না খেয়ে শুকিয়ে আছেন; এইটুকু কোনরকম ক'রে খেয়ে নিন তো। আজ আবার দুধটা তাকের উপর থেকে কিসে যেন ফেলে দিয়েছে, কি যে একটু খেতে দি তা বুঝতে পারি নে। তারপর নিখিলের দিকে চেয়ে বললে, ফল-টল কিছু খেতে চান না, দেখুন তো এখন আমি কি করি? বলতে বলতে তার চোখ ছলছল ক'রে উঠল। যে প্রাণটাকে বাঁচাবার জন্যে সে তার সর্বস্ব ছেড়ে এই নির্জন পরিত্যক্ত ভগ্ন মন্দিরটিতে আশ্রয় নিয়েছে, তার মৃত্যুযন্ত্রণাক্লিষ্ট দেহকে সে যে কিছুমাত্র শান্তি দিতে পারছে না, এর চেয়ে মর্মান্তিক দুঃখ অধুনা তার কাছে কিছুই ছিল না।

সীমার কথা শুনে সত্যবান হেসে বললে, পাগলী, খাবার কি ক্ষমতা আর আছে রে? খিদে পেলে তো খাব? তা ছাড়া তোর হাতের সাগুর শরবতটা বড় সরেশ হয়। দেখ্ না বরং একটু নিখিলকে খাইয়ে, ও কি বলে!

সীমা হেসে ফেলে বললে, জলসাগু আবার শরবত কি? থাক্, ওঁকে আর সাগু খাইয়ে কাজ নেই। অমনিতেই ওঁকে যা জব্দটা করা হয়েছে, এখন ঘরের ছেলে ভালয় ভালয় ঘরে ফিরতে পারলে হয়।

খাওয়ার চেষ্টায় সত্যবানের পরিশ্রম যা হ'ল, খাওয়া তার কিছুই হ'ল না। নিখিল সীমাকে ইঙ্গিতে খাওয়ারার চেষ্টা থেকে বিরত হতে বললে এবং পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে মুখটা মুছিয়ে দিলে। সীমা ধীরে ধীরে বাতাস করতে করতে সত্যবান একটু ঘুমিয়েই পড়ল বোধ

হয়। নিখিল তার পকেট-কেসের সরঞ্জাম গুছিয়ে নিলে। সত্যবানকে নিদ্রিত দেখে সীমা এক সময় আস্তে উঠে নিখিলকে বাইরে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কেমন দেখলেন? নিখিল একটু চুপ ক'রে রইল। এই নিঃসহায় মেয়েটির কাছে নিষ্ঠুর সত্যকে কি ভাবে সহনীয় ক'রে বলা যায়, মনে মনে তারই মোহড়া দিতে দিতে বললে, ভাল যে নয়, তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। তবে এসব কেস তো জোর ক'রে বলা যায় না। আমাদের সর্বদাই মন্দটার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। এখনি একটা ইন্‌জেক্‌শন দিয়েছি, তাতে সাময়িক কিছু উপকার হতে পারে।

সীমা বললে, প্রস্তুত তো আছিই। যন্ত্রণার যদি কিছু উপশম করা যায়, তাই বলছি। মুখে একটুও শব্দ করেন না বটে, কিন্তু যন্ত্রণায় এক এক সময় নীল হয়ে যান। সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে। মৃত্যু কি ওঁদের অকাম্য? মৃত্যুই ওঁদের মুক্তি। এই ব'লে অন্ধকার বনের দিকে চেয়ে সে যেন কোন্ দূর দিনের দৃশ্যকে প্রত্যক্ষ করতে লাগল।

খানিক পরে নিজের এই আত্মবিস্মৃতিতে লজ্জিত হয়ে নিজেকে সম্বৃত ক'রে নিলে এবং একটু অতিরিক্ত সহজ কণ্ঠেই বললে, চলুন নিখিলবাবু, আজ আপনার কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে। তার মধ্যে সব চেয়ে কঠিন দুর্দৈব যেটা সেটা সেরে নিন। রাত বারোটার আগে আজ আর আপনার নিজের আস্তানায় ফেরা হবে না। সত্যদা একটু একলা থাকুন, আমরা বেশি দেরি করব না। এই ব'লে নিখিলনাথকে নিয়ে সে একটা ছোট কুঠরিতে গেল।

নিখিলনাথ ঘরটির আয়োজন দেখে অবাক হ'ল। ঘরটির এক পাশে কয়েকখানি ইটের সাহায্যে একটা উনুনের মত করা হয়েছে। গুটি তিন-চার মাটির পাত্র এ ঘরের আসবাব। একদিকে একটি আধ-ময়লা কাপড় চার ভাঁজ ক'রে একটি আসন ক'রে পাতা; আর তারই সামনে

একটি সত্তছিন্ন ধোয়া কলার পাতা, পাশে একটি মাটির ভাঁড়ে এক ভাঁড় জল। নিখিলনাথ অবাক হয়ে মেয়েটির এই কৃচ্ছ্র সাধনের ছবি মনে মনে আলোচনা করতে লাগল। কিসের প্রেরণায় সে আজ তার গৃহের শান্তি আরাম সুখৈশ্বর্য পরিত্যাগ ক'রে আনন্দে এই বিপদ, এই দুঃখ, এই নিদারুণ আত্মনিগ্রহকে বরণ করেছে? এইমাত্র সে শুনেছে যে, ওর দাদা প্রফুল্লর উপর ওর অসাধারণ ভালবাসা ও ভক্তির জোরে তারই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে বছর কয়েক আগে সে এদের দলের একেবারে মাঝখানে এসে পড়েছিল। অনন্যসাধারণ বুদ্ধি ও সাহসের জোরে দলের সকলেরই শ্রদ্ধা এবং স্নেহ সে পেয়েছে। আজ তারা কোথাও নেই। ভেলোয়ারের জঙ্গলে তাদের হারিয়ে আহত সত্যবানকে নিয়ে কেমন ক'রে যে সে গ্রামে জঙ্গলে উন্মুক্ত প্রান্তরে পরিত্যক্ত কুটিরে দিনের পর দিন অতিবাহিত করেছে, শুনতে শুনতে নিখিলনাথের প্রাণ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কোথায় পেলে? এতটুকু একটুখানি তনুদেহে অত বড় একটা আত্মদান করবার তড়িৎ-প্রেরণা সে পেলে কোথায়? নিখিলনাথের কাছে তার হাসপাতালের কাজকর্ম, আত্ম-প্রতিষ্ঠা, লোকের মঙ্গল-চেষ্টা এর কাছে তুচ্ছ উপহাসকর বোধ হতে লাগল। নিখিলকে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সীমা বললে, ভাবছেন কি দাঁড়িয়ে? খাওয়ার মত কিছু আয়োজন করা এখানে সম্ভব নয়। তবু উপোস করতে হবে ভেবেই এইটুকু করেছি। ভাঁড়টা নিয়ে তাড়াতাড়ি একটু মুখ হাত ধুয়ে ব'সে পড়ুন। এই পোড়া ভাতে-সেদ্ধটুকু যদি গরম-গরম না খান, তবে আজ আপনার অদৃষ্টে হরিবাসরই হবে।

নিখিল একটু অপ্রতিভ হয়ে হেসে বললে, তা বটে; এমন হরিবাসর আমার কপালে সহজে জোটে না। যে উৎকলরত্নটি আমার পাকতন্ত্রের পর্যালোচনা করেন, পাকের চেয়ে দুর্বিপাকেই তিনি সিদ্ধহস্ত; সুতরাং

অধিকাংশ দিনই আমাকে রুটি-মাখনের উপর নির্ভর ক'রে কাটাতে হয়। আজ কপালটা নিতান্তই সুপ্রসন্ন বলতে হবে। পেটুক লোকের রুচিটা দেখছি আপনাদের কাছে ধরা পড়তে দেরি হয় না।

নিখিলনাথের এই সহজ কৌতুকে দীন আয়োজনের লজ্জা সীমার মন থেকে দূর হ'ল। সে মৃদু হেসে বললে, আচ্ছা, এখন হাতমুখটা ধুয়ে আসুন তো, তারপর দেখা যাবে আপনি কত বড় বীর।

নিখিলনাথ আর বাক্যব্যয় না ক'রে মুখ হাত ধুয়ে এল এবং বাঁ হাতের উপর ভর দিয়ে পা ছড়িয়ে খেতে ব'সে গেল। খিদে খুব যে তার পেয়েছিল তা নয়, কিন্তু এই নিরাড়ম্বর মেয়েটিকে তার সাগ্রহ আতিথেয়তা থেকে বঞ্চিত করতে তার ইচ্ছে হ'ল না। আয়োজন কিছুই ছিল না প্রায়। অল্প একটু ডাল ও আলু-ভাতে, খানিকটা ঘি ও একটা পোড়া লঙ্কা। কিন্তু সীমার আগ্রহ এবং যত্ন এই সামান্য আহার্যের মধ্যে যে রসসঞ্চার করেছিল, তার গৌরবে নিখিলনাথের অন্তরে সমস্ত আয়োজনটি যেন একটা উৎসবের উদ্বোধন ব'লে প্রতিভাত হ'ল। এই আত্মসমাহিত কঠোর ব্রতচারিণী মেয়েটি তার মনশ্চক্ষের সমক্ষে একটি বিশেষ মহিমায় প্রকাশিত হ'ল। খেতে ব'সে একবার জিজ্ঞাসা করলে, কই, আপনি খাবেন না? ব'লে তখনি তার প্রশ্নের বিসদৃশতা তার কানে বাজল।

সীমা বললে, আপনি খেয়ে গিয়ে সত্যদার কাছে বসুন, আমি এ দিকটা একটু গুছিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। দেখুন তো, কটা বেজেছে। রাত বারোটার আগে আপনার ট্রেন নেই। তবে অনেকটা পথ আপনাকে ঘুরে যেতে হবে। এ স্টেশন থেকে আপনার গাড়ি ধরা হবে না।

এখন সাতটা পঞ্চাশ হয়েছে। কিন্তু এ করছেন কি? আর একটুও দেবেন না। তা হ'লে আজ এখানেই রাত কাটাতে হবে কিন্তু।

খাওয়া শেষ হ'লে নিখিলনাথ রোগীর ঘরে গেল। ঠোঙায় ঢাকা

একটি ছোট লণ্ঠনের ঘোলাটে আলোয় ঘরটি অন্ধকারপ্রায়। রোগীর চোখে আলো লাগার ভয়ে তত নয়, বাইরের দৃষ্টির দূরতম সম্ভাবনাকে পরাহত করবার জন্যে যত।

সত্যবানের একটু তন্দ্রা এসেছিল কি না কে জানে, প্রথমটা তার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। খানিকক্ষণ পরে, একটু গভীর নিশ্বাস ত্যাগ ক'রে যেন জেগে উঠল, বললে, নিখিল, অনেক দিন পরে তোকে পেয়েছি। আমার অনেক আশা ছিল, কিছুই পূর্ণ হ'ল না—

নিখিল বাধা দিয়ে বললে, এ কথা কেন বলছ? ভাল হয়ে উঠে আবার নতুন ক'রে কাজে লেগে যাও। কালই আমি তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছি।

একটা অতি মৃদু পরিহাসের হাসি সত্যবানের মুখে ফুটে উঠল। বললে, তুই ঠিক তেমনিই ছেলেমানুষটি আছিস এখনও। এখান থেকে ফিরে গিয়ে এখানকার প্রসঙ্গ একেবারে ভুলে যাবি, বুঝলি? নইলে তোর তো মঙ্গল নেই-ই, আমাদেরও বে-হেপাজতে আর বেশি দিন কাটাতে হবে না।

গিরিডির বাইরে একটা পোড়ো বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। ঘাগুলোর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছিল ব'লে সীমা একটি বাঙালী ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এল—কিছুতেই শুনলে না। ডাক্তারটি লোক খারাপ নয়; তা ছাড়া এসব ক্ষেত্রে প্রাণের ভয়ও থাকে লোকের। কিন্তু একটু খোসগল্প করবার লোভ বোধ হয় সামলাতে পারে নি। তারপর বুঝতে পারলুম যে, ওখানকার পাট ওঠাতে হবে। সীমা কোথা থেকে একটা আধপাগলা কুষ্ঠরোগীকে ধ'রে এনেছিল। তাকেই দিন দশেকের মত খাবার-দাবার ব্যবস্থা ক'রে, হাতে পাঁচটা টাকা গুঁজে দিয়ে আমাদের 'প্রক্সি' দেবার জন্যে রেখে দিয়ে এলুম।

সাহায্য করবার লোক ছিল। রাত্রে সাড়ে তিন মাইল হেঁটে

স্টেশনে এসে গাড়ি ধরতে হ'ল। তখন যেমন জর তেমনি যন্ত্রণা। কোন রকম ক'রে শুধু কপাল-জোরেই পালিয়ে এসেছি। কিন্তু আর বেশি দিন এ ভোগ যে ভুগতে হবে না, তা তোর তো অন্তত বুঝতে বাকি নেই। আমার শুধু ভাবনা ওই মেয়েটার জন্যে। ওর বিশ্বাস যে, ওর সত্যদা একটা দিক্‌পাল। সে সেরে উঠলে শুধু তার হুমকির জোরেই ইংরেজ-বাহাদুরকে দেশছাড়া করবে। ভারতবর্ষে দেশ বলতে যে কোথাও কিছু নেই, তা ওর ধারণাতেই আসে না—

নিখিল বাধা দিয়ে বললে, তোমার কথাটা হেঁয়ালির মত শোনাচ্ছে, দাদা। আমারও তো ধারণায় আসছে না, ভারতবর্ষে দেশ নেই মানে কি?

বেশি তর্ক করবার ক্ষমতা আমার নেই রে, শোন্। শুধু বল্ তো, ভারতের জনগণ দেশটাকে একটা নিবাসভূমি ছাড়া আর কি বোঝে?

দেশ কি এই ভারতবর্ষের মাটি যে, বরাবরই ছিল আর বরাবরই আছে? দেশটা থাকে মানুষের দেশাত্মবোধের মধ্যে; তা ছাড়া দেশ বলতে আর যে কি বোঝাতে পারে আমি তো জানি নে। ভেবে দেখ্ তো, হাজার বছর ধ'রে প্রবঞ্চিত, আত্মজ্ঞানের অধিকারে বঞ্চিত এই লক্ষ-কোটি মূর্খ মূক শূদ্র ভারতবাসীর প্রাণে আর্য হিন্দু শক হূন মোগল পাঠান ইংরেজ, কেউ কোনদিন দেশের বোধ জাগতে দিয়েছে? তারা জেনেছে, শুধু রাজা আর প্রজা। সিংহাসনে তোর হিন্দু বসুক, কি পাঠান বসুক, কি খ্রীষ্টান বসুক, 'তারা যে তিমিরে তারা সে তিমিরে।' অথচ এরাই যুগে যুগে আমাদের খাওয়া জোগাবে, বিলাস জোগাবে এবং দরকার হ'লে প্রভুকে সিংহাসনে বহাল রাখবার জন্যে দল বেঁধে দেশের প্রভুদের শত্রুর

সঙ্গে লড়াই ক'রে মরবে। সেইটেই হবে তাদের জন-যুদ্ধ আর দেশভক্তির পরাকাষ্ঠা। হায় রে হায়! তারপর আবার কাজ ফুরোলেই তারা যে তিমিরে সেই তিমিরে।

ব'লে সে নিতান্ত শ্রান্ত হয়েই বোধ করি চোখ বুজে প'ড়ে রইল; এবং এই অতিরিক্ত কথা বলানোর জন্যে নিখিলনাথের মনে মনে অনুতাপ হতে লাগল।

খানিক পরে চোখ খুলে ধীরে ধীরে বললে, তুই বুদ্ধিমান, নিখিল, কথাটা ভেবে দেখিস। কিন্তু সীমা! তোকেই যে ওকে বোঝাবার ভার নিতে হবে। ওর ওই পাগলের মত ভালবাসা এই দেশটার জন্যে, সে কি আশ্চর্য! ওর কাছে এইটুকু শিখেছি যে, মানুষ আর কিছু পারুক আর নাই পারুক, শুধু প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারলে তার অনেক সমস্যা আপনিই সমাধান হয়ে যায়। নইলে ওইটুকু মেয়ে, ওর কিসের এত তেজ বল্ তো! ওর লোক নেহ, সমাজ নেই, ব্যক্তিগত সুখ শান্তি নেই, আছে শুধ্ ওর সীমাহীন দুর্জয় দেশভক্তি, আর তার জন্যে অকুণ্ঠিত অক্লান্ত সেবা।

কিন্তু তুই আমার কথা শুনিস। তুই এর মধ্যে আর জড়াস নে। যে আগুনটা ছড়ানো গেছে, জানি না, তা নেবাতে ওদের আর কতদিন লাগবে! কিন্তু ওকে বাঁচাবার ভার তোরই উপরে রইল। অন্য কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না ব'লেই আজ আমার শেষমুহূর্তে তোকে অনেক কাল পরে স্মরণ করেছি। এর জন্যে তোকে হয়তো অনেক দুঃখ অনেক লাঞ্ছনা পেতে হবে। কিন্তু আমার শেষ সময়ে অন্য কোন উপায় আমি ভেবে উঠতে পারছি নে। তুই আমায় কথা দে, তা হ'লে এত যন্ত্রণার মধ্যেও আমি একটু নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারি।

নিখিল বললে, দাদা, যার জন্যে এত ভাবনা, আমার তো বোধ হয়

না, সে তুমি ছাড়া আর কোন ভাবনাকেই মনে স্থান দেয়। তা ছাড়া তাকে আমি যতটুকু দেখেছি, তাতে—

সত্যবান হেসে উঠল। বললে, পাগল, তুই ওকে কিছুই বুঝিস নি। ওর ভালবাসা কি কোনও ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে? ব্যক্তিটা নিতান্তই উপলক্ষ্য। দেশই ওর সব। দেশের জন্য এক মুহূর্তে আমাকেও বিসর্জন দিতে ও একটুও কুণ্ঠিত হবে না। ওর সত্য ওর কাছে এত বড়, এত প্রত্যক্ষ ব'লেই ওর জন্তে আমার এত চিন্তা। কোনও ফাঁকিতে ওকে ভোলানো যাবে না।

আজ মৃত্যুর দরজায় দাঁড়িয়ে এইটুকু বেশ বুঝতে পারছি যে, ভাল করি নি। এতগুলো খাঁটি সোনা মৃত্যুর অপচয়ের গহ্বরে টেনে এনে ফেলে দিয়েছি। স্পষ্ট দেখছি, মানুষ খুন ক'রে মানুষের কোন মহৎ উপকার সাধন করা যায় না, তাতে খুনের সংখ্যাই বাড়ে। কিন্তু দাবানলকে জ্বালানো সোজা রে, নেবানো সোজা নয়। আজ সীমাকে আর এ কথা বোঝানোর আমার সময় নেই, বোঝাবার শক্তিও নেই। তাই ওর ভার তোর উপর দিয়ে যাচ্ছি। তুই ওকে আগুন থেকে বাঁচা।

নিখিলনাথ স্তব্ধ হয়ে সত্যবানের কথা শুনছিল। তার মনের সামনে সীমার তরুণ সতেজ মূর্তিখানি অপরূপ মহিমায় ভেসে উঠল। সে যেন মানসচক্ষে দেখলে যে, সীমা সঞ্চারিণী অগ্নিশিখার মত ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি সুপ্ত প্রাণের দীপে দীপে আপনার প্রজ্জলন্ত বহ্নিশিখাস্পর্শে অগ্নিময় ক'রে তুলেছে। বার বার ঘুরে ঘুরে সত্যবানের একটা কথার প্রতিধ্বনি নিখিলের মনে এসে ঘা দিচ্ছে—"ওর ভালবাসা কি কোনও ব্যক্তিকে লক্ষ্য ক'রে! ব্যক্তিটা নিতান্তই উপলক্ষ্য"।

এই নারীর অপরূপ দীপ্তিময় অস্তিত্বের কাছে নিজের ক্ষুদ্র

জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিণতিকে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর, এমন কি হেয় ব'লে মনে হতে লাগল। এমন স্পর্ধার কথা সুস্পষ্ট ক'রে মনে আনতে যেন সে সাহস করলে না যে, এই বিদ্যুৎবহ্নিকে কোন দিন সংহত ক'রে সে গৃহসংসারের কল্যাণ-দীপে পরিণত করবে। তবু তার মনের তারে এমন একটি মধুর আনন্দময় আবেশময় সঙ্গীত ধ্বনিত হতে লাগল, যাকে সে কোনমতেই এই মৃত্যু-আহুতিপূর্ণ স্বাধীনতা-সংগ্রামের রুদ্র ডমরুনাদের ঐকতান ব'লে মনে করতে পারলে না।

নিখিলকে চুপ ক'রে ভাবতে দেখে সত্যবান বুঝতে পারলে যে, তার কথার ঠিক সুরটি নিখিলের প্রাণে গিয়ে পৌছয় নি। সে বললে, জানি কত কঠিন এ কাজ, তবু এ তোকে করতে হবে। এমনি ক'রে সর্বনাশের প্লাবনে ওকে ভেসে যেতে দিতে পারব না। সমস্ত দেশের অসহায় অবমানের উত্তেজনায় যেদিন এ কাজে প্রথম নেবেছিলুম, ওজন-করা বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করবার অবসর ছিল না সেদিন। কিন্তু এই ক-মাস গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পালিয়ে বেড়ানোর অবসরে স্পষ্ট বুঝেছি যে, যে ভীরুতা আমার রুগ্ন ভগ্ন ভাইবোনদের মধ্যে কল্পনা করেছিলাম, তার চেয়েও এদের আতঙ্ক আরও কত ভয়ঙ্কর, কত গভীরতর। হাজার, বছরের চাপে শিরদাঁড়া যার বেঁকে গেছে, তার মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি আসবে কোথা থেকে?

হবে না, খুনোখুনি ক'রে কারও মঙ্গল হবে না।—আজ এ কথা আমার বিশ্বাস করিস। আতঙ্কে, লোভে অভয় পদাশ্রয় যারা বেছে নিয়েছে, এ কথা তাদের মুখের ওজন-করা কথা নয় রে, যে চ'টে উঠবি। তিল তিল মৃত্যুর মূল্য দিয়ে এ কথা আজ আমি বুঝেছি যে, মৃত্যু দিয়ে মৃত্যু থেকে বাঁচানো যায় না।

জীবন চাই, জীবনীশক্তি চাই—ওই বাঁকা শিরদাঁড়াটার চিকিৎসা চাই আগে। তারপর কালচক্রের অমোঘ নিয়মে সব আসবে আপনা থেকে একে একে—অন্ন, শ্রী, শক্তি, জয়, মুক্তি। প্রাণ দিলে প্রাণ পাওয়া যায়, প্রাণ নিলে নয়—এই মন্ত্রটা তোকে আজ দিয়ে গেলাম। সীমাকে তুই এই মন্ত্রে দীক্ষা দে। তোকে আমার বড় দরকার ছিল এরই জন্যে।

৩৫

সীমা তার কাজকর্ম সমাধা ক'রে রোগীর রাত্রের পথ্য প্রস্তুত ক'রে নিয়ে হল-ঘরে ফিরে এল। তখন নিতান্ত শ্রান্ত হয়েই বোধ হয় সত্যবান চুপ করেছে, এবং খোলা দরজার মুক্ত পথে বাইরের ঘনকৃষ্ণ নিরেট অন্ধকারের উপর তার নির্নিমেষ দৃষ্টি রেখে রোগীর পাশে স্তব্ধ হয়ে ব'সে আছে নিখিলনাথ। মনে হয়, যেন তার তীক্ষ্ণ সূক্ষ্মাগ্র দৃষ্টির নিরত একাগ্র চেষ্টায় সে ওই অন্ধকার কালো পাথরটার মধ্যে ছোট একটু ছিদ্রপথ সৃষ্টি করতে চায়, আনন্দময় অনন্ত আলোকের একটি মাত্র রশ্মিরেখাও যার অবকাশে তার দিশাহারা চিত্তের মধ্যে মুক্তি লাভ করতে পারে।

সীমা এসে পথ্যটি রোগীর মাথার কাছে সযত্নে ঢেকে রাখল। পিঁপড়ের ভয়ে একটা কেরোসিন তেলের ন্যাতা দিয়ে বিছানার চারিপাশ পরিষ্কার ক'রে মুছে নিলে। টুকি-টাকি সব গোছগাছ ক'রে রেখে সে পাশের ঘরে চ'লে গেল।

নিখিলনাথ ব'সে মনে মনে এই মেয়েটির নিরবচ্ছিন্ন কর্মের বিরামহীন ধারার কথা আলোচনা করছিল। ক্লান্তি যেন এই মেয়েটির অপরিচিত, অথচ কোন আতিশয্য বা সঙ্কোচ এর কোন কাজের

সৌষ্ঠবকে কুণ্ঠিত করে না। ও যেন শাণিত তীরের মত—তেমনি তীক্ষ্ণ, তেমনি ক্ষিপ্র, তেমনি সঙ্গীহীন, লক্ষ্যপথে তেমনি অমোঘ গতি, বোধ হয় তেমনিই ভয়ঙ্কর। কোন্ মন্ত্রে সত্যবানের হাতের জ্যামুক্ত এই অগ্নিবাণকে সম্বরণ ক'রে জীবনের অমৃতরসধারায় শান্তির পথ সে দেখাবে? বিচ্ছুরিত বিদ্যুৎবহ্নিকে বিগলিত ক'রে তাকে সে ধারা-বর্ষণে পরিণত করবে কোন্ মারুৎমন্ত্রে? সত্যবানের উপর অসহায় অভিমানে তার মন বিদ্রোহ ক'রে উঠতে চাইলে। সীমাকে এমন একান্ত বিপদের মধ্যে নিঃসহায় ফেলে রেখে নিশ্চিন্ত মৃত্যুর মধ্যে সত্যবানের এই মুক্তিকে তার স্বার্থপরের মত বোধ হতে লাগল। সীমার প্রতি অপরিসীম করুণায় তার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল এবং সীমাকে এই সর্বনাশ থেকে, এই মৃত্যুর পথ থেকে, এই মহত্ত্বের উন্মত্ততা থেকে উদ্ধার করবার জন্য মনে মনে বারংবার সে প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ করতে লাগল।

এমন সময় একটা পুঁটলি-হাতে পাশের ঘর থেকে একটা লোক বেরিয়ে এল। ময়লা কাপড় হাঁটুর ওপর গাছকোমর ক'রে পরা, ফতুয়ার উপরে একটা গামছা জড়ানো, মাথায় একটা টোকা। সেই স্বল্প আলোকে নিখিলনাথ মুগ্ধ হয়ে তাকে দেখল। কলেজে-পড়া শকুন্তলার বর্ণনা তার মনে প'ড়ে গেল "ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী" এবং অকারণেই সে অন্ধকারে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। সীমা মাথার টোকাটা খুলে ফেলে কাছে এগিয়ে এসে মৃদু স্বরে বললে, চলুন, পথ দেখিয়ে দিয়ে আসি। তার মুখে অনাবশ্যক লজ্জা বা অস্বাভাবিকতার আভাসমাত্র ছিল না। এই অর্ধপরিচিত পুরুষটিকে যে স্ত্রীজনোচিত কোনরূপ সঙ্কোচের ব্যঞ্জনায় খাতির করা আবশ্যক, তার নিতান্ত ভাব-বিহীন মুখে তার কোন চিহ্নমাত্র নাই।

ঠিক সেই সময় দারুণ যন্ত্রণায় সত্যবানের শরীরটা চক্রদলিত সাপের

মত মোচড় দিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠল। দুই জনই এক সঙ্গে ঝুঁকে পড়ল তার উপর। অসহ্য যন্ত্রণায় সত্যবানের চোখ সেই প্রায়ান্ধকার শূন্যকে যেন ফুঁড়ে ছুটে বেরতে চায়,—দুটো জ্বলন্ত গুলি যেন বন্দুকের নলের মুখে এসে আটকে গেছে। নিখিলনাথ তার ডাক্তারী জীবনের বহু মৃত্যুদৃশ্যের অভিজ্ঞতার মধ্যেও যন্ত্রণার এমন বীভৎস, এমন প্রকট মূর্তি কখনও দেখে নি। কি করবে কিছুই দিশা না পেয়ে ক্ষিপ্র হাতে তার পকেট-কেস বার ক'রে আবার একটা ইন্‌জেক্‌শনের আয়োজন করতে লেগে গেল।

নিখিল কম্পিত হাতে সব ঠিকঠাক ক'রে রোগীর দিকে যখন মন দিলে, তখন রোগীর দেহ স্থির হয়েছে। সীমা নিঃশব্দে স্তব্ধ হয়ে ব'সে আছে অসহায় দুখানা হাত সত্যবানের গায়ে মাথায় অকারণে রেখে। তার সমস্ত ভঙ্গীটির মধ্যে স্নেহের অভিব্যক্তি যেমন পরিস্ফুট, নিজেকে অবিচলিত রাখার ভাব তেমনি সুস্পষ্ট। রোগীর শান্ত মুখের দিকে চেয়ে নিখিলের বুকটা ধড়াস ক'রে উঠল। তাড়াতাড়ি সে হাতটা নিয়ে তার প্রাণের স্পন্দন অনুভব করবার চেষ্টা করলে—স্টেথস্‌কোপ্‌ট বার ক'রে বারম্বার মূঢ় আশায় পরীক্ষা করতে লাগল। হায়! নেই, নেই, কোথাও সেই দীপ্ত শিখার ক্ষীণতম রশ্মিরেখাও চোখে পড়ে না। ডাক্তার হ'লেও সত্যবানের এই বীভৎস মৃত্যু সে যেন কিছুতেই মনে মনে স্বীকার ক'রে নিতে পারছে না। কিছুতেই মনে বিশ্বাস যেন হয় না যে, অতবড় একটা দাবানল দপ ক'রে নিবে গেছে। চীৎকার ক'রে তার একবার ডাকতে ইচ্ছে হচ্ছে, 'সত্যদা'—যদি এই ঘনান্ধকার নিশীথের দূরতম দিগন্ত থেকেও একটা উত্তর পায়। তবু অসহায় বেদনায় চুপ ক'রেই সে ব'সে রইল। সীমার দিকে চাইতে তার সাহস হয় না। কেমন ক'রে সে ওই মেয়েটিকে জানাবে যে, যে মহাপ্রাণের দীপ্তিকে সে সৌদামিনীর মত বুকে ক'রে দেশ থেকে দেশান্তরে

ফিরেছে—সে আজ স্তিমিত? এখন তার বর্ষণের পালা শুরু হবার দিন এসেছে!

কতক্ষণ সে চুপ ক'রে অন্ধকারের দিকে চেয়ে ব'সে ছিল, তার মনে নেই। হঠাৎ সীমার হাতের স্পর্শে সে চমকে ডাকলে, সত্যদা! অতর্কিতে মনে হয়েছিল, বুঝি সত্যবানেরই হাত। সীমা তৎক্ষণাৎ তার মুখে হাত চাপা দিয়ে তাকে নিঃশব্দ থাকতে ইঙ্গিত করলে। দূরে বাইরে কোথায় একটা আলেয়া দপ ক'রে জ্ব'লে উঠে আবার নিবে গেল। সে আলো কি আলেয়ার! মুহূর্তের মধ্যে উঠে গিয়ে সীমা ঘরের বাতিটা নিবিয়ে দিলে। অতি অল্পক্ষণ, দু মিনিট'ও না হতে পারে,—তবু মৃত সত্যবানের পাশে ব'সে তার মনে হতে লাগল, সময় যেন নিজের আবর্তে একই জায়গায় ক্রমাগত পাক খাচ্ছে; কিছুতে আর এগোতে পারছে না। বিস্ময়ে, এমন কি ভয়ে সে স্তব্ধ হয়ে রইল। এবং এক সময়, কল্পনাতেই বোধ হয়, কিসের একটা শব্দ অনুভব ক'রে সে মৃতদেহের পাশ থেকে নিজের অজ্ঞাতে স'রে বসল। যে সত্যবান এতক্ষণ তার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় ছিল, ইতিমধ্যেই তার মনের অগোচরে সে অপরিচিত হয়ে উঠেছে।

অল্পক্ষণ পরেই সীমা এসে তাকে বাইরে নিয়ে এল এবং শব্দমাত্র না ক'রে অন্ধকার বনের দিকে অগ্রসর হ'ল। নিখিল আশ্চর্য হয়ে ভাবলে, সীমার কাছে এই মৃত্যুসংবাদ অপরিজ্ঞাত আছে। সে সীমাকে থামিয়ে বললে, এখন যাব না সত্যদাকে ছেড়ে।

সীমা তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে, বিপদ আছে, একটুও দেরি করা চলবে না। ব'লে তার হাত ধ'রে দ্রুতপদে বনপথে প্রবেশ করলে। এই মেয়েটির আদেশ যে অগ্রাহ্য করা চলবে না, তা মনে মনে অনুভব ক'রে নিখিল অগত্যা বিনাবাক্যব্যয়ে তার অনুসরণ করতে লাগল। তার কেবলই মনে হতে লাগল, সত্যদা একলা প'ড়ে

রইল। মৃতদেহের প্রতি, সত্যবানের মত মানুষের প্রতি, এ যেন একটা অসম্মান!

একটা মুক্তিমের বালিকার অঙ্গুলি-পরিচালনায় সে তার কর্তব্য পরিত্যাগ ক'রে পলায়ন করেছে—এই কথা চিন্তা ক'রে সে যেমন বিস্মিত হ'ল, নিজের প্রতি বিরক্তও হ'ল ততোধিক। সে বারম্বার নিজেকে সংহত ক'রে নিয়ে এই পলায়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চাইল, কিন্তু ফলে সে কল্পনায় নিজের মনে সীমার সঙ্গে অকারণে তর্ক-বিতর্ক করতে করতে তারই কোমল হস্তের অব্যাহত আকর্ষণে অগ্রসর হয়ে চলল অন্ধকার বনতলের নানা চক্রপথে।

৩৬

কতক্ষণ তারা এমনি ক'রে কত পথ চলেছে, নিখিলের তা খেয়াল নেই। এক ঘণ্টাও হতে পারে—কিন্তু তার যেন মনে হয়, অল্পক্ষণই হবে—চলতে চলতে তারা বন থেকে বেরিয়ে একটা কাঁচা রাস্তায় এসে পড়ল। নিশ্বাস যেন এতক্ষণ অবরুদ্ধ ছিল। অকস্মাৎ মুক্ত বাতাসে এসে সহজে শ্বাস গ্রহণ করতে পেরে সে নিজের মধ্যে নিজেকে অনুভব করলে। রাস্তায় উঠে সে তার এতক্ষণের অনুতপ্ত চিন্তাকে মুক্তি দান করলে। বললে, সত্যদাকে এমনি ক'রে ফেলে যেতে আমার মন চাইছে না। চল, ফিরে যাই।

সীমা নিখিলের হাতটা মুক্ত ক'রে দিয়ে শুষ্ক কঠিন স্বরে বললে, ফিরে যাবেন? কোথায় যাবেন ফিরে? আর এক মুহূর্তও দেরি করলে আপনাকেই ফিরিয়ে আনতে পারা যেত না। তা ছাড়া, তাঁকে তো ফেলে যাচ্ছি না। তিনি আমার সঙ্গেই আছেন—এ অনুভূতি যদি স্পষ্ট আমার না থাকত, তা হ'লে কি তাঁকে ফেলে চ'লে আসতে পারতুম? তিনিই আমাকে এখনও চালাচ্ছেন। এ শুধু মুখের কথা নয়।

তাঁর দেওয়া কাজের ভার কাঁধে নিয়েই ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছি। নইলে আসবার দরকার ছিল না।

নিখিলনাথ স্তম্ভিত হয়ে গেল এই মেয়েটির এই নিষ্কম্প দৃঢ়তা দেখে। আবার সত্যদাদের সেই কথা তার মনে পড়ল—"ব্যক্তিটা ওর কাছে নিতান্তই উপলক্ষ্য"। এই মেয়েটিকেই কেমন ক'রে মৃত্যুসংবাদ জানাবে, এই ভেবে আবার সে মনে মনে সঙ্কুচিত হচ্ছিল।

সীমার বাইরের আচরণ লক্ষ্য ক'রে নিখিলনাথের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় যে, তার অন্তরে কি স্রোত বইছে। যে দেহটাকে পুনর্জীবন দান করবার জন্য এই কয় মাস ধ'রে সে অসাধ্য সাধন করেছে, অনায়াসে তাকে সত্যিই জীর্ণবাসের মত পরিত্যাগ ক'রে সে চ'লে এল কেমন ক'রে! মনে পড়ল, সে যুগে তারাও প্রাণপণে গীতার শ্লোক মুখস্থ করেছে "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়"। কিন্তু এমন ক'রে কেউ যে জীবনের সত্যে তাকে পরিণত করতে পারে, তা তার কাছে সম্পূর্ণ অভিনব বোধ হতে লাগল। সত্যদার আদেশ যদি প্রতিপালন করতে হয়, তবে এই মেয়েটিকে তাদের জতুগৃহ থেকে রক্ষা করতে হবে তাকেই। কিন্তু এ যে কি কঠিন ব্যাপার তা সে মর্মে মর্মে অনুভব করতে লাগল। তবু তার এই চিন্তাধারার অন্তরালে, সমস্ত সম্পদ-বিপদের দুঃসহ সমস্যার সমাধানের অবকাশে এই জনশূন্য প্রান্তর, এই নক্ষত্রখচিত অন্ধকার এবং অনন্ত আকাশের বৃহৎ ব্যাপ্তির মধ্যে এই যে ছোট একটুখানি সান্নিধ্য, সমস্ত জনতাপূর্ণ কোলাহলময় জগৎ থেকে স্বতন্ত্র, নিঃসঙ্গ নিবিড় এই যে দুজনের নির্ভরপূর্ণ আত্মসমর্পণ, তার মাধুর্যটুকু তাকে আবিষ্ট ক'রে তুললে।

অনেকক্ষণ চলার পর একটা পাকা রাস্তায় উঠে সীমা কথা কইলে। কণ্ঠ তার রসলেশহীন। বললে, এ কথা নিশ্চয় আপনাকে বলার দরকার নেই যে, আজকের ঘটনাকে আপনার জীবনের পাতা থেকে সম্পূর্ণ

মুছে ফেলে দিতে হবে; নইলে আপনার বা আমার কারুরই মঙ্গলের সম্ভাবনা নেই। এ পথ আপনার অপরিচিত নয়, সুতরাং আপনাকে বেশি বলা বাহুল্য মাত্র। আবার যদি কখনও আপনার শরণাপন্ন হতে হয়, আশা করি সেদিন আজকেরই মত আপনার সাহায্য থেকে বঞ্চিত হব না। তারপর অল্প একটু থেমে বললে, আর আমার কিছু বলবার নেই। আপনি এই রাস্তা ধ'রে সোজা মাইল দুই গেলেই স্টেশন পাবেন। নমস্কার।

নিখিলনাথ এতক্ষণ নিজের স্বপ্নে বিভোর ছিল। সীমার কথার ভঙ্গীতে অকস্মাৎ যেন একটা কষাঘাতে সম্পূর্ণ জাগ্রত হ'ল। ব্যাকুল হয়ে বললে, তুমি—তুমি যাবে না? তুমি কোথায় যাবে? একলা, এই রাত্রে তোমায় ছেড়ে দিতে পারব না। তুমিও চল।

এই বৃহৎ বালকটির ধৃষ্টতায় অবাক হয়েই যেন কয়েক মুহূর্ত নিখিলের উপর তার উজ্জ্বল চোখ দুটি রেখে সীমা বললে, নষ্ট করবার বেশি সময় এখন আমার নেই। আমি এখন কোথায় যাব, সে খবর দেবার অধিকারও নেই আমার। আর বৃথা সময় নষ্ট ক'রে অযথা নিজের বিপদ বাড়াবেন না।

নিখিলনাথ নিজের দুর্বলতা অনুভব ক'রে নিজের প্রতি বিরক্ত হয়ে প্রাণপণ বলে নিজেকে আত্মস্থ ক'রে নিলে এবং চেষ্টাকৃত সহজ দৃঢ় কণ্ঠে বলতে লাগল, সত্যবানের আজ্ঞা প্রতিপালনের ভার আমারও উপর কিছু আছে। মৃত্যুশয্যায় তিনি বিশেষ ক'রে যে ভার আমার উপর দিয়ে গেছেন, আমরণ আমাকে তা বহন করবার চেষ্টা করতে হবে। সত্যবানের আজ্ঞাতেই তোমার খবর রাখবার অধিকার আমার আছে।

সীমা হেসে বললে, সত্যবান কি আপনাকে আমার উপর স্পাই নিযুক্ত ক'রে গেছেন নাকি?

না, স্পাই তোমার পিছনে যাতে আর না লাগে, তার চেষ্টা করবার ভার দিয়ে গেছেন।

দারুণ বিস্ময়ে গ্রীবা বাঁকিয়ে ভুরু তুলে সীমা বললে, অর্থাৎ?

অর্থাৎ, এ পথ থেকে তোমাকে নিরস্ত করবার ভার আমাকে দিয়ে গেছেন।

সীমার মুখে বিরক্তি ও প্রায় অবজ্ঞার একটা হাসি ফুটে উঠল, বললে, আচ্ছা, চেষ্টা ক'রে দেখবেন। কিন্তু আজ তো আমার সময় নেই ডাক্তারবাবু। পরে সময়মত আমার ঠিকানা জানাব না হয়, আপনার নীতিবিদ্যালয়ের পুঁথিপত্র নিয়ে যাবেন তখন। কি বলেন? এর পর দেরি করলে যাদের হাতে পড়তে হবে, তারা সত্যবানের খাতির করবে না। তারা পিছনেই আছে কিন্তু। নমস্কার। ব'লে আর উত্তরের জন্য অপেক্ষা মাত্র না ক'রে কাঁচা রাস্তা বেয়ে সে ফিরে গেল।

এই তন্বঙ্গী বালিকাটির অবিচলিত দৃঢ়তায় এক প্রকার অসহায়-ভাবেই নিখিল কিছুক্ষণ সেখানে স্তম্ভিত হয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সীমার প্রত্যাগত ছায়ামূর্তির দিকে চেয়ে রইল। ছায়া সেই আবছা আঁধারে ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে এল, ক্রমে তাকে চোখের আলোয় আর প্রত্যক্ষ করা গেল না, কিন্তু নিখিলনাথের অন্তরের অস্পষ্ট অন্ধকারের সীমান্তরেখা সে যেন কিছুতেই উত্তীর্ণ হতে পারল না।

* * *

বনের মধ্যে সেই আলেয়ার আলো দপ ক'রে জ্ব'লেই নিবে গেল।

৩৭

সেদিন নন্দলাল চ'লে যাবার পর কমলাকে এই কথাটাই বিচলিত ক'রে তুলেছিল যে, পৃথিবীতে তার এই অভিশপ্ত জীবনের কি আবশ্যক আছে! খোকনের জন্য সংসারে তার জীবনধারণের যে দায়িত্ব তা যে

কোনও দিন সে মাথা পেতে নিজের উপর তুলে নেবার অবকাশ পাবে, এমন সম্ভাবনা সে দেখতে পেলে না। আবার সন্তানহীন মালতীর কাছ থেকে তার ছেলেকে কেড়ে নিয়ে যাওয়ার যে নিষ্ঠুরতা, নিজে মা হয়ে তা সে কেমন ক'রে করবে? অথচ নন্দলালের গৃহে তার সন্তানকে চিরকাল প্রতিপালন করতে হবে, এ চিন্তা তার পক্ষে অসহ্য। চিত্তের এই নিরুপায় উদ্বেগের উত্তেজনায় তার মনে হতে লাগল যে, মৃত্যু ব্যতীত এর বুঝি কোন সমাধান নেই। তার জীবনের উপর, তার অভিশাপগ্রস্ত রূপের উপর তার ধিক্কার জ'ন্মে গেল। কিছু দিন তার মন যে কর্মপ্রবাহের মধ্যে শান্তিলাভ করেছিল, সে শান্তি তার মন থেকে ঘুচে গেল। তার এই নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যে এমন একজন লোকের কথা সে ভাবতে পারে না, যার কাছে হৃদয়ের ভার মোচন ক'রে এই আত্মঘাতী চিন্তা থেকে সে নিষ্কৃতি পায়। মালতী তাকে ভালবাসে বটে, কিন্তু তারই স্বামীর বিরুদ্ধে তার কাছে সে নালিশ জানাবে কোন্ লজ্জায়? তা ছাড়া তাদের নিরাময় নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার মধ্যে জেনে-শুনে সে এই সর্বনাশের বীজ বপন করবে কেমন ক'রে? তবে সে কি করবে? এই নূতন সর্বনাশ থেকে মালতীকে এবং নিজেকে বাঁচাবে কেমন ক'রে?

দিনে রাত্রে তার স্বস্তি অন্তর্হিত হয়ে তাকে পীড়িত করতে লাগল। কয়েক দিন আহার নিদ্রা এক রকম সে পরিত্যাগ করলে। শুধু মুখে কিছু রোচে না ব'লে নয়; নিজের দুরপনেয় দুর্ভাগ্যকে নির্জিত করবার জন্যে আর কোনও সহজ উপায় চিন্তা ক'রে উঠতে পারে নি বলে। আত্মহত্যা করার সাহস বা উদ্যম তার ছিল না, কিন্তু আত্মনিগ্রহের চেষ্টাকে তার অন্যায় অকারণ দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে সে যে এক প্রকার আত্মবিনাশের আস্বাদন পায় তার থেকে নিজেকে সংযত করতে সে চায় না। এমনি ক'রে ক'রে একদা সত্যই সে পীড়িত হয়ে পড়ল।

আর কিছু নয়, মাথার ব্যথা। নিদারুণ মাথার যন্ত্রণা। যন্ত্রণায় যেন সে পাগল হয়ে যাবে মনে হয়। যন্ত্রণা তার চেতনাকে আচ্ছন্ন ক'রে আনতে লাগল। এবার সে বাঁচবে না নিশ্চয়। এবং এ কয়দিন যে মৃত্যুকে তার বরণীয় ব'লে মনে হয়েছিল, তারই আতঙ্কে তার সমস্ত মন যেন অভিভূত হয়ে পড়তে লাগল। তার স্বামীর মুখ সে কোন দিন আর দেখতে পাবে না—এই চিন্তায় তার হারানো স্বামীর জন্যে অনেক দিন পরে তার নিরুদ্ধ অশ্রুরাশি উদ্বেল হয়ে উঠল। নিজের এই নিঃসহায় অবস্থায় নিখিলনাথের কথা তার মনে পড়ল, আর মনে কেমন একটা সন্দেহ হতে লাগল যে, নন্দ সম্ভবত অন্বেষণের চেষ্টা থেকে ইচ্ছা ক'রেই বিরত থেকেছে; নিখিলনাথকে জানালে এতদিন নিশ্চয় একটা উপায় হতেও পারত। তাকে জানায় নি ব'লে তার অনুশোচনা হতে লাগল এবং নিখিলনাথকে কোনও সুযোগে সমস্ত কথা বলবে ব'লে মনে মনে সংকল্প করলে।

৩৮

নিখিলনাথ কিছু দিন কমলের কোন সংবাদ নিতে চিত্ত সীমার চিন্তায় এমন নিবিষ্ট ছিল যে, নিতান্ত অবশ্যকর্তব্য সে হাসপাতালের আর কারও সংবাদ নেবার অবসর পায় নি। আজ কমলের পীড়ার সংবাদে সে নিজের এই আবিষ্টতা প্রথম লক্ষ্য করলে এবং লজ্জিত হয়ে তাকে দেখতে গেল। মনোযোগ দিয়ে সে রোগীকে পরীক্ষা করলে এবং নার্স বিন্দুকে ডেকে মাথায় বরফ দিতে উপদেশ দিয়ে, একটা ঘুমের ওষুধ লিখে দিয়ে সে চ'লে গেল।

কিছুদিন যাবৎ নিখিলের নিজের মনও বিশেষ চিন্তা ও উদ্বেগে পীড়িত ছিল। সেই যে অন্ধকার আকাশের তলে সীমাকে সে অসীম

বিশ্বের অন্তরালে কোথায় বিসর্জন দিয়ে এসেছে, তারপর এই ক-মাস অতীত হ'তে চলল—বহু অনুসন্ধানেও সে তার সংবাদ পায় নি।

যে নিবিড় স্পর্শটুকু সীমা তার কোমল করপল্লবের আকর্ষণে তার অন্তরের মধ্যে স্থায়ীভাবে মুদ্রিত ক'রে দিয়ে গেল, সে তার অন্তরের সুপ্ত প্রেমের রক্তকমলকোরককে শতদলে পরিণত করেছে। সে যে সত্যবানের হাতের দান—এ কথা তার কাছে বাহ্য মাত্র, সে যে সীমার হাতের সুদৃঢ় প্রত্যাখ্যান—এই কথাটাই তার পুরুষের চিত্তকে অধিকতর মথিত করেছে। নারীহৃদয়ের উপর আধিপত্য বিস্তারের যে চিরন্তন প্রাকৃতিক নিয়ম তারই ব্যত্যয়ে আজ তার চিত্ত এই দুরন্ত মেয়েটির প্রতি উদ্বিগ্ন আগ্রহে প্রধাবিত। সর্বনাশের ঝোড়ো হাওয়ায় ছিন্ন-পাল ভগ্নতরী নিয়ে যে উন্মত্ত আগ্রহে অকূল সমুদ্রে পাড়ি দিল। হায় রে, তাকে কোন্ মৃত্যুহীন প্রেমের জীবনতরীর সাহায্যে সে ফিরিয়ে আনবে!

নিখিল চ'লে যাবার পর বিন্দুকে আলোটা নিবিয়ে দিতে অনুরোধ ক'রে, কমল চুপ ক'রে প'ড়ে রইল। রাজ্যের খামখেয়ালী চিন্তা পঙ্গপালের মত তার সমস্ত সংজ্ঞারাজ্য জুড়ে এলোমেলো ভাবে উড়ে উড়ে বেড়াতে লাগল। তার ঘুম কোথায় ছুটে গেল এবং গভীর রাত্রিতে এক সময়ে অত্যন্ত অকারণে তার নিজের মস্তিষ্কের দ্রুত-প্রবাহিত রক্তস্রোতের উত্তেজনায় সে বিছানা থেকে নেমে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে শুরু করলে। হঠাৎ পায়ের শব্দে জেগে উঠে বিন্দু বললে, ওমা, ওকি ভাই, কি চাই? আমাকে ডাকলে না কেন? যাও, শোও গে, আমি দিচ্ছি। কি চাই বল তো?

কমল বুঝতে পারলে যে, চিন্তার উত্তেজনায় সে উঠে পড়েছিল, এবং কোন প্রকার উপযুক্ত কৈফিয়ৎ সহসা সংগ্রহ করতে না পেরে তাড়াতাড়ি বললে, দু-একটা বিস্কুট কি একটু মিশ্রী যদি দাও, একটু জল খাব। হঠাৎ কেমন খিদে পেয়ে গেছে, মনে হচ্ছে। কথাটা সত্য নয় এবং

কমলের পক্ষে আহারের চেষ্টা তখন প্রায় অত্যাচারের সামিল, তবু তাকে বিন্দুর সযত্নসংগৃহীত সেই কণ্ঠরোধকারী শুষ্ক বিস্কুটখণ্ড জলের সাহায্যে কিঞ্চিৎ গলাধঃকরণ করতেই হ'ল, এবং নিজের এই অবস্থা স্মরণ ক'রে এত কষ্টেও তার হাসি এল।

বিন্দু বললে, যাক, তবু দু-দিন পরে মুখে একটু হাসি ফুটল! যা মুখ ক'রেই ছিলে! মাথাটা একটু কমেছে, না?

কমল বললে, হ্যাঁ ভাই, মিছিমিছি তোমার ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলুম। যাও শোও গে, আর কিছু দরকার হবে না। দরকার মত ওটুকু আস্তে আস্তে খাব এখন।

জ্যোৎস্না কতকটা সুস্থ বোধ করছে কল্পনা ক'রে বিন্দু আবার স্বস্থানে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

চিন্তার কূল পাওয়া যায় না। নন্দলালের অনুতাপ-বিড়ম্বিত পত্র তাকে কোন সান্ত্বনার পথ দেখায় না। এখনও কিছুদিন হাসপাতালের শিক্ষাকালের অবশিষ্ট আছে। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করতে হ'লে এই সময়টুকু তার কোনক্রমে অতিবাহিত করা ছাড়া উপায় নেই। তার সন্তানের ভবিষ্যৎ এবং তার অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্বাধীনতার পথ, এ ছাড়া সে কিছু চিন্তা ক'রে উঠতে পারে না। তা ছাড়া, মালতীর সম্বন্ধে তার কর্তব্য অত্যন্ত জটিল। যে স্নেহের আবেষ্টনে সে তার সন্তানকে পুত্রাধিক স্নেহে বেঁধে রেখেছে, তা থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করার মত নিষ্ঠুরতা চিন্তা করতে তার করুণায় শুধু নয়, তার কৃতজ্ঞতায় বাধে। অথচ কোন প্রকার সম্বন্ধ-সূত্র রক্ষা ক'রে নন্দলালের বিভ্রান্ত চিত্তের প্রবল উন্মুখীনতা থেকে সে যে কেমন ক'রে নিজের শান্তি এবং মালতীর নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রাকে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করবে, তার উপায় সে খুঁজে পায় না।

চিন্তায় শ্রান্ত হয়ে অনেক রাত্রে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ভোর-বেলার দিকে অত্যন্ত একটা দুঃস্বপ্নের ঘোর ভেঙে জেগে উঠে দেখলে যে, ঘুমের মধ্যে কান্নায় তার বালিশ ভিজে গেছে। বহুকাল পরে সে স্বপ্নের মধ্যে তার স্বামীকে দেখেছে। সে স্বপ্ন স্পষ্ট নয়। নিতান্তই এলোমেলো। জেগে উঠে সব কথা সে পরিষ্কার মনেও আনতে পারে না, তবু সেই অর্ধস্পষ্ট স্বপ্নের স্মৃতিতে তার মন যেন বস্তুজগতের স্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রইল। কি যে তার অর্থ তাও সে বুঝতে পারে না, তবু কেন তার বুক ভেঙে কান্না উথলে উঠতে চায়, তা সে বোঝাবেই বা কাকে! তার স্বামীর যে-মুখটা প্রাণপণ চেষ্টাতেও সেই প্রদোষান্ধকার ভেদ ক'রে সে স্পষ্ট দেখতে পায় নি, অথচ যার অসহায় বেদনার ছবি তার চোখের উপরে সুস্পষ্ট ভাসছে, সেই রূপবিহীন অপরূপ মুখখানা তার অন্তরের এতদিনকার সঞ্চিত প্রেমার্ত বিরহকে যেন সজীব ক'রে তুলেছে।

৩৯

ওগো শুনছ? জ্যোৎস্নাদিকে কতকাল দেখি নি বল তো? একবার তাকে নিয়ে আসবে এই শনিবারে?

কথাটা শুনতে যত সহজ, নন্দলালের কাছে কথাটা তত সহজ নয়। নিখিলনাথ সম্বন্ধে সেদিনকার সেই কুৎসিত উক্তির পর কমলার কাছে যাওয়া এক দিক দিয়ে তার পক্ষে যেমন লজ্জাকর হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর এক দিকে কমলার এই বিরূপতা তার মনটাকে তেমনি তিক্ত ক'রে তুলেছে। তার নিজের বাসনার উত্তেজনায় কমলার প্রতি তার মনের ভাব প্রায় ক্রোধের পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। জ্যোৎস্নার মনে কি কৃতজ্ঞতা ব'লে কোন বস্তু নেই? বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে 'কৃতজ্ঞতা' বলতে নন্দ উক্ত শব্দের আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করে নি।

নন্দলালের মনের চিন্তার এই ধারা কিছুদিন তার মনটাকে কমলার

প্রতি ক্রোধে উত্তপ্ত ক'রে রেখছিল। কিন্তু অনেক দিন অতিবাহিত হ'লেও যখন সে অপর পক্ষ থেকে কোন উত্তেজনার সাড়া পেল না এবং দিনের পর দিন ধীরে ধীরে তার চিত্তের উত্তাপ স্তিমিত হয়ে এল, তখন সে আবার কেমন ক'রে জ্যোৎস্নার বিশ্বাস ফিরে পাবে তারই উপায় চিন্তা করতে লাগল।

কিছু দিন খোকাকে সে চাকরের সঙ্গে পাঠিয়ে দিল, নিজে ও-পথ মাড়াল না। তারপর আরও কিছু দিন সে নিজে গিয়ে দরোয়ানের কাছে দিয়ে এবং নিয়ে আসতে লাগল। কমলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার দুঃসাহস তার হ'ল না। তা ছাড়া তার ব্যবহার যে অনুতাপঘটিত এবং লোভের পর্যায়ভুক্ত নয়—এ কথাও প্রমাণ করা তার আবশ্যক। জ্যোৎস্নার মনের অবস্থাটা কি, তা না জানতে পেরে আড়ালে খোকাকে প্রশ্ন করতে লাগল। বিশেষ কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পারলে না; এবং মনে মনে জ্যোৎস্নার মনোভাব জানবার জন্যে সে ছটফট করতে লাগল।

জ্যোৎস্নাকে সে অনেক দিন দেখে নি। তার মনেও তাকে দেখবার ইচ্ছা কিছু কম ছিল না। নিজের বাড়িতে আনলে সে সুযোগ সহজে ঘটতে পারে বটে, কিন্তু স্ত্রীর সামনে পাছে অশোভন কিছু ঘ'টে যায়, কিংবা, তার চেয়েও বিপদের কথা, জ্যোৎস্না যদি ওর কাছে কোন কথা ফাঁস ক'রে দেয়, তবে আর মুখ দেখাবার জায়গা থাকবে না। ভয় তার যেন ঘুচতে চায় না—স্ত্রীলোক—

এমন সময় মালতী এক দিন তাকে বললে, কতদিন তাকে আন নি বল তো? আজকাল তুমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছ! দিদির আর তেমন ক'রে খোঁজখবরই কর না। তোমাদের সবই নতুন নতুন!

তুমি আমার 'নিতুই নব'—কি বল?

মালতী ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, ঢঙ! বুড়ো বয়সে ঢঙ বাড়ছে! কাজ

নেই আর রসিকতায়। সমস্ত দিনরাতের মধ্যে চোখে দেখবার জো নেই, তার আবার কথা!

ওগো, সেও তোমারই জন্তে। কাজের চাপে সময় ক'রে উঠতে পারি কই? আর ক'টা বছর সবুর কর, তারপর বুঝলে কিনা—হেঁ হেঁ—

বুঝেছি গো সব। ব্যবসা তুনিয়াতে তো কেউ আর করে না, সবাই যেন দিনরাত পাগলের মত হৈ-হৈ ক'রে বেড়ায়, না?

দেখো আসছে বছর, যখন গাড়ি কিনব। তখন যেখানে খুশি—

মালতী আবার ঝাঁজিয়ে উঠল, গাড়ি-গাড়ি বাড়ি-বাড়ি ক'রে দেহটা কি করেছ একবার দেখতে পাও? একটা শক্ত ব্যায়রাম-স্থায়রাম না হয়ে পড়লে তোমার মনস্কামনা তো সিদ্ধি হবে না! রাত-দিন ঘুরে ঘুরে শেষে যদি বিছানায় প'ড়ে থাক, তখন কি হবে বল তো? ও সব আমি শুনতে চাই নে। তুমি দিদিকে শনিবারে নিয়ে আসবে কি না তাই বল।

তোমার দিদিকে আনতে তো এখন লোকের দরকার হয় না। তিনি তো এখন স্বাধীন জেনানা, লিখে দাও না আসতে। লোকের অভাব হবে না গো, দেখো।

মনের ঝাঁজটুকু নন্দ আর সমলাতে পারলে না।

মালতী বললে, ও আবার কি কথার ঢঙ? কেন, তুমি বুঝি আর একটু সময় ক'রে গিয়ে নিয়ে আসতে পার না? ওগো, একটু সময় দিলে তোমার ব্যবসা একেবারে ফেল পড়বে না।

ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা থাকতে ব্যবসা ফেল পড়া কি মুখের কথা? কিন্তু তুমি কখনও যাবে না, আর সে যদি রাগ ক'রে না আসে তো আমি গেলেই কি আসবে?

আমি জানি না বাপু; ঘর-সংসার সামলে, খোকাকে নিয়ে আমার ফুরসুৎ কোথায় বল তো?

তা বটে, এ তো আর ব্যবসা নয়। আধ ঘণ্টা না থাকলেই চাকরবাকর সব ঘর-সংসার লুটপাট ক'রে রসাতলে দেবে।

দেবেই তো। না সত্যি, তুমি যাও দিদিকে একটু ব'লে-ক'য়ে নিয়ে এস।

সে আমি পারব না। তোমার দিদিকে পার তো তুমি গিয়ে নিয়ে এস, আমি বড় জোর সঙ্গে যেতে পারি।

অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর সেই কথাই ঠিক হ'ল। শনিবার সকাল-সকাল ফিরে নন্দ তার স্ত্রী এবং অজয়কে নিয়ে জ্যোৎস্নাকে আনতে যাবে।

সে দিন শনিবার। কমল সকালের দিকে অনেকটা সুস্থ বোধ করছিল। কাজে অকারণে অনুপস্থিত হওয়া তার স্বভাব নয়। নিখিলনাথ হাসপাতাল পরিদর্শনের অবসরে তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, এ কি, আপনি আজই কাজে এলেন যে? একটু বিশ্রাম নেওয়াই আপনার উচিত ছিল। মাথার যন্ত্রণাটা গিয়াছে তো?

মাথার যন্ত্রণা কম হ'লেও ছিল তখনও। কিন্তু সে কথা না ব'লে সে হেসে বললে, আমরা দুঃখী মানুষ, নিজেদের নিয়ে নাড়াচাড়া করলে আমাদের দুঃখ তো কমে না; তার চেয়ে কাজকর্মের মধ্যে অনেকটা শান্তিতে থাকি।

অপরাহ্নের দিকে কমল ঘরে ফিরে শুয়ে পড়েছিল অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ ক'রে। শুয়ে শুয়ে সে তার সুপ্ত মস্তিষ্ককে প্রাণপণ চেষ্টায় জাগ্রত করবার চেষ্টা করছিল, যদি কোন মতে কাল রাত্রের দেখা স্বপ্নের সূত্রে তার স্বামী বা দেশের কোন নাম স্মরণে আনতে পারে। চিন্তায় চিন্তায় সে অধিকতর ক্লান্ত হয়ে পড়ল, তবু কোন ক্ষীণতম রশ্মিও সে,

সেই বিস্মৃতির অন্ধকারে দেখতে পেল না। নিখিলনাথকে কি উপায়ে সাহায্য করার সূত্র সে জোগাবে, যদি তার স্মৃতিকে সে পুনরুজ্জীবিত না করতে পারে?

চুপ ক'রে শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল নানা চিন্তায় সে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, এমন সময় ঘরে প্রবেশ করলে মালতী খোকাকে নিয়ে।

ও কি দিদি, শুয়ে যে? এ কি চেহারা হয়ে গেছে তোমার? মা গো! চোখ গর্তে ঢুকে গেছে যে—অসুখ করেছে?

কমলা হেসে তাড়াতাড়ি উঠে বসল। তারপর খোকাকে কোলে টেনে নিয়ে বললে, না, তেমন কিছু না, আজ দিন কয়েক একটু মাথার অসুখ করেছিল, তা এখন ক'মে গেছে। ব'লে প্রসঙ্গটাকে চাপা দিয়ে বললে, উঃ, কতদিন দেখি নি তোমাকে ভাই! সে ব্লাউসটা পেয়েছিলে তো? এখানে ঠিকমত সুতো পাই না, তার ওপর কাজের চাপ, কোন রকমে একটা ক'রে দিলাম। এখনও ভাল ক'রে শিখতেই পারি নি।

চমৎকার হয়েছে। ওদের বাড়ির বউ তো বলছিল, সাহেববাড়িও অমনতর হয় না।

কমলা মৃদু হেসে কথাটা চাপা দিল; বললে, তাই নাকি? জান ভাই, খোকন তো সেদিন তোমার নিন্দে করেছিলাম ব'লে কোমর বেঁধে লেগে গেল তার মাসীর গুণবর্ণনায়। এদিকে কিন্তু আবার তোমার নামে সব নালিশও চলছিল তার আগে,—'খালি খালি দুধ খাওয়ায়, ভগলুর সঙ্গে রাস্তায় যেতে দেয় না।' আর আমি যেই বলেছি, 'মাসী ভারি দুষ্টু, না রে?' আর যাবে কোথায়!

মালতী তৎক্ষণাৎ খোকনকে কোলে টেনে একটা মস্ত চুমু দিয়ে বললে, তা ভাই সত্যি, চাকর-বাকরের সঙ্গে আমার যেতে দিতে ভয় করে। এই সেদিন পুঁটির মা বলছিল, কার খোকাকে সেদিন তাদের পুরনো চাকরে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে নাকি গয়নার লোভে গলা টিপে

মেরে ফেলেছে। মা গো, শুনে আমি তো ভয়েই মরি। তা ভাই, দিই নে ব'লে তোমার ভগ্নীপতি বকাবকি করে। তা করুক গে, ওদের কি এসব বুদ্ধি আছে? এদিকে নিজের ভয় কিন্তু সাড়ে ষোল আনা। রাত্তিরে একখানা টেলিগেরাপ আসুক দিকি নি; অমনি ভয়ে কেঁপে সারা হয়ে যাবে এখন। ভয়ে মাথার জানলা খুলে শোবে না—নাকি খোঁচা মারবে! দেখ দিকি ভাই কাণ্ড!

গলা টেপার কথায় কমলের মনটাও ছ্যাঁৎ ক'রে উঠেছিল; কিন্তু নন্দলালের কথা শুনে হেসে বললে, ব্যবসায়ী মানুষ কিনা—তাই চোরের ভয়।

ছাই ব্যবসা, ব্যবসা-ব্যবসা ক'রে রাত্তির-দিন নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করলে। নাকি বাড়ি হবে, মোটর হবে। ঝ্যাঁটা মার অমন বাড়ির মুখে। আগে প্রাণে বাঁচবে, তারপর তো বাড়ি-গাড়ি? কদ্দিন থেকে বলছি যে, জোছনাদিকে একটু নিয়ে এস। তা সময়ই হয় না। বলে, 'তুমি না গেলে সে আসবে কেন?' তা ভাই, সাতরাজ্যি ঠেকিয়ে আমার কি নিশ্বেস ফেলতে অবসর আছে? খোকার দুধটা পর্যন্ত কেউ ঠিকমত জ্বাল দিতে পারে না। যে দিকটা না দেখব, সে দিকটাই ছিষ্টি নষ্ট ক'রে ব'সে থাকবে। তা আমি না এলে কি আর হয় না? তা ও কিছুতে শুনবে না। ওরও আবার সময় হয় না। কত ক'রে ব'লে-ক'য়ে আজ নিয়ে এসেছি।

ওমা, এতক্ষণ বল নি কেন ভাই? একটু চা-টা ক'রে পাঠিয়ে দি।

না না, সে সব কিছু করতে হবে না। তোমার যা চেহারা হয়েছে! এখন চল দিকি নি, বাড়ি গিয়ে যত খুশি চা খাইও এখন।

না ভাই, এখন আমার বাড়ি যাওয়া হবে না। সামনেই পরীক্ষা—একে তো কদিন পড়াশুনা কিছুই করতে পারি নি। তাতে সময় নষ্ট করলে সব দিক নষ্ট হবে।

এ সব কথা মালতী শুনতে চায় না। পরীক্ষার মূল্য তার কাছে কিছুই নেই। জ্যোৎস্নার শরীর খারাপ, তাকে রেখে সে যেতে কিছুতেই রাজি নয়। কমলা মহা বিপদে প'ড়ে গেল। নন্দলালের গৃহে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন না হয়ে প্রবেশ করতে চায় না। সেখানে নন্দলালের গতি অব্যাহত। নন্দলালের প্রতি রূঢ় আচরণ ক'রে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করতে তার স্বভাবে বাধে। যদিচ এ কথা সে জানত যে, স্বভাবভীরু নন্দ তার গৃহে তার স্ত্রীর উপস্থিতিতে কোন প্রকার উৎপাতের সৃষ্টি করতে ভরসা পাবে না; তবু ইচ্ছাপূর্বক সে বিপদের সম্ভাবনাকে সম্ভব ক'রে তুলতে রাজি নয়। কিন্তু এ সব কথা মালতীকে সে বোঝাবে কেমন ক'রে! ওই যে স্নেহশীলা নিঃসন্দিগ্ধচিত্ত সরলা নারী নিজের অজ্ঞাতসারে নিজের বিপদকে আহ্বান ক'রে চলেছে, তাকে তার বিপদের বার্তা জানিয়ে তার জীবনের সুখশান্তি সে হরণ করতে পারবে না।

অনেক তর্ক-বিতর্ক অনুনয়-অনুযোগের পর কমলা বললে, আচ্ছা, দেখি ভাই যদি ছুটি পাই। নিখিলবাবুর অনুমতি না নিয়ে তো যাবার জো নেই। হাসপাতালের কাজে ক্ষতি হয় কিনা!

মালতী বল্লে, কি ভাই হাসপাতালের কাজ! মানুষ ম'লেও কি কাজ করতে হবে না কি? এ যে আপিসের বাড়া হ'ল! না না, ওসব হবে না। আমি এখুনি তোমার ভগ্নীপতিকে গিয়ে বলছি—সব ও ঠিক ক'রে দেবে এখন।

কমল ব্যস্ত হয়ে বলে, না ভাই, তার দরকার নেই।। আমি দেখছি, কি করতে পারি! ওঁকে মিছিমিছি আর কষ্ট দিও না।

মালতী কিছুতেই শুনলে না। সে বাইরের ঘরের দিকে চ'লে গেল।

কমল হতাশ হয়ে ভাবে, দেখা যাক অদৃষ্টে আবার কি আছে! কিন্তু তবু তার মনটা শান্ত রইল না। সে জোর ক'রে নিজেকে

বোঝাতে চেষ্টা করলে যে, নন্দলালের অনুতাপ নিশ্চয় আন্তরিক। কিন্তু মনের অস্বস্তি তার মনে কাঁটা হয়ে রইল।

মালতী বাইরের ঘরের দরজায় গিয়ে দেখলে যে, একজন সাহেবমত লোকের সঙ্গে তার স্বামী কথাবার্তা কইছেন। মালতী এসে অপ্রস্তুত হয়ে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা নন্দর নজরে প'ড়ে গেল এবং সে তাড়াতাড়ি উঠে এসে বললে, কি, যাবে বাড়ি? সে ইচ্ছে ক'রেই জ্যোৎস্নার কথা জিজ্ঞেস করলে না। মালতী বললে, যাব কি ক'রে? জ্যোৎস্নাদির শরীরটা ভারি খারাপ হয়েছে। তা যেতে বলছি তো বলে, নিখিলবাবু ছুটি না দিলে যেতে পারবে না। তুমি একটু ব'লে-ক'য়ে ছুটি ক'রে নাও না! নিখিলবাবুকে কি পাওয়া যাবে না?

নিখিলনাথের নামে নন্দর ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। সে বললে, পাওয়া যাবে না কেন? ওই তো এসে জ্যোৎস্নার জন্যে ব'সে আছে।

মালতীর মনে নন্দর ওই উগ্র মন্তব্যের কটু রসটুকু গিয়ে পৌঁছল না। যেটুকুর জন্য সে সম্প্রতি ব্যাকুল, তার বাইরে তার মস্তিষ্কের ক্রিয়া খুব তীক্ষ্ণ থাকে না। সে অনুনয় ক'রে বললে, তবে বল না গো একটু; দু দিন ছুটি কি আর দেবে না? ওর শরীরটা খারাপ, দু দিন একটু বাড়ি গিয়ে ঘুরে আসুক। একটু ব'লে দেখ না!

জ্যোৎস্নাকে বাড়ি নিয়ে যাবার আগ্রহ নন্দরও কিছু কম হওয়ার কথা নয়, সুতরাং নিখিলের প্রতি মনে মনে উত্তপ্ত হ'লেও সে অগত্যা গিয়ে জ্যোৎস্নার বাড়ি যাওয়ার দরবার নিখিলকে জানালে।

নিখিলনাথ বললে, হ্যাঁ, তা বেশ, দু দিন বাড়ি গেলে ওঁর মনটাও প্রফুল্ল হবে।

মালতী দরজায় দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্তা শুনছিল। ছুটির পরোয়ানা পেয়েই সে ছুটে উপরে জ্যোৎস্নার কাছে গিয়ে হাসতে

হাসতে সব জানালে। বললে, উঃ, ভারি মান বাড়ানো হচ্ছিল! উনি চ'লে গেলে হাসপাতালে একেবারে তালাচাবি পড়বে!

কমলা আর কিছু বললে না। তার নিজের অদৃষ্ট যে কখনই সুপ্রসন্ন থাকে না, এই তার আর একটা প্রমাণ মাত্র মনে ক'রে ক্ষুণ্ণমনে প্রস্তুত হতে লাগল। নিখিলনাথ এসেছেন অথচ তাঁর সঙ্গে যে তার বড় দরকার ছিল, তা সম্প্রতি তাকে মুলতুবি রেখেই যেতে হ'ল। মনটা তার ভার হয়ে রইল এবং ক্ষণে ক্ষণে তার চক্ষু সজল হয়ে উঠতে চাইল নিজের অদৃষ্টের উপর অভিমানে।

গাড়িতে তুলে দিয়ে কমলের দিকে চাইতে নন্দর কেমন সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগল। গাড়ির মধ্যে মুখোমুখী হয়ে ব'সে যাওয়ার চিন্তাটা তার কাছে রুচিরোচন বোধ হ'ল না। সে মালতীর দিকে চেয়ে বললে, আমার একটু বিশেষ কাজ আছে। তোমরা যাও; আমার ফিরতে সন্ধ্যে হবে।

কমল তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারল যে, নন্দলাল তার সঙ্গে একত্র এক গাড়িতে যেতে সঙ্কোচ বোধ করছে। তাতে একটু স্বস্তিও অনুভব করলে। একবার ভাবলে যে, অনুরোধ করে। কিন্তু নিজেকে কিছুতেই প্রস্তুত ক'রে উঠতে পারলে না। শুধু সঙ্কোচ নয়, তার একটু আশঙ্কাও ছিল মনে যে, এই অনুরোধে নন্দকে সে ভুল বুঝতে সাহায্য করবে এবং নন্দর স্পর্ধার পথ উন্মুক্ত ক'রে দেওয়া হবে।

মালতী বললে, দেখ কাণ্ড, এখন আবার কোথায় যাবে? এই তো বললে যে, আজ বিকেলে তোমার কোন কাজ থাকবে না। জানি নে বাপু, যত নেই-কাজ জুটিয়ে নেওয়া!

অন্য পক্ষ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে নন্দ মালতীর ব্যগ্রতার কোন সুবিধে নিতে ভরসা পেল না। আর কথা-কাটাকাটি না ক'রে সে

গাড়োয়ানকে বাড়ি যেতে হুকুম করলে। কমল মনে মনে খুবই লজ্জা পেতে লাগল, তবু মুখ ফুটে কথা বলতে পারলে না।

মালতী আবার প্রসন্ন চিত্তে তার সঙ্গে গল্প শুরু ক'রে দিলে। বেশির ভাগই খোকার কথা, ঘর-সংসারের কথা। নতুন বাড়িটায় একটু জমি আছে। তা ভাই, একটা গরু কেনার কথা বলেছি, তা ব'লে যে, গন্ধ হবে; হাঙ্গাম। পারি নে বাপু আর গয়লার সঙ্গে রোজ লড়াই ক'রে। পয়সা দিয়ে কতকগুলো জল গেলা।

গল্পের বিষয় এক জায়গায় আবদ্ধ নয়। গরুর কথা শেষ না হতেই খোকার নতুন মাস্টারের গল্প—মাস্টারের বাড়ি পূর্ববঙ্গে; খোকা তার কি মজার নকল করে ভাই, বাড়ি গেলে শোনাব এখন। এই রকম নানা কথা বলতে বলতে বলে, ও কি ভাই, চুপ ক'রে আছ যে? মাথার কষ্ট হচ্ছে বুঝি? ব'লে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে।

কমল তাড়াতাড়ি বলে, না না, তুমি গল্প করছ, তাই শুনছি। মালতী আবার উৎসাহে গল্প শুরু করে—আজকাল খোকা সব খেতে শিখেছে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

কমলের মন থেকে উদ্বেগ যেতে চায় না। নন্দ না জানি এবার কেমন ব্যবহার করবে, তাই ভাবে। ভাবে, বাড়িতে মালতীর সামনে সাহস করবে না। আবার ভাবে, অকারণেই হয়তো এসব ভাবছে। হাসপাতালে কাল তার জায়গায় সরোজিনী যাবে। ও বড় চঞ্চল। সেই মাড়োয়ারীর ছেলেটাকে হয়তো তেমন সাবধানে যত্ন করবে না। কি সুন্দর ছেলেটা, আহা, তার মা কাঁদছিল! চ'লে আসা ভাল হয় নি। নিখিলবাবু তো ছুটি না দিলেই পারতেন, আমার বুঝি আর পড়ার ক্ষতি হয় না! নিখিলবাবু তো এসেছিলেন; একটাও কথা বলা হ'ল না তাঁর সঙ্গে! কিছু দরকারে এসেছিলেন নিশ্চয়। আজ কিছুদিন তাঁকে কি রকম অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। রোগাও হয়ে গেছেন। কেবল যত

রাজ্যের কাজ ঘাড় পেতে নিলে কি মানুষের সয় ? আচ্ছা, ওঁর কিসের ভাবনা ? সরোজিনী বলছিল, ক্ষিতীশ গুপ্ত নাকি বলেছে, মাস কয়েক আগে কে একজন মেয়ের সঙ্গে বিকেলে বেরিয়ে গিয়ে মাঝরাত্রে ফিরেছেন। দরোয়ান নাকি বলেছে, সায়েব গাড়ি নিয়ে যায় নি। ক্ষিতীশ গুপ্তটা ভারি বদ। ওঁকে হিংসে করে কি না ! সরোজিনীর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, ওই বাঁদরটার সঙ্গে যত আড্ডা। ডাক্তারের কত জরুরী কাজ থাকে। তোদের অত মাথাব্যথা কেন ? আচ্ছা, কে মেয়েটি ? হঠাৎ সচেতন হয়ে শোনে মালতী গল্প ক'রে চলেছে—ওঁর ভাই, ওই কি একরকম হয়েছে। ব্যবসা ব্যবসা ক'রে মাথাটা গেল। রাত্রে ঘুম নেই। এক-এক দিন জেগে দেখি, উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে। আগের চেয়ে রাগও বেড়েছে। আমি বলি, এমন টাকা দিয়ে হবে কি ? ইত্যাদি। কমল ভাবে, যেখানেই যাবে সে একটা অশান্তির সৃষ্টি করবে। এমন জীবন ব'য়ে বেড়ানোর চেয়ে আর নরক কি হতে পারে ?

গাড়ি এসে বাড়ির দরজায় থামল।

৪১

নন্দের বাড়ি গিয়ে কমলের অসুখের কিছুই উপশম হ'ল না। যেন কিছুই হয় নি, এই ভাবে খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি ক'রে গল্পগাছা করবার চেষ্টা সে করলে। তার পর অসহ্য বোধ ক'রে এক সময় গিয়ে সে শুয়ে পড়ল। মালতী উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করাতে বললে, একটু শুয়ে নিই। আমায় ডেকো না ভাই, আজ আর কিছু খাব না।

মালতী ব্যস্ত হয়ে বললে, বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে বুঝি ? ওমা, এতক্ষণ বল নি কেন ভাই ? ইস, চোখ দুটো যে লাল হয়ে উঠেছে ! চল চল, বিছানা ক'রে শুইয়ে দিই গে। একটু বরফ দেবে মাথায় ?

কমল লজ্জিত হয়ে বললে, না না, তেমন কিছুই না। একটু ঘুমুলেই সেরে যাবে।

মালতী শোনে না। তাকে জোর ক'রে খালি খাট থেকে উঠিয়ে পাশের ঘরে বিছানা ক'রে শুইয়ে দেয়। বিরক্ত হয়ে বলে, দেখ দিকিনি ভাই, উনি এই সময় কোথায় গেলেন! একজন ডাক্তার ডাকা তো উচিত! ভগলুকে বরং একবার হাসপাতালে পাঠিয়ে দিই, নিখিলবাবুকে ডেকে নিয়ে আসুক।

কমল ব্যস্ত হয়ে বলে, না না, ও কিছুই নয়। একটু ঘুমুলেই সব সেরে যাবে 'খন, দেখো। ও রকম আমার রোজ হয়।

সন্ধ্যার খানিকটা পরে নন্দলাল বাড়ি ফিরল। কিন্তু বৈঠকখানা থেকে অন্দরমহলে যেতে তার পা উঠল না। সেইখানে ব'সেই সে উপায় চিন্তা করতে লাগল যে, কমলের বিরক্তি বাঁচিয়ে কেমন ক'রে তার কাছে নিজেকে নিয়ে উপস্থিত করবে। নিতান্ত কিছুই ঘটে নি—এমনই ভাবে অবশ্য ব্যবহার করা যায়, কিন্তু যেখানে সত্যিই কিছু ঘটেছে সেখানে সে ভাবটা বজায় রাখার মত কলাকৌশলে সে অভ্যস্ত ছিল না।

এমন সময় মালতী এসে জ্যোৎস্নার পীড়ার সংবাদ দিলে। অসুখের সংবাদে আত্মীয়ের যেমন উদ্বিগ্ন হবার কথা, নন্দর মুখে ঠিক সে রকম উদ্বেগের ভাব দেখা গেল না। একটা আশা, কেন এবং কিসের তা কে জানে, গোপনে গোপনে তার মন থেকে যেন একটা দুশ্চিন্তার মেঘ কাটিয়ে দিতে লাগল। কিসের এই আশা? জ্যোৎস্নার কাছে এই অসুখের সূত্রে আত্মীয়ের স্বাভাবিক হৃদ্যতা নিয়ে উপস্থিত হতে পাবার সুযোগ হবে—এই ভেবে? না, এই সুযোগে জ্যোৎস্নার বিমুখ চিত্তকে অনুকূল করবার সুযোগ পেতে পারে—এও ভেবে, কে জানে? কিন্তু তার পীড়ার সংবাদে যে সে ঠিক বিচলিত হয়ে পড়ল এমন বোধ হ'ল না। বললে, ভগলুকে দিয়ে বরফ আনিয়ে মাথায় আইস-ব্যাগ দাও;

আমি যাচ্ছি একটু কাজ সেরে। ব'লে অকারণে একখানা মোটা খাতা খুলে মনোযোগের সঙ্গে পাতা ওলটাতে লেগে গেল।

মালতী বললে, তোমার খাতাটা একটু রাখ তো। দিন রাত ওই নিয়ে মাথা খারাপ্ হয়ে যাবার জো হ'ল। একটা ডাক্তার-টাক্তার ডাকা দরকার, নাকি?

এখনই অন্দরে গিয়ে জ্যোৎস্নার কাছে তার ব্যাকুল চিত্তের উদ্বেগ প্রকাশ করবার ইচ্ছা প্রবল হ'লেও মালতীর কাছে সে এক রকম উপেক্ষার স্বরেই বললে, হ্যাঃ, একটু মাথা ধরেছে না কি, তাই আবার ডাক্তার ডাক! তোমাদের যত বাড়াবাড়ি!

বাড়াবাড়ি আবার কি? অসুখ করলে লোকে ডাক্তার ডাকে। সে কাতরাবার মেয়ে নয়, তাই চুপ ক'রে প'ড়ে আছে। আমার অমনটা হ'লে আমি তো চেঁচিয়েই বাড়ি মাথায় করতুম। তা যা হয় কর বাপু, আমি চললুম।

অতএব নিতান্ত অগত্যার ভাবে উঠে নন্দ বাড়ির ভিতর গেল।

একটা মটকার চাদরে আবক্ষ আবৃত হয়ে কমল শুয়ে আছে। হঠাৎ দেখলে নিদ্রিত ব'লেই মনে হয়। কেবল তার আকুঞ্চিত ললাটে যন্ত্রণার চিহ্ন পরিস্ফুট। মাঝে মাঝে গভীর দীর্ঘশ্বাসে সেই আভ্যন্তরিক যন্ত্রণার উষ্ণ বাষ্পকে যেন নিষ্কৃতি দিচ্ছে।

নন্দ মালতীকে কানে-কানে জিজ্ঞেস করলে, জ্বর আছে নাকি? ইচ্ছাসত্ত্বেও কপালে হাত দিয়ে সহজভাবে সে রোগীকে পরীক্ষা করতে ইতস্তত করছিল।

মালতী বললে, জানি নে। তুমি দেখ না কপালে হাত দিয়ে!

নন্দ নিতান্ত কর্তব্যের খাতিরেই পা টিপে কাছে গিয়ে তার কপাল স্পর্শ করলে। কমল চোখ চেয়ে নন্দকে দেখে তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় দিয়ে উঠে বসল। মালতীর দিকে চেয়ে বললে; কেন ভাই,

মিছে ব্যস্ত হচ্ছ ? ও আমার কিছুই নয়। অমন প্রায়ই হয়। একটু ঘুমলেই সেরে যাবে তো বললাম। মিছিমিছি তুমি বড় ব্যস্ত হও।

মালতী গোলমাল ক'রে বলতে লাগল, না, কিছু নয়! রগের শির ফুলে উঠেছে, চোখ দুটো লাল জবাফুলের মত হয়েছে—কিছু নয়! কিছু নয় তো, কিছু নয়। তুমি চুপ করে শোও তো।...আবার ধড়মড়িয়ে উঠে বসলে কেন ? এখন আমাদের এখানে এসেছ, আমরা যা বলব তাই শুনতে হবে। কিছু নয় নয় ক'রে চেহারা কি হয়েছে দেখতে পাও ?

নন্দ এর মধ্যে কি বলবে কিছুই ঠিক করতে পারলে না। কেমন ক'রে সে নিজের অনুতপ্ত ভাব প্রকাশ ক'রে তার সেবা করবার সুযোগ লাভ করবে তাও ভেবে উঠতে পারল না। এটুকু সে স্পষ্টই বুঝতে পারলে যে তার উপস্থিতি জ্যোৎস্নার কাছে স্বস্তিকর নয়। সুতরাং অগত্যা সে যথাসম্ভব সহজ গলায় আইস-ব্যাগ দেবার উপদেশ দিয়ে মনে মনে প্রায় রুষ্ট হয়েই বেরিয়ে বৈঠকখানায় চ'লে গেল।

জ্যোৎস্নাকে যে সহজে আয়ত্ত করতে পারবে না, তা তার অজানা ছিল না। কিন্তু জ্যোৎস্না যে তার প্রত্যেকটি নিরাপদ গতিবিধি সম্বন্ধেও এতটা সজাগ থাকবে এতে তার বিরক্তির সীমা রইল না। পুরুষ-অভিভাবকবিহীন একটা স্ত্রীলোক যে সম্পূর্ণ পুরুষ-সম্পর্কশূন্য চিত্তে চিরকাল অতিবাহিত করতে পারে, এ তার ধারণার মধ্যে আসেই না। এ সে বিশ্বাসই করতে পারে না। তবে কেন ? কে জ্যোৎস্না মনকে এমন ক'রে আবদ্ধ করেছে যে, সে নিজের সুনিশ্চিত অন্ধকার ভবিষ্যতের বিরুদ্ধেও এমন ক'রে তার প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে ? বিশেষত তার সঙ্গে প্রেমের এই গোপন বিনিময়ে যখন জ্যোৎস্নাকে কোন পরিবর্তন বা বিপর্যয় কিংবা বৃহৎ ত্যাগ-স্বীকার করতেও হচ্ছে না। তার সন্তানকে সে এতদিন সন্তাননির্বিশেষে পালন ক'রে এসেছে ; এবং

চিরদিন তার স্নেহের আশ্রয়ে রেখে জ্যোৎস্না তা হ'লে নিঃসঙ্কোচেই তাকে মানুষ ক'রে তুলতে পারবে। বরং তখন মনের দিক থেকে তার দাবিই জন্মাবে—এখানকার মত নিয়ত তাকে পরান্নভোজীর অবনতি অনুভব করতে হবে না। তবে কেন তার এই বিরুদ্ধতা? কেন, কেন, কেন—ভাবতে গিয়ে নিখিলনাথ সম্বন্ধে সন্দেহ তার ক্রমে বিশ্বাসে পরিণত হতে লাগল। সে মনে মনে বললে, নাঃ, এমনই ক'রে ডাক্তারের হাতে ছেড়ে দিতে পারব না। একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখব। তা নইলে শালা ডাক্তারকে একবার দেখে নেব।

সেদিন রাত্রে কমলের মাথার যন্ত্রণা খুবই বেড়ে উঠল। সে মনে মনে বহুবার নিখিলনাথের কথা ভাবলে। কিন্তু নন্দলালের সেদিনকার কুৎসিত ইঙ্গিতের পর সে নিখিলনাথের কথা উচ্চারণ করতেও সঙ্কোচ বোধ করতে লাগল। নিজেই সে নিজের চিকিৎসার দু-একটা মামুলি ওষুধ ও ব্যবস্থার কথা ব'লে শ্রান্ত হয়ে প'ড়ে রইল চোখ বুজে।

সমস্ত দিন সংসারের নানা ঝঞ্ঝাট পোহানোর পর রাত্রে মালতী অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ত। তবু সে প্রথম রাত্রিটা প্রাণপণে রোগীর সেবায় নিজেকে নিযুক্ত রাখলে। কমলের বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও সে পাখা নিয়ে তাকে বাতাস করতে লাগল। কিন্তু তার পরিশ্রান্ত চোখ ঢুলে এল; এবং দু-একবার যখন শ্রান্ত হাতের পাখাটা ঘুমের ঢুল খেয়ে রোগীর গায়ের উপর পড়তে শুরু হ'ল, তখন সে বুঝলে যে, খানিকটা না ঘুমিয়ে নিলে আর বসা চলে না।

মাঝে মাঝে বরফ ভেঙে আইস-ব্যাগটা ভ'রে দেবার উদ্দেশ্যে নন্দলাল ঘরে এসে রোগীর সংবাদ নিচ্ছিল। মালতী তার কানে কানে বললে, তুমি একটু পাখাটা ধর দিকিনি, আমি খানিকটা না গড়িয়ে নিয়ে যেন পারছি না।

মনের উল্লাস কোনমতে চাপা দিয়ে নন্দলাল বিনাবাক্যব্যয়ে

পাখাটা তার হাত থেকে নিয়ে মালতীকে পাশের ঘরে শুতে পাঠিয়ে দিলে।

ঘর নিস্তব্ধ নিঃঝুম। টেবিলের উপরে শেজের বাতিটা নীল কাগজ দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। এই দুটি ব্যক্তিকে আড়াল ক'রে সমস্ত বাড়িতে যেন সুপ্তির পর্দা টানা। কমল বোধ হয় ঘুমিয়েই পড়েছিল কিংবা যন্ত্রণাতেই তার চেতনা বোধ করি আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল। সে নিঃসাড় হয়ে প'ড়ে আছে। নন্দলাল এক হাতে ব্যাগটা ধ'রে অন্য হাতে ধীরে ধীরে পাখার বাতাস করছে। আর নিস্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে কমলের মুখের দিকে। ওই একটুখানি অসহায় স্ত্রীলোক, কি তার শক্তি, তা সে বুঝে উঠতে পারে না। তবু তাকে আয়ত্ত করা এত কঠিন! তার সমস্ত পৌরুষ কেন যে এমন অসহায় হয়ে পড়ে, কেন যে তার পুরুষের অকুণ্ঠিত বল সে অনায়াসে প্রয়োগ করতে পারে না, তাই ভেবেই সে অবাক হচ্ছে। ভাবতে ভাবতে সে যেন নিজেকে আর ধ'রে রাখতে পারে না। তার বাসনা তার দেহকে জাগিয়ে তুলছে কোন উপায়ে ওর নাগাল পাবার জন্যে। তবু হঠাৎ একটা অভদ্র আচরণ করতে যেন তার হাত সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে। এখনই কোন একটা রূঢ় আঘাতে আবার সে তার ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে না ধূলিসাৎ করে! তা ছাড়া মালতী পাশের ঘরে।

কপালের চুলগুলো বরফের জলে ভিজে উঠেছে। সে পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে আস্তে আস্তে মুছে নিলে। কমল চুপ ক'রেই প'ড়ে রইল। এই সেবার একাগ্রতার ইতিহাসটুকু বুঝি তার কাছে গোপনই রইল। ব্যাটা ডাক্তার কি তার মত ক'রে ওর কথা ভাবতে পারে? তার কাছে ওর মূল্য কতটুকু? একটা নার্সের প্রতি একটু কৃপাকটাক্ষ করা ছাড়া তার আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? কি

দারুণ দুর্দৈব থেকে সে ওকে রক্ষা করেছে, সে কথা কি ওর একবারও মনে হয় না? আজ সে কার জোরে এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে? তার অপরাধ কি? ভালবাসা কি অপরাধ? জ্যোৎস্নাকে সে ভালবাসে? ভালবাসেই তো। আজ তার এই যন্ত্রণার সময় সে যে নিদ্রাহীন রাত্রি তার সেবায় একাগ্রচিত্তে নিযুক্ত করেছে, এ কি শুধু সে আশ্রিত ব'লে? কখনই না, সে তাকে ভালবাসে। তার আজকের যন্ত্রণা একটু মাত্র উপশম করতে পারলেও সে তৃপ্তি পাবে। মাথার যন্ত্রণার বড় কষ্ট। নিজের একবার হয়েছিল—রগ দুটো যেন ফেটে পড়ছিল সেদিন। মাথাটা একটু টিপলে বোধ হয় একটু আরাম্ হ'ত। একটু টিপে দিলে ক্ষতি কি? কিন্তু যদি জেগে ওঠে, যদি বিরক্ত হয়? কই, চুল মুছে দেবার সময় তো কিছু বলে নি! দিই না। একবারের সাফল্যে নন্দর মনের জড়তা এবং ভীরুতা অনেকটা দূর হয়ে তাকে দ্বিতীয়বার অগ্রসর হওয়ায় যেন সাহস দেয়। সে ব্যাগটা সরিয়ে রেখে কপাল এবং রগটা ধীরে ধীরে ড'লে দিতে লাগল।

কমল ঘুমোয় নি। কতকটা যন্ত্রণার জন্যও বটে এবং কতকটা ওষুধের আবেশেও বটে, সে আচ্ছন্নের মত প'ড়ে ছিল। বাহ্য ব্যাপারে মস্তিষ্ক চালনা করবার মত ক্ষমতা তার ছিল না; তাই কপালের জলটুকু মুছে নেবার সময় সে বড় একটা খেয়াল করে নি। মালতী যে বিশ্রাম করতে গিয়েছে, এ কথার ঠিকমত ধারনা তার ছিল না। তাই সে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়েই নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিল। কারও সেবা সহজে গ্রহণ করা যদিও তার স্বভাববিরুদ্ধ, তবুও আজ সেবাটাও তার পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক এবং কাম্য বোধ হচ্ছিল। সে নির্জীব হয়ে প'ড়ে মালতীর সেবা ভেবেই এই স্নেহের অত্যাচারটুকু উপভোগ করছিল।

নন্দলালের হাতের প্রথম স্পর্শেই সে সন্ত্রস্ত হয়ে তার বোধশক্তিকে

সচেতন ক'রে তুললে।' প্রথম কয়েক মুহূর্ত তার বিশ্বাসই হয় নি যে, নন্দলালের সহসা এ-প্রকার দুঃসাহস হতে পারে। তার সেবাদক্ষ মনে এ কথাটাও জাগল যে, রোগীর প্রতি স্বাভাবিক করুণায়ও তো নন্দলাল এইটুকু করতে পারে। একজন মানুষকে কেন সে এমন কুৎসিত রূপ দেবার চেষ্টা করছে? এ কি প্রবৃত্তি তার! নন্দলালের অনুতাপ যে সত্যই আন্তরিক—এই রকম কল্পনা ক'রে সে এই সেবা সহ্য করবার সঙ্কল্প মনে জাগাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু অন্তর তার কোনমতেই সায় দিতে চাইল না। নিজের সঙ্গে এই রকম বোঝাপাড়া করতে তার যেটুকু বিলম্ব হ'ল, নন্দলালের লোভাতুর চিত্তে তা অনেকখানি দুরাশার সঞ্চার করলে। কমল কিন্তু চোখ খুলতে বা জাগরণের কোন লক্ষণ প্রকাশ করতে পারল না। সজ্ঞানে সহজ ভাবে নন্দলালের দুঃসাহসকে সে প্রশ্রয় দিচ্ছে, নন্দলালের মনে এই স্পর্ধার উদ্রেক করতে তার শীলতায় বাধা পেতে লাগল। সে কাঠ হয়ে প'ড়ে রইল। নিজের এবং নন্দর সঙ্গে সে যে এই প্রতারণাটুকু করলে, সেইটাই তার বিপদ ডেকে আনলে। দুর্বৃত্তকে দমন করতে হ'লে তার প্রশ্রয় পাবার উপায়টাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করা বুদ্ধির কাজ। নইলে তার সাহসকে দুঃসাহসে এবং আকাঙ্ক্ষাকে স্পর্ধায় পরিণত ক'রে তুলতে সাহায্যই করা হয়। অল্পক্ষণ পরে গভীর পরিতাপের সঙ্গে তার ভুল সে বুঝতে পারলে।

নন্দলালের অঙ্গুলির গতিভঙ্গীতে তার দুশ্চেষ্টার আভাস অনুভব ক'রে তার সমস্ত সত্তা যেন সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। ওর হাত যেন একটা ক্লেদাক্ত মাকড়সার মত, ঘৃণায় তার দেহটাকে কণ্টকিত ক'রে তুলছে—সে যেন জাল বুনছে তার অসহায় অদৃষ্টের চতুর্দিকে, তার সমস্ত দেহটা বিদ্রোহ ক'রে উঠতে চাইছে। তীব্র বিদ্বেষের অনুভূতিতে তার যন্ত্রণা যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ডটা আছাড় খাচ্ছে এঞ্জিনের মত—মাথার মধ্যে রক্ত চলছে রেলের চাকার আবর্তনের

গতিতে। সমস্ত চেতনা সংহত হয়ে স্পর্শানুভূতি মাত্রে পর্যবসিত হয়েছে, এবং সেই অনুভূতি তার সমস্ত দেহকে গৌণ ক'রে ললাটক্ষেত্রে নন্দলালের অঙ্গুলির মন্থর কম্পিত গতিবিধি অনুসরণ ক'রে ফিরছে।

সহসা তার কপালের উপর একটা ভয়াবহ উষ্ণ নিশ্বাস অনুভব ক'রে ঘৃণায় শিউরে চেয়ে দেখলে—তার মুখের অত্যন্ত নিকটে আর একটা মুখ—নন্দলালের মুখ,—উঃ তার! লোভাতুর নেত্রের ক্ষুধার্ত সেই দৃষ্টি। অকস্মাৎ তার মনে হ'ল, ও যেন একটা লোলুপ নেকড়ে বাঘ,—নির্মম বীভৎস, ভয়ঙ্কর। এই আতঙ্কের চমক খেয়ে সে নিজের অজ্ঞাতে 'ও মা গো' ব'লে চেঁচিয়ে উঠে দুই হাতে নিজের মুখমণ্ডল আবৃত ক'রে ফেললে।

কতক ভয়ে কতক বা কামনার তাড়নায় নন্দলাল এক হাতে তার মুখ চেপে ধরলে এবং সহসা একমুহূর্তে তার মুখের উপর প'ড়ে বারম্বার তাকে চুম্বন করতে লাগল।

এই দুর্দান্ত বিভীষিকার দুঃসহ ক্লেদসিক্ত সরীসৃপটার কবল থেকে বিপুল বলে সে যে কেমন ক'রে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, তা তার মনে নেই। দেহ তার কম্পিত হচ্ছে বেতসপত্রের মত, আর এক মুহূর্তের মধ্যে যেন সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে; ঘরের বাইরে যাবার জন্ম ছুটে সে দরজার দিকে গেল।

দুশ্চিন্তার জন্যই হোক বা তার স্বামীকে সেবা থেকে মুক্তি দেবার ইচ্ছাতেই হোক, মালতীর সে রাত্রে নিদ্রা গাঢ় হয় নি। কমলের প্রথম আওয়াজেই সে উঠে প'ড়ে ছুটে এই ঘরে এসে উপস্থিত হয়েছিল, এবং সমস্ত দৃশ্যটি যেন তার কাছে বিশ্বাসযোগ্য প্রত্যক্ষ ঘটনা ব'লে বিশ্বাস হতে চাইল না। তার চোখের সামনে সমস্ত জগৎ সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেল। ঐ ঘৃণ্য রক্তমাংসলোলুপ জানোয়ারটা যে তারই স্বামী, তা যেন সে ধারণার মধ্যে আনতে পারছে না। সে আবার ছুটে ঘর

থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে মেঝের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল। তার কাছে একমুহূর্তে সমস্ত সুখ-সম্পদ, ঐশ্বর্য-সংসার, সব নিঃস্ব হয়ে গেল।

মালতীকে দেখেই নন্দলালের মনটা এক নিমেষে শিকারের প্রবৃত্তি থেকে ভয়ের অন্ধকার গুহায় গিয়ে প্রবেশ করেছিল। ভীরু নন্দলালের চিত্তে পৌরুষের প্রবলতা ব'লে কোন বস্তু ছিল না। নিজের শক্তিতে সমাজ এমন কি মালতীর ঘৃণার বিরুদ্ধে যে সে নিজের বাসনার উদ্দাম স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রকাশ্যে প্রশ্রয় দিয়ে বিদ্রোহ ক'রে দাঁড়াবে, এমন মেরুদণ্ডের শক্তি তার নেই। সমস্ত দিকের নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রাকে বিক্ষুব্ধ না ক'রে গোপনে যেটুকু উপভোগ করা যায়, সেইটুকুর উপরেই তার লোভ। সমস্ত নিরাময় সংসারযাত্রার মধ্যে একটা ঘোরতর বিপ্লবের সম্ভাবনায় সে মনে মনে আতঙ্কিত হয়ে উঠল। কি করলে এর আশু প্রতীকার করা যায়, তার কোন যুক্তি তার উত্তেজিত মস্তিষ্কে যেন প্রবেশ করতে চাইল না; এবং অকস্মাৎ যেন দিশাহারা হয়েই সে ছুটে কমলের পায়ের কাছে প'ড়ে দুই হাতে তার পা চেপে ধ'রে রোদনোন্মুখ কম্পিত স্বরে বলতে লাগল, আমায় ক্ষমা কর। আমি নিতান্ত পাষণ্ড—আমি পশু। পশু ব'লেই আমাকে ক্ষমা কর। তোমায় তো কোন পাপ স্পর্শ করে নি। তুমি আমায় ক্ষমা কর। নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় কমলের তখন শ্বাস রোধ হবার মত মনে হচ্ছে। কিন্তু সে যন্ত্রণার চেয়েও এই লোকটার ঘৃণিত ক্ষমাভিক্ষার নির্লজ্জ দুঃসাহস তার অসহ্য বোধ হতে লাগল। কোন রকমে সে ছুটে ঘরের বাইরে বেরিয়ে চ'লে গেল; এবং ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নিরাশ্রয় সমুদ্রের মধ্যে এক খণ্ড কাঠের টুকরো নিমজ্জমান লোকে যেমন ক'রে জড়িয়ে ধরে, পাশের ঘরে ছুটে গিয়ে সে অজয়কে তেমনই ক'রে বুকে জড়িয়ে ধ'রে 'মা মাগো' বলতে বলতে উচ্ছল হয়ে কাঁদতে লাগল।

এতউজেনারা মস্তেধ্য ও যে মালতী তার স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনে অবার উৎকর্ণ হয়ে তার কথা শুনতে পারে, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। দুঃখের নিরতিশয় বেদনার পীড়ন সত্ত্বেও সে তার স্বামীর কথার আওয়াজে হাতের উপর ভর দিয়ে অল্প উঁচু হয়ে শুনতে লাগল, আমায় ক্ষমা কর, আমায় ক্ষমা কর। তোমায় তো কোন পাপ স্পর্শ করে নি—ইত্যাদি।

প্রথম বার পাশের ঘরে ঢুকে চুম্বনরত নন্দকে দেখে স্বভাবতই তার মন কমল সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ এবং নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তার স্বামীর এই শেষ কথাগুলিতে আপনিই তার মনের বেদনা অনেকটা যেন লঘু হয়ে এল। তার একমাত্রকে যে অন্যে গ্রাস ক'রে নেয় নি, স্ত্রীলোকের পক্ষে তা নিতান্ত অল্প সান্ত্বনার কারণ নয়। তা ছাড়া মালতী ইংরেজী-সাহিত্যচারী আধুনিকাদের সূক্ষ্ম দাম্পত্যতত্ত্বে অভিজ্ঞা নয়। অতএব স্ত্রীর প্রতি পুরুষের পালটা কর্তব্যনীতির বিচার সম্বন্ধে তার মতামত নিদারুণ রকমের কঠিন ছিল না। যেখানে তার দুর্লঙ্ঘ্য অভিমান নিয়ে দুশ্চরিত্র স্বামীকে পরিত্যাগ ক'রে একাকিনী জীবন-যাপন করবার সুদৃঢ় সঙ্কল্প করা উচিত ছিল, সেখানে সে মাত্র ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে রইল। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কমলের উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে, তার অভিশপ্ত দুঃখময় জীবনের প্রতি করুণায়, মালতীর স্বভাবপ্রসন্ন করুণাপূর্ণ চিত্তের এই ক্রোধের উত্তাপ কখন এক সময় শান্ত হয়ে এল। সে ধীরে ধীরে উঠে কমলের পাশে গিয়ে বসল এবং বোধ করি এক রকম স্বামীর অপরাধেই অনুতপ্ত হয়ে তার পিঠে হাত বুলিয়ে নীরবে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

৪২

পরদিন সকালবেলা কমল হাসপাতালে ফিরে গেল। ঝড়ের পর একটা ক্ষতমজ্জা বনস্পতির যেমন একরকম ভগ্নশাখা ছিন্নপত্র বিধ্বস্তপ্রায়

চেহারা হয়, তার মনের ভিতরটাও কতকটা তেমনই স্রস্ত শিথিল বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

যাবার সময় সে মালতীকে গিয়ে বললে, দিদি, আমি এসেছিলাম সংসারে শুধু দুঃখ ছড়াবার জন্যে। নিরুপায়ে তোমার পায়ে না জেনে অনেক অপরাধ করেছি—ক্ষমা ক'রো। খোকনকে দেখো। তুমি ছাড়া—

এইটুকু ব'লে আর সে সামলাতে পারলে না ঠোঁটে ঠোঁট চেপে প্রাণপণে উদ্গত অশ্রু সম্বরণ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল।

মালতী তাড়াতাড়ি তার হাত ধ'রে অশ্রুমুখী হয়ে বললে, তোমার ভাল করবার ছুতোয় যারা তোমার সর্ব্বনাশ করার ফিকির ক'রে তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে আর অপরাধ বাড়িও না, বোন। আমি বেঁচে থাকতে খোকনের কোন ক্ষতি কেউ করতে পারবে না।

কমলা গড় হয়ে মালতীর পায়ে প্রণাম করতে করতে বললে, তা জানি, খোকনের এই হতভাগী মার চেয়েও যে তুমি বেশি তা জানি ব'লেই আজ বুকটা বাধতে পেরেছি দিদি।

কমলা পায়ে হাত দেওয়ায় মালতী যেন অপরাধ-ভয়ে এক পা পিছিয়ে গিয়ে বললে, ও কি ভাই! অপরাধ হবে যে! দুগ্‌গা দুগ্‌গা! ব'লে কমলাকে ধ'রে তুললে। কোন্ যুক্তিতে বলা কঠিন, কিন্তু মালতীর মনে কেমন একটা অন্ধ বিশ্বাসই ছিল যে, জ্যোৎস্না বামনের মেয়ে।

বাইরে ভগলু গাড়ি এনে অপেক্ষা করছিল। কমলা চোখের জল মুছতে মুছতে তাড়াতাড়ি গাড়িতে গিয়ে উঠে পড়ল। বুকটা ফেটে গেলেও পাছে মনে কোন রকম দুর্বলতা এসে তার অন্তরের কঠিন সংকল্প থেকে তাকে বিচ্যুত করে, এই ভয়ে খোকার কোন তত্ত্ব সে করলে না। প্রাণ থাকতে এ বাড়িতে সে যে আর পদার্পণ করবে না, এ সম্বন্ধে কাল সমস্ত রাত্রি প্রতিজ্ঞা ক'রে কঠিন পণে নিজের চিত্তকে যে সে প্রস্তুত করেছে।

জ্যোৎস্নার দুঃখপীড়িত অশ্রুলাঞ্ছিত মুখখানা মালতীর মনটাকেও অশ্রুভারাক্রান্ত ব্যথিত ক'রে তুললে! স্বামীর উপর রাগে বিরক্তিতে মনটা তার তেতো হয়ে উঠল। তবু কমলা যে খোকনকে তার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চ'লে না গিয়ে তারই কাছে রেখে গেল, তাতে তার মনটা আপাতত একটা দুর্ভাগ্য থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে জ্যোৎস্নার উপর যেন কৃতজ্ঞ হয়ে রইল। সমস্ত রাত্রির দুশ্চিন্তার মধ্যে খোকনের বিচ্ছেদ-সম্ভাবনাই তাকে বিচলিত করেছিল সবচেয়ে বেশি। সেই চাপা ভয়ের অবরুদ্ধ বেদনার বাষ্প মুক্তি লাভ করতেই মালতীর মন হালকা হয়ে নন্দলালের দুষ্ক্রিয়ার প্রতি উদ্যত হয়ে ওঠবার অবসর পেল যেন! মনে মনে রেগে বললে, 'আসুক না একবার, টের পাওয়াব 'খন মজাটা।' কিন্তু 'মজা যাকে টের পাওয়াব' তার দেখা পেলে তো? নন্দলালের নাগাল পাওয়া মালতীর অসাধ্য হয়ে উঠেছে। বাড়িমুখো যদিই বা সে হয়, তাও গভীর রাত্রে, নিতান্ত চোরের মত। বাইরে বৈঠকখানার ঘরে কোন মতে রাতটা কাটায়—কি কাটায় না, এমনি ভাব। সেদিন রাত্রে মাংসলোলুপ যে নেকড়ে বাঘটা ওর অন্তরের গুহার অন্ধকারে ব'সে ওর চোখ-মুখ দিয়ে উঁকি মারছিল, তার আহত পুচ্ছের ডগাটুকুও আজ আর নজরে পড়ে না; তার জায়গায় যেন বাসা বেঁধেছে একটা হাঁড়িচোরা মেনী বেরাল—ওর মুখ দেখলে তাই মনে হয়।

রেগে-মেগে মালতী ক'দিন নন্দর কোন খোঁজখবর নিলে না। অবশ্য, নন্দলালের পক্ষে সেটা নিতান্তই যে অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা নয়। তাক-মত কেমন ক'রে মালতীর দৃষ্টি থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে বেড়াবে সেইটেই ছিল তার চেষ্টা। মালতীর তরফ থেকে একটা বিপ্লব, সে যেন মনে মনে আকাঙ্ক্ষাই করছিল। তার ভবিষ্যৎ জীবনটাকে একটা আকস্মিক ভূমিকম্পের আঘাতে ভেঙে-পড়া সংসারের

ভগ্নস্তূপের মধ্যে কল্পনা ক'রে মনে মনে তার আর স্বস্তি ছিল না। জ্যোৎস্নার উপর অকারণেই কেমন যেন তার রাগ হতে লাগল। কোনও একটা কৈফিয়ৎ জুটিয়ে নিয়ে মালতীর কাছে যে সে ক্ষমা ভিক্ষা করতে যাবে, তারও দুঃসাহস বেচারা কিছুতেই সংগ্রহ ক'রে উঠতে পারে না।

কাজের উপর কাজের বোঝা চাপিয়ে উৎসাহহীন গর্দভের মত তার ভারাক্রান্ত দিবসগুলিকে টেনে সে মলিন বেশে রুক্ষকেশে বাইরে বাইরে ঘুরে কাটিয়ে দিতে লাগল। বেচারা নিজে একটু শিথিল-প্রকৃতির মানুষ; তাতে আবার নিজের নিত্য-প্রয়োজনের তাগিদগুলো পর্যন্ত মালতীর সতর্ক দৃষ্টির শাসনে নিয়ন্ত্রিত হওয়া তার বহুদিন ধ'রে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। নিজের সেবাযত্ন পারিপাট্যের নিপুণতা তার ছিল না। সুতরাং কিছুদিনের মধ্যেই নিতান্ত অসহায় অবোধের মত সে অভ্যস্ত স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবে সত্যই বড় কাতর হয়ে পড়ল। অনাহার-অর্ধাহার-অনিদ্রা-অস্নান-জনিত অত্যাচারে নন্দর অবস্থাটা শত্রুরও অকাম্য হয়ে পড়েছে, এবং এত দিন পরে এবার তার নিজের দুষ্ক্রিয়ায় নিজের উপর প্রায় একটা অকপট বিরক্তি এবং অনুতাপে তার মনটা পূর্ণ হয়ে উঠল। তার ইচ্ছে করতে লাগল যে, না-হোক একটা দুর্ব্যবহার ক'রে মালতী ব্যাপারটাকে চুকিয়ে ফেলুক। মালতীর কি দয়ামায়া ব'লে কোন বস্তু নেই? যদি তার একটা শক্ত অসুখ হয়? একটা অসুখ-বিসুখ করলে যে মালতী উদাসীন থাকতে পারবে না, তা এক রকম সে নিশ্চয় জানত; এবং একাগ্রচিত্তে সে দেবতার কাছে অন্তত একটা কঠিন পীড়ার জন্য মনে মনে কাতর প্রার্থনা জানাতে লাগল।

ক্রোধের প্রথম উত্তেজনাটা কেটে গেলে, দু-চার দিন পর থেকে বেকার মালতীর দৃষ্টি নন্দলালের দশাটার দিকে আকৃষ্ট হ'ল। গোপনে

গোপনে নন্দলালের ভাবখানা দেখে তার কেমন মায়া হতে লাগল। বস্তুত নিঃসন্তান মালতীর জীবনটা শিশু অজয় এবং নাবালক নন্দলালের পরিচর্যার মধ্যে ভাগাভাগি করা ছিল, এবং ব্যবসাপটু নন্দলালের নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে অপটুতা বা নাবালকত্ব তার মাতৃহৃদয়কে বিচলিত এবং প্রশ্রয়প্রবণ ক'রে তুলেছিল। যদিচ সূক্ষ্ম মানসিক তুলাদণ্ডে নন্দলালের চরিত্রগত অবনতি পরিমাপ ক'রে তার দুষ্কৃতির প্রতিবিধান করবার মত নৈতিক ঘৃণা অশিক্ষিতা স্নেহপ্রবণ মালতীর চিত্তে বিশেষ ক'রে জাগে নি, তবু আজ তার মন নন্দলালেরই অপরাধের লজ্জায় তার কাছে সহসা গিয়ে সোহাগের শাসন প্রয়োগ করতে স্বভাবতই দ্বিধা বোধ করছিল, তাতে সন্দেহ নেই। নন্দলালের 'বেয়াড়াপনায়' সে চটেছিল কম না। হাতে পেলে একচোট নন্দলালের ধুধ্‌ধুড়ি নেড়ে দেবার কল্পনায় মনে মনে যখন তখন সে কোমর বাঁধছিল তাও বটে; তবু নন্দর অপরাধ তার কাছে বেয়াড়াপনার বেশি আর কিছু নয়। অসচ্চরিত্র স্বামীর অধঃপতনজনিত পত্নীবিমুখতার সর্বনাশ কল্পনা ক'রে সমস্ত জগৎ এবং নিজের তাবৎ ভবিষ্যৎ ঘোর তমসাচ্ছন্ন শূন্যময় দেখে, নিজের প্রতি পরমকরুণায় অসহায় অশ্রুবর্ষণে অনন্যকর্মা হয়ে উপাধান সিক্ত করার কথা তার মনে হয় নি। বরং দু-চার দিন যাবার পর এই লুকোচুরির মধ্যে নন্দলালের এই গরু-চোরের মত গোপন সঞ্চরণের ছবি মালতীর স্বভাবহাস্যপ্রবণ চিত্তে যেন একটু কৌতুকের আমেজই লাগিয়েছিল। তার স্থূল দেহটিকে বস্ত্রাবরণে সম্বৃত ক'রে নিয়ে কারণে-অকারণে সে বৈঠকখানার পথে যাতায়াত করতে লাগল। অকস্মাৎ অসময়ে গিয়ে দরজা ঈষৎ ফাঁক ক'রে দিনে দশবার দেখে নিলে কোন স্পর্ধাবান ঘরে প্রবেশ করছে কি না! মালতীর মনের ভাবখানা এই—'আ মর মিন্‌সে! রকম দেখ না; পরের মেয়ে ঘরে এনে বদখেয়ালী করবার বেলা মনে থাকে না! ঝ্যাটা

মেরে সমান করলে তবে গায়ের ঝাল মেটে। না-নেয়ে না-খেয়ে আবার ঢঙ ক'রে সঙ সাজা হচ্ছে! মরুক গে; কথাটি কইছি নে আমি, হ্যাঁঃ! বয়ে গেছে আমার সাধাসাধি করতে—' ইত্যাদি।

আরও দু-চার দিন না যেতেই মালতীর সাধাসাধি না-করার ধরনটা কিছু উগ্র আকারেই তার ভৃত্যকুলের উপর বর্ষিত হ'তে শুরু হ'ল। মা-ঠাকরুণের তাড়া খেয়ে বেচারারা দুপুর রাত পর্যন্ত ওৎ পেতে সাবান গামছা তেল খাদ্য এবং অখাদ্য নিয়ে নন্দলালকে আক্রমণ করতে শুরু ক'রে দিলে। পায়ের উপরে পা দিয়ে ব'সে ব'সে মাইনে গেলবার জন্যে সত্যিই তো তাদের আর রাখা হয় নি! বাবুর নাওয়া-খাওয়া কি একটুও দেখতে পারে না তারা! কাজ ফাঁকি দেবার যম সব!

এর পর অনুতপ্ত নন্দলালের দাম্পত্য কলহের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত হয়ে এল এবং অত্যন্ত নিরীহ বালকের মত মালতীর শাসন এবং পরিচর্যায় সে আত্মসমর্পণ করলে। তাদের সংসারযাত্রা আবার কতকটা স্বাভাবিক হয়ে এল, কেবল অজয়কে মালতী আর পারতপক্ষে তার মেশোমশায়ের ত্রিসীমানায় যেতে দিলে না। নন্দ যে তাকে সুনজরে দেখবে না— মালতীর মনে এমনই একটা শঙ্কা, কেন জানি না, বদ্ধমূল হয়ে ছিল।

নন্দ অবশ্য জ্যোৎস্নার নাম আর মুখে আনলে না, এবং মালতীকে প্রসন্ন করতে খোকার জন্য নিত্য নূতন মনোহরণ খেলনা পোশাক প্রভৃতি এনে হাজির করতে লাগল।

মালতী বলে, এ আবার কি আদিখ্যেতা শুরু করলে?

নন্দ মালতীর দুর্বল মনকে স্পর্শ ক'রে বলে, ওই তো একটুখানি সোহাগ করবার সামগ্রী আছে—আর আমাদের কি আছে বল তো!

নন্দর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সজল নয়নে মালতী বলে, ষাট্ ষাট্!

৪৩

সত্যবানের মৃত্যুতে সীমার মন নৃশংস ভবিতব্যতার নিষ্ঠুরতার উপর অসহায় আক্রোশে আহত বৃশ্চিকের অন্ধ পুচ্ছের মত উদ্যত হয়ে ছিল। প্রতিহিংসার মূঢ় উত্তেজনায় তার চিত্ত পরিপূর্ণ। তবু নিখিলনাথের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে যখন আবার বনের মধ্যে প্রবেশ করল, তখন সেই প্রথম তার নিজেকে সত্যই নিরাশ্রয় নিঃসহায় ব'লে মনে হতে লাগল। তার দাদার আকর্ষণে সে যে-দলের মধ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের প্রত্যেকেই একে একে নিজের নিজের শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে নিজেদের কর্তব্য পালন ক'রে চ'লে গেল। মুমূর্ষু হ'লেও সত্যবানও তার আশ্রয়স্বরূপ ছিল। শুধু তার বুদ্ধি বা পরিচালনা-শক্তির জন্য নয়, সত্যবানের মৃতকল্প দেহটাকে রক্ষা ক'রে বেড়ানোর অচিন্ত্য বিপদের সঙ্গে যুদ্ধ করাও যেন তার অসহায় নির্জিত দেশের আত্মমর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখার সমান। এই কাজটি তার মনকে, তার অস্তিত্বকে অল্প আশ্রয় দেয় নি। আর আজ! সে সর্বহারার মত—সহায়হীন, সম্বলশূন্য, আশ্রয় মাত্র তার অন্তরের অনির্বাণ দেশপ্রীতি। তারও স্পষ্ট রূপ তার ভাই তার সঙ্গীদের মৃত্যুর রূপে ঢাকা প'ড়ে জাগিয়ে রেখেছে তার হৃদয়ে একটা জ্বালাময় জিঘাংসা মাত্র। তার না আছে রূপ, না আছে রস, না আছে সংযম।

নিখিলনাথকে নক্ষত্রখচিত স্তব্ধ আকাশের তলে যে একাকী পরিত্যাগ ক'রে চ'লে এসেছে, প্রদোষান্ধকারে স্নাত দিগন্তবিস্তৃত মহাপ্রান্তরের কূলে পরিত্যক্ত সেই একক নিখিলনাথের নিঃসঙ্গতা তার নিঃসহায় চিত্তে একটা অবোধ বেদনার মত ধীরে ধীরে তার অজ্ঞাতে তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ধরলে। নিখিলনাথের সতেজ উন্নত মহত্ত্বব্যঞ্জক মূর্তির অন্তরালে যে করুণামণ্ডিত ব্যাকুল অন্তরাত্মাকে তার বিদায়-মুহূর্তে সীমা অপমানের আঘাত ক'রে এসেছে, নিখিলনাথের সেই স্নেহ-

করুণ মুখশ্রী এই বনানীর নিবিড়, অন্ধকার পটে তার অনুতপ্ত মনের সামনে ভেসে উঠল। তার অকারণ রূঢ়তার জন্য অনুতপ্ত চিত্তে সে নিজেকে তিরস্কার করলে।

তবু তো তাকে থামলে চলবে না। পূর্ণ ক'রে তুলতে হবে তার দাদার অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাকে, সত্যবানের দুর্জয় সাধনাকে। কিন্তু কি সেই সাধনার প্রকৃতি তা সে জানে না, তার বাইরের বহিরূপ সে দেখেছে মাত্র এবং সেই রূপেই তার তরুণ হৃদয় প্রদীপ্ত। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে তীব্র, কিন্তু স্বাধীনতার রূপ তার কাছে সুস্পষ্ট নয়। তাই তার দাদা এবং সঙ্গীদের মৃত্যুতে যে প্রতিহিংসার আগুন তার চিত্তে বহ্নিমান হয়েছিল, দেশ এবং স্বাধীনতার প্রতীক স্বরূপ তাকেই সে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করলে এবং তার সহায়হীন অস্তিত্বের সমস্ত উপচীয়মান অবসাদকে দৃঢ়বলে দূর ক'রে দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল আপন কর্তব্য সাধনে। তার চিত্তে সংশয়মাত্র রইল না যে, সে দেশেরই মঙ্গলের জন্যে, দেশেরই মুক্তির জন্যে তার ক্ষুদ্র জীবন উৎসর্গ করতে চলেছে। প্রতিহিংসাই যে তাকে তার এই দারুণ পন্থায় অনুপ্রেরণা দান করেছে, নিজেকে এমন ক'রে বোঝবার ধৈর্য তার ছিল না।

অনাহারে অনিদ্রায় অসহায় নিরাশ্রয়ভাবে ঘুরে ঘুরে সীমা অবশেষে কলকাতায় নিজের কর্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। নিদারুণ দুর্দশার মধ্যে প'ড়ে কত বার সে নিখিলনাথের কথা ভেবেছে। সামান্য আহার-সংস্থানের জন্য যখন তাকে ছদ্মবেশে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়েছে, তখন কত বার ভেবেছে সে নিখিলনাথের কথা; কিন্তু যাকে সে নিজের উদ্ধত ধৃষ্টতায় উপহাস ক'রে চ'লে এসেছে, দীনা ভিখারিণীর মত তার কাছে যেতে সীমা বারংবার সঙ্কোচে বাধা পেয়েছে। তবু এই আদর্শের মধ্যেও নিজের অন্তরলোকে, কল্পনার মায়ালোকে, নিখিলনাথ তার নিকটে যে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

চার-পাঁচ মাস পরের কথা। এখন অনিন্দিতা দেবীর নারী-ভবনে তাকে সীমা ব'লে কেউ জানে না। তার চতুর্দিকে এই কয়মাসেই অনেকগুলি ছেলেমেয়ে একত্রিত হয়েছে। অধিকাংশই কলেজের ছাত্র ও ছাত্রী। সীমার পূর্বপরিচিত রঙ্গলালের সাহায্যে সে নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলেছে।

রঙ্গলাল ছিল মধ্যবিত্ত পরিবারের ডানপিটে ছেলে। পূর্বে সে তাদের দলের বাইরের সীমান্তপ্রদেশে পরিচিত ছিল মাত্র। তখনও সীমা এই দলে প্রবেশ করে নি। তার দাদার সঙ্গে রঙ্গলালের পরিচয়ের সূত্রে বরাহনগরে সে তাদের বাড়িতে যাতায়াত করত। তখন রঙ্গলালের কাজ ছিল সীমাকে বিপ্লব-পন্থায় অনুপ্রাণিত করতে চেষ্টা করা। তার নিজের মা ও বাবার অকস্মাৎ মৃত্যুতে একদিন তার চিত্ত পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং বহুদিন সীমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় নি।

সীমা তাকে অনেক কষ্টে আবিষ্কার করলে এবং রঙ্গলাল সীমার প্রধান কর্মকর্তা রূপে দেশের নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান থেকে বেছে বেছে উপযুক্ত কর্মী সংগ্রহে লেগে গেল।

সীমা এই সকল কাজের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে যুক্ত থাকত না। নানা স্থান পরিবর্তনের পর সম্প্রতি সে নিজে আস্তানা গড়েছিল দমদমের একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে। এই আস্তানাটি দলের মাত্র চার-পাঁচ জন ব্যতীত অন্য সকলের অপরিজ্ঞাত ও অনধিগম্য ছিল। অধিকাংশ তরুণ কর্মীর সঙ্গে সীমার কোন পরিচয় ছিল না এবং সীমা বা তার সঙ্গীদের কোন সন্ধান তাদের দেওয়া হ'ত না।

নারীভবন-সংক্রান্ত একটি বিদ্যালয়ে সে নিয়মিত অধ্যাপনা করত এবং সেখানে খাতায় নাম লিখিয়ে অনিন্দিতা দেবী 'অস্টেন্‌সিবল মীন্‌স্ অব্ লাইভ্‌লিহুডে'র ব্যবস্থা করতেন। একমাত্র এই নারীভবন-পরিচালনাতেই তার প্রকাশ্য হাত ছিল; এবং প্রকাশ্য এই নিরীহ

প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে তার মূল কর্মপ্রবাহের সে কোন যোগ রাখে নি।

এমনি ক'রে তাদের কাজের ক্ষেত্র যেমন প্রসারিত হতে লাগল, অর্থের প্রয়োজনও তেমনই বেড়ে চলল। এই অর্থের প্রয়োজনে একদা বহুকাল পরে সে নিজেকে অনিন্দিতা দেবীর ছদ্মবেশে সাজিয়ে নিখিলনাথের হাসপাতালের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হ'ল। দরোয়ান এবারে তাকে লম্বা একটা সেলাম জানিয়ে তৎক্ষণাৎ নিখিলনাথের কক্ষে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করলে। দরোয়ান যে তার ছদ্মদেশ তাকে চিনতে পেরেছে, এতে সীমার মনটা একটু অপ্রসন্ন হয়ে উঠল

৪৪

নিখিলনাথ যা শুনলে তাতে মোটামুটি কতকটা সন্তুষ্ট এবং অনেকখা পরিমাণে নিশ্চিন্ত হয়ে বললে, আমার সাধ্যমত অর্থসাহায্য করতে আমি নিশ্চয়ই ত্রুটি করব না। মানুষের কল্যাণসাধনের জন্য তোমার এই উদ্যম যাতে সফল হতে পারে, তা করতেও আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব।

সীমা মনের কথাটা চেপে রেখে বললে, মানুষের আপাত কল্যাণের জন্যে আমার মাথাব্যথা নেই ডাক্তারবাবু, আমি দেশের স্বাধীনতা চাই; তা বই আর কিছুতে আমার আবশ্যক নেই। নিখিলনাথ একটু হেসে বললে, বেশ তো, যাদের জন্য স্বাধীনতা কামনা করছ তারাও তো মানুষ। তাদের কল্যাণ সাধন করলেই মানুষের কল্যাণ হ'ল বই কি!

সীমার মনে নিখিলকে প্রতারণা ক'রে তার অর্থ নিতে বাধছিল সে একটু ঝাঁজ দিয়ে বললে, আপনি কি মনে করেন? কতকগুলো মানুষকে চিরদাসত্বের মধ্যে মরতে দিয়ে আরামের আফিঙ খাইয়ে রাখায় কোন পৌরুষ আছে কি? আমি অন্য উদ্দেশ্যে এসব করেছি

নিখিলনাথ তার মুখের দিকে অবাক জিজ্ঞাসু হয়ে চাইলে। চারিদিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি ফেলে সীমা বললে, এই ভিজে কাঠিগুলোর যেটার মধ্যে এতটুকু স্ফুলিঙ্গ জীবিত আছে তাকেই আমি জ্বালিয়ে তুলতে চাই।

তারপর নিখিলনাথের মুখের দিকে চেয়ে তার ভাবখানা দেখে একটু উত্তেজিত হয়ে বললে, আমি জানি, আমি যা করতে যাচ্ছি আপনি তা পছন্দ করবেন না, তবু এ ব্রত আমাকে সাধন করতেই হবে—নইলে আমার নিস্তার নেই। মৃতকল্প লোকগুলোকে নিশ্চিন্তে মরতে দিয়ে তাদের হিতসাধন করবার পরিহাস করা শুধু কাপুরুষতা নয়—নিষ্ঠুরতা।

নিখিলনাথ স্তম্ভিত হয়ে চুপ ক'রে রইল। সত্যবানের শেষ অনুরোধ তার কানে এসে বাজতে লাগল, ওকে তুই দাবানল থেকে বাঁচা। কিন্তু কী ক'রে! কি ক'রে এই আগুন নেবাবে? কোনও উপায় যেন সে ভেবে উঠতে পারে না। এইটুকু তার বুঝতে দেরি হয় নি যে, কোন সুকুমার প্রলোভনে সে সীমাকে ফেরাতে পারবে না। তবে সে কি করবে?

নিখিল থেমে থেমে বললে, আমি ভেবেছিলাম, তুমি তোমার ঐ নিদারুণ পন্থা ছেড়ে দিয়ে জনসেবা—

সেই জন্যেই তো এগুলোর দরকার। এই প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়া দেশে যে সব ছেলেমেয়ের মধ্যে এতটুকু প্রাণ বা মনুষ্যত্ব আছে, তাদের নিরাপদে আহ্বান ক'রে একত্র করবার আর কি উপায় আছে বলুন তো? এই সেবার আহ্বানেই সেই জ্যান্ত ছেলেমেয়েগুলোকে সহজেই এক জায়গায় পাব, তাই তো এত সব কাণ্ডকারখানা। নইলে দেশের মানুষগুলোর মধ্যে প্রাণের আগুন যখন নিবে এল, তখন সাড়ম্বরে জনহিত করবার মত শখ আমার নেই।

এতক্ষণ নিখিল মনে মনে যে আশা অন্ধকারের মধ্যে দূরতম নক্ষত্রের আলোকের মত পোষণ করেছিল, তাও যেন সহসা নিবে গেল। সে কি করবে? কেমন ক'রে সে সীমাকে বাঁচাবে, এমন ভয়ানক কাজে সে তাকে কেমন ক'রে সাহায্য করবে? তা সে কিছুতেই পারবে না। তবু সীমাকে তার নিঃসঙ্গ সর্বনাশের বেড়াজালের মধ্যে সে কেমন ক'রেই বা পরিত্যাগ করবে?

নিখিলের মুখ দেখে তার মনের কথাটা অনুভব ক'রে সীমা একটু লজ্জিত হ'ল। সেই সঙ্কোচটাকে জোর ক'রে তাড়াবার জন্যে সীমা হেসে বললে, আপনাকে সব স্পষ্ট ক'রে খুলে বললাম, আপনি এখন আপনার নীতিবিদ্যালয়ের উপদেশমালা বের করতে পারেন। ব'লে নিজের মনকে চাপা দেবার জন্য, যেন কি একটা রসিকতা করেছে এইভাবে জোর ক'রে হাসতে লাগল।

নিখিল প্রথমে তাকে সত্যবানের কথা ব'লে নিরস্ত করবার চেষ্টা করলে। বললে, সত্যদা অনেক মিনতি ক'রে তোমাকে এ পথ থেকে নিবৃত্ত হতে ব'লে গেছেন। সেই মৃত মহাত্মাকে কি তোমার অসম্মান করা উচিত?

মৃত মহাত্মার জীবন্ত অবস্থায় তাঁর কাছে যে দীক্ষা পেয়েছি, তার চেয়ে বড় আমার কাছে কিছু নেই। মৃত্যুর দরজা থেকে তিনি যা ব'লে গেছেন, তাতে জীবিতের রসদ জোগানো যাবে না।

তিনি ব'লে গেছেন 'প্রাণ দিলে প্রাণ পাওয়া যায়, প্রাণ নিলে নয়'—এটা জীবিতের জন্যেই, মৃতের জন্যে বলেন নি।

দেখুন, মানুষ হত্যা করার শখ আমার নেই। আজ কোনো একটি ইষ্টমন্ত্রে এই হীনতা থেকে দেশকে মুক্তি দিন, কাল দেখবেন তুলসীর মালা হাতে ক'রে সাত্ত্বিক হয়েছি। এ সবই আপনি আমার চেয়েও

ভাল ক'রে বোঝেন; তবে কেন একজন মহৎ লোকের মৃত্যুসময়ের বিপর্যস্ত মনের কথা উল্লেখ ক'রে তাঁকে ছোট করছেন?

নিখিল দেখলে যে, সত্যবানের কথা ব'লে তাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করা বৃথা। সত্যবানের অনেক দিনের শিক্ষা সীমার অন্তরে গভীরভাবে প্রবেশ করেছে; সত্যবানের মৃত্যুকালীন একদিনের উক্তি তাকে উৎপাটন করবে তার সম্ভাবনা কম। তখন সে তর্ক শুরু করলে; বললে, এমনি ক'রে একটা দুটো পাঁচটা খুন ক'রে দেশকে মুক্তি দান করবে, এর চেয়ে বাতুলের কথা কিছু হতে পারে না। ওতে শুধু দেশের লোককেই বিপর্যস্ত ক'রে তাদের দুঃখের উপরে দুর্দশার কারণ ঘটানো ছাড়া আর কোন উপকার হবে না।

একটা দেশের উপর লড়াই চললে এর চেয়ে অনেক দুঃখদুর্দশা সে দেশের লোককে ভোগ করতে হয়। সুতরাং আপাত-দুঃখটাকেই বড় ক'রে দেখবার কোন আবশ্যক নেই। ভয়েতে সব কিছু মেনে নেবার নিদারুণ হীনতা থেকে তাদের নির্ভয়ে মাথা তুলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোজা হয়ে দাঁড়াবার তেজ দিতে চাই আমরা।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি একটা নৈতিক বল। সেটাকে একটা পশুশক্তির মত ক'রে জাগাতে গেলে সেই নৈতিক বলেরই মহামৃত্যু ঘটাবে। কুকুরকে মারলে সে তেড়ে আসে কামড়াতে। আরও জোরে মারতে পারলে সে পালায়। কারণ, পশুশক্তি সে-ক্ষেত্রে যে মারে তার বেশি; কারণ, পশুত্বের উপরের যে কথা, যা দিয়ে সে মার খেয়েও নিজেকে অন্যায়ের কাছে হার মানতে দেবে না, কুকুরের তা নেই। তার শক্তির সীমা ওই পর্যন্ত। কিন্তু নৈতিক বলের তো কোন সীমা নেই, তাই তাকে ক্রুশে বিদ্ধ ক'রে মারলেও সে জয়লাভ করে; তাকে মশাল ক'রে

পুড়িয়ে মারলেও সে মরে না, হাতীর পায়ের তলায় ফেললেও তাকে হত্যা করা যায় না। নিতান্ত উত্তেজিত না হয়ে এই কথাটা যদি ভেবে দেখ যে, একটা মৃতকল্প ঘোড়াকে চাবুক মারলেই তাকে দিয়ে কাজ পাওয়া যায় না, তা হ'লে এই কোটি কোটি দুর্বল, নিরন্ন মূঢ় ভাইবোনদের সম্বন্ধে তোমার করুণা হবে। সত্যদা বলেছিলেন যে, হাজার বছরের চাপে যার শিরদাঁড়া নুয়ে পড়েছে, তার মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি আসবে কোথেকে? সেই বাঁকা শিরদাঁড়াটার রীতিমত চিকিৎসা চাই আগে, অ নইলে সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। ক্রোধেরর বিলাসে বশবর্তী হয়ে এ কথা যদি ভুলে ভুলে যাই, তবে ক্রোধের বিলাসে নরহত্যার পাপেই লিপ্ত হতে হবে, আর কিছু হবে না।

সীমার মনের মধ্যে প্রতিহিংসার আগুনে নিখিলনাথের কথাগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সে উত্তেজিত হয়ে নিখিলনাথকে 'বিলাতী মোহগ্রস্ত' ব'লে খোঁচা দেয়। নিখিলনাথ চুপ ক'রে শোনে। ও-কথার কোন জবাব দেয় না; তবু সীমার অশ্রদ্ধায় তার মন ব্যথায় ভ'রে উঠে। সীমা ক্রুদ্ধ মনে ভাবে, এমনি ক'রে ভাবতে গিয়ে চিরকাল আমরা কাপুরুষ হয়ে রইলাম। স্বাধীনতার মুখ আমরা কোন কালেই দেখতে পাব না! চিরকালটা যে তার-জীবিতকালেই মাত্র সীমাবদ্ধ নয়, তা তার মন মানতে চায় না। ভাবতে চায় যে এমন বিপ্লব উপস্থিত করবে যে, যার ঝড়ে দেশের সমস্ত দুঃখ দৈন্ত হীনতা একদিনে উড়ে যাবে এবং নিজ হাতে নিজেদের সুখসম্পদ স্বাধীনতার রাজপ্রাসাদ আলাদিনের প্রদীপের মত এনে প্রতিষ্ঠিত করবে। তার উত্তেজিত মনের এই কল্পনাকে সে মনে মনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে এক প্রকার তৃপ্তি পায়, আত্মপ্রসাদ লাভ করে। উত্তেজনার বিলাসে তার মনের পক্ষে

অপেক্ষাকৃত জটিল দুরূহ শান্ত বিচারশীল পন্থাকে স্থির হয়ে চিন্তা করবার ধৈর্য তার কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। নিখিলের শান্ত ধীরতাকে সে কাপুরুষতা ব'লে মনে মনে ঘৃণা করতে চেষ্টা করে। নিখিলনাথের সমস্ত শান্ত অনুপক্রান্ত ধারাবাহিক জীবনযাত্রায় দেশের মঙ্গলসাধনের চেষ্টা তার উত্তেজিত চিত্তে যেন প্রহসন ব'লে মনে হয়। সীমা চায় সে ক্ষেত্র থেকে তাকে সবলে উৎপাটন ক'রে দুর্মদ মৃত্যুপথযাত্রার দুর্ধর্ষ কর্মক্ষেত্রের মধ্যে মুক্তি দিতে। নিখিলনাথকে সে ফিরে পেতে চায় তার কর্মপ্রেরণার সঙ্গীরূপে; বুদ্ধির উপর যে আলোকসম্পাত করবে, হৃদয়ে যে শক্তি সঞ্চার করবে, নিজের প্রাণের অমিত প্রাচুর্যে দুর্লঙ্ঘ্য বিপত্তিকে যে ধূলিসাৎ ক'রে দেবে। নিখিলনাথের শান্ত ও ধীরতাকে সে উদাসীনতা ব'লে মনে ক'রে তীব্র আঘাতে তাকে চেতিয়ে তুলতে চায়; কিন্তু তাতে দিনের পর দিন অশান্তি তার বেড়ে চলে।

একলা ব'সে ব'সে নিখিলের প্রতি নিজের উত্তপ্ত চিত্তের দুর্বাক্যের কথা স্মরণ ক'রে সে লজ্জা পায়; নিখিলের আত্মসমাহিত গভীরতার কাছে নিজেকে অপরিণত, প্রগল্‌ভ, ক্ষুদ্র ব'লে মনে হয়।

৪৫

হাসপাতালে ফিরে গিয়ে অসুস্থতা সত্ত্বেও কমল নিজেকে কাজ এবং পড়ার মধ্যে একেবারে ডুবিয়ে দিলে। চিন্তার ভার আর যেন সে বইতে পারে না। কোন মতে নিজের অস্তিত্বের অনুভূতিকে মন থেকে নিশ্চিহ্ন ক'রে মুছে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হবে—এই যেন তার পণ। একলা নিজের দুঃসহ সমস্যার সমাধান-চেষ্টা তার দুর্বল মস্তিষ্কের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। মনে মনে চাইছে সে সহৃদয় নিখিলের শান্ত-

প্রভাব—যে উপযুক্ত পরামর্শ দিয়ে, সাহায্য দিয়ে, সহানুভূতি দিয়ে তাকে চালিয়ে নিয়ে যাবে।

কিন্তু নিখিলনাথের সাক্ষাৎকার লাভ করা এক দুরূহ ব্যাপার হয়ে উঠেছে আজকাল। কখন যে সে বাড়ি থাকে তা বুঝে ওঠা দুঃসাধ্য। হাসপাতালের কাজটুকু ছাড়া অধিকাংশ সময়ই সে বাড়ি থাকে না। বারংবার দরোয়ান পাঠিয়েও অবসর সময়ে নিখিলের কামরায় তার সন্ধান পাওয়া গেল না। হাসপাতালের কাজে অবশ্য সে কোনদিনই অনুপস্থিত থাকে নি। কিন্তু তখন এক মুহূর্তও তাকে একান্তে পাওয়া দুষ্কর, যাতে অন্যের অগোচরে কমল তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারে। ফিরবার পর প্রথম দিনই তার সঙ্গে কমলের সাক্ষাৎ হয়েছিল বটে, কিন্তু সে কতক্ষণই বা!

ও কি! আপনি আজই ফিরলেন যে? ভাল আছেন তো? ভাল যে সে নেই—এমন স্পষ্ট ক'রে তার মুখের চেহারায় তার ছাপ কোন দিনই পড়ে নি। অন্য সময় হ'লে এই পীড়িত ক্লিষ্ট চেহারা নিখিলনাথের দৃষ্টি এড়াত না। কিন্তু আজ তার নিজের চিত্ত ছিল অন্য চিন্তায় আচ্ছন্ন, উদ্‌ভ্রান্ত। এই প্রশ্নটুকু মাত্র ক'রে তার উত্তরের জন্যও সে আজ বিশেষ আগ্রহ করলে না। কমলের পীড়িত ক্ষত চিত্তে যে তা বেদনার সৃষ্টি করে নি তা নয়; কিন্তু তার বড় আবশ্যকের প্রয়োজনে সে বেদনার অভিমান তার মনের মধ্যে ঘনিয়ে উঠবার অবকাশ পেল না।

সন্ধ্যার সময় মাথার যন্ত্রণা অসহ্য হওয়ায় কমলা দরোয়ানের হাতে একটা চিঠি দিয়ে নিখিলনাথের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। দরোয়ান ফিরে এসে সংবাদ দিলে যে, 'সাব' ঘরে নেই। হতাশ হয়ে সে শয্যা নিলে।

অনেক রাত্রে ফিরে নিখিল যখন কমলার চিঠিখানা পেল, তখন

সকালে হাসপাতালে তার অত্যন্ত ক্লিষ্ট যে মুখখানা তার মনোযোগ জাগিয়ে তুলতে পারে নি, সেটা মনে প'ড়ে তাব নিজের এই অন্য-মনস্কতার জন্য মনে মনে লজ্জা অনুভব করলে এবং তখনি জ্যোৎস্না দেবীর তত্ত্ব করবার জন্যে নার্স-কোয়ার্টার্সে চ'লে গেল।

নিখিলনাথ গিয়ে যা দেখলে, তাতে এতক্ষণ জ্যোৎস্নার কোন সংবাদ নিতে পারে নি ব'লে নিজের উপর সে একটু বিরক্তই হ'ল। কমলের মাথার যন্ত্রণা বেড়েছিল খুবই, তার সঙ্গে জ্বরের ধমকে সে প্রলাপ ব'কে চলেছিল। নিখিল গিয়ে দেখলে যে, তার যাওয়ার পূর্বে দুজন জুনিয়র ডাক্তার সেখানে গিয়েছে এবং মোটামুটি তার শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেছে। নিখিল গিয়ে রক্ত পরীক্ষা প্রভৃতি অন্যান্য ব্যবস্থা ক'রে তার কামরায় ফিরে গেল। অল্প কিছু আহার এবং বিশ্রাম ক'রে নিয়ে শোবার আগে সে আর একবার কমলকে দেখতে এবং রাত্রের মত শেষ ব্যবস্থা দিয়ে আসবার জন্যে নার্স-কোয়ার্টার্সে ফিরে গেল। জুনিয়ররা তখন বিদায় নিয়েছে।

কমলার ঘর আবৃত ল্যাম্পের উদ্বৃত্ত আলোকে অন্ধকারপ্রায়। কমলা দ্রুত ও অস্ফুট উচ্চারণে প্রলাপ বকছে মাঝে মাঝে। খানিকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ এক সময় তার মনে হ'ল যে, জ্যোৎস্নার প্রলাপের মধ্যে থেকে দু-একটা কথা যেন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। জ্যোৎস্নার মনে যে কোন গুরুতর ক্লেশের কারণ বিদ্যমান— নিখিলের এ সন্দেহ পূর্বেই হয়েছিল। তবু কৌতূহল প্রকাশ ক'রে সে জ্যোৎস্নার আরও দুঃখের কারণ হবে ভেবে চুপ ক'রে ছিল। আজ রোগিণীর পাশে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে এই অন্ধ কর্মশূন্য অন্ধকারে তার নিজের স্বভাববিরুদ্ধ কৌতূহলে সে অল্প একটু কাছে স'রে এসে দাঁড়াল। তারপর স্টেথস্কোপটা নিয়ে বুক পরীক্ষার জন্য সে নীচু হয়ে শুনলে— দু-একটা কথা সে যেন স্পষ্টই শুনতে পেলে—কিন্তু তার একটার সঙ্গে

অন্যটার কোন যোগাযোগ করতে পারলে না। বক্ষ-পরীক্ষা কিছু আর বেশিক্ষণ চলে না। বিন্দু ব'সে ছিল বরফের ব্যাগ মাথায় দিয়ে। নিখিল একটু গম্ভীর মুখে তাকে বললে, যাও, দুটো হট-ওয়াটার-ব্যাগ তৈরি ক'রে আন।

বিন্দু নিখিলের মুখ দেখে একটু ভয় পেল, বললে, সরোজিনীকে ডেকে দিয়ে যাচ্ছি।

নিখিল বললে, না, তার দরকার নেই। সরোজিনীকে দু ঘণ্টা পরে ডেকো। আর দু ঘণ্টা ক'রে এক-এক জন থেকো। যাও, আমি বসছি একটু।

বিন্দু ব্যাগ আনতে চ'লে গেল। নিখিল শুনতে চেষ্টা করতে লাগল। প্রলাপের কথা প্রায় শোনা যায় না। একবার যেন মনে হ'ল শুনতে পেল, ভোলাদা, খোকাকে ধর তো। আর একবার, উঃ, কত হাতী!—এই রকম দু-একটা কথা পরস্পর নিতান্ত সঙ্গতিশূন্য। বিন্দু এলে পায়ে গরম এবং মাথায় ঠাণ্ডা দিতে উপদেশ দিয়ে এক রকম হতাশ হয়েই সে ফিরে এল।

চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই কমলের জ্বর ছেড়ে গেল। আরও দু-তিন দিন পরে নিখিলনাথ কোন সুযোগে কমলকে জিজ্ঞেস করলে, ভোলাদা ব'লে আপনার কোন আত্মীয় আছেন?

কমলা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, কেন?

নিখিল বললে, প্রলাপে আপনি তাঁর নাম করেছিলেন। মাপ করবেন আমার কৌতূহলের জন্যে।

কমলা সঙ্কুচিত হয়ে বললে, না না, আপনি মাপ চাইবেন না। এবং প্রায় মরিয়া হয়ে ব'লে ফেললে, আপনাকে যে আমার অনেক কথা বলবার আছে। দয়া ক'রে যদি একটু সময় করতে পারেন।...এখানে তো বলা হবে না।

যদিও তার অনুমান করবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না, তবু কেন জানি না, এই অনুরোধে নিখিল যেন বিস্ময় অনুভব করলে না। সে যেন কোন দিন এমনি একটা অনুরোধের জন্য মনে মনে প্রস্তুতই ছিল। বললে, আচ্ছা, ভাল হয়ে উঠুন। সে বন্দোবস্ত করব। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর আপনি দেন নি।

কমলা বললে, কি জানি, আমার কিছু মনে পড়ে না। আর কিছু বলি নি? তার মনে মনে ভয় হ'ল, নন্দলালের কথার কিছু উল্লেখ করেছে হয়তো বা, এই মনে ক'রে।

বলেছিলেন—ভোলাদা, খোকাকে ধর। আর একবার বলেছিলেন, উঃ, কত হাতী!

কমল অকস্মাৎ ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললে! নিখিল অপ্রস্তুত হয়ে বললে, ছিঃ, কাঁদবেন না। না জেনে আপনাকে হয়তো দুঃখ দিয়েছি—

না না, তা নয়; আমি যে কিছুতে মনে আনতে পারছি নে। অথচ কিছুই তো ভুলি নি আমি।—ব'লে কান্না থামাবার চেষ্টায় ক্রমাগত সে চোখ মুছতে লাগল।

এই কথায় নিখিল একটু অবাক হ'ল। কথাগুলো যেন ধাঁধার মত। জ্যোৎস্নার জীবনে কোন দুঃখের ইতিহাস যে তার সমস্ত অস্তিত্বের মাঝখানে ছায়াপাত ক'রে, তাকে জীবনের স্বাভাবিক আনন্দের রসাস্বাদনে বঞ্চিত ক'রে রেখেছে, এমন সন্দেহ নিখিলের মনে পূর্বে অনেকবারই হয়েছে; এবং তারই জন্য কমলের প্রতি স্বাভাবিক করুণায় তাকে নানা ভাবে সাহায্য ক'রে এসেছে। কিন্তু আজকের কথায় তার মনটা যেন একটা গভীর রহস্যময় সুগভীর বেদনার ইতিহাসের আভাস পেয়ে মনে মনে স্তব্ধ হয়ে রইল।

সেদিন আর কোন কথা হবার অবসর হ'ল না।

পরদিন কমল নিজের দুঃখের ইতিহাস একটু একটু ক'রে নিখিলনাথকে ব'লে গেল। কাল সমস্ত রাত সে নিজের সঙ্কোচটুকু দূর করবার জন্য মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করেছে। নইলে তার হতাশার শেষ আশার দীপটুকুও নিবে যায় যে! তবু প্রথম প্রথম তার মনে সঙ্কোচের অন্ত ছিল না। কিনিন্তু খিলনাথের কৌতূহলবিহীন সম্ভ্রমপূর্ণ সহানুভূতির সহৃদয়তায় ধীরে ধীরে তার সঙ্কোচের বাধা অন্তর্হিত হয়ে তার মনে সে এমন একটা আশাপূর্ণ স্বচ্ছন্দ লঘুতা অনুভব করতে লাগল যে, নন্দলালের চরম দুর্ব্যবহারের কাহিনী বলাও তার পক্ষে সহজ হয়ে এল। তার মনের গ্লানি যেন অপসারিত হয়ে গেল এবং বিস্ময়ের সঙ্গে সে নিজেকে অনেকখানি সুস্থ বোধ করতে লাগল। অজয়ের প্রতি মালতীর অকৃত্রিম মাতৃস্নেহের কথা বলতে বলতে চোখ তার শুষ্ক রইল না; এবং এই অশ্রুজলে অভিষিক্ত পরম বিস্ময়কর করুণ কাহিনী শুনতে শুনতে নিখিলনাথ ক্ষণকালের জন্য আত্মবিস্মৃত হয়ে কমলের একখানি হাত ধ'রে বললে, মানুষের সাধ্য কতটুকুই বা। তোমার দুঃখ মোচন করবার ক্ষমতা আমার হবে কি না জানি না, তবু আমাকে তোমার নিজের বড় ভাই ব'লে জেনো। তোমার স্বামীর অনুসন্ধানে আমার চেষ্টার ত্রুটি হবে না। নন্দলাল কোন কারণে তোমার মনের শান্তি যাতে নষ্ট না করতে পারে, তার ব্যবস্থা আমি শীঘ্রই করব। ব'লে সে উঠে দাঁড়াল। নিখিলের মা, প্রয়াগে মাঘ মাসে, একবার কল্পবাস করেছিলেন, নিখিল তখন ছেলেমানুষ, পাঠশালায় পড়ে। মার কাছে কুম্ভমেলায় স্নানের ভিড়ের যে গল্প শুনেছিল, কমলার গল্প শুনতে শুনতে তার সেই কথা মনে পড়ল।

কমলের মুখে অনেক কাল পরে আজ আনন্দিত স্বচ্ছন্দ মনের স্বস্তিপূর্ণ হাসি ফুটে উঠল। এখনি যেন তার দুঃখের অনেকখানি অবসান ঘটেছে এমনি একটা শান্তির আভাস তার মনে অবতীর্ণ হ'ল এবং

কৃতজ্ঞচিত্তে অবনত হয়ে সে নিখিলের পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে।

ছি ছি, ও কি! ব'লে নিখিল এক পা পিছিয়ে গেল। মনটা তার স্নেহে ও করুণায় পূর্ণ হয়ে উঠল।

নিখিলনাথ চিন্তাকুল চিত্তে তার খাসকামরায় ফিরে গেল। কমলের অত্যাশ্চর্য কাহিনী তাকে বিস্মিত করেছিল সত্য, কিন্তু তার মনের যে চিন্তা তার চিত্তকে সম্প্রতি উন্মনা ক'রে রেখেছিল, এই ব্যাপারের সঙ্গে তার কোন যোগ ছিল না। নন্দলালের দুশ্চিন্তা থেকে কমলকে কোন মতে নিরাপদ করতে পারলে আপাতত যেন কমলের প্রতি তার কর্তব্য সমাধা হয়।

অনেক চিন্তার পর, সে কমলকে অনিন্দিতা দেবীর নারী-ভবনে নিয়ে রেখে আসতে মনস্থ করলে। পরীক্ষার আর অল্পদিনই বাকি ছিল। এই সময়টুকু কোনমতে অতিক্রম করতে পারলে কমলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করবার পথ সুগম হয়ে আসবে।

কমলকে অনিন্দিতা দেবীর নারী-ভবনে রাখার চিন্তার মধ্যে তার বোধ হয় কিছু উদ্দেশ্য ছিল। সীমা তার কথায় হিংসার পথ থেকে ফিরবে না। বরং ক্রমে তার মনে এই ধারণাই একটু বদ্ধমূল হচ্ছিল যে, তার আগ্রহ সীমাকে যেন ক্রমেই কঠিন ক'রে তুলছে। নরনারীর আকর্ষণজনিত দুর্বলতা সীমার দীপ্ত মনের পক্ষে কি হেয়? তার অন্য নাম কি তার কাছে দেশদ্রোহিতা? নিখিলনাথের প্রেমার্ত চিত্তের উৎকণ্ঠা যেন তার কাছে উপহাসের সামগ্রী। তবে সে কি করবে? কেমন ক'রে সীমাকে আগুনের মোহ থেকে বাঁচাবে? আজ যেন সে নূতন ক'রে একটা পথের সন্ধান পেল। জ্যোৎস্নার শান্ত স্থির বুদ্ধির আকর্ষণে সীমা যদি ক্রমে ধরা দেয়। যদি জ্যোৎস্নাকে সমস্ত যুক্তিতর্কে সুসজ্জিত ক'রে ধীরে ধীরে সীমার উত্তপ্ত চিত্তকে শান্ত ক'রে আনতে সমর্থ হয়, তা হ'লে সত্যবানের আদেশ প্রতিপালন করা তার পক্ষে

একান্ত অসম্ভব নাও হতে পারে। এমন কি— কিন্তু হায়, অতটা দুরাশা সে করবে কোন্ দুঃসাহসে?

পরদিন নিখিল কমলাকে সীমার যথাসম্ভব ইতিহাস বললে। বললে, জ্যোৎস্না, তোমার দুঃখ অপরিসীম, এমন কি হয়তো দুরপনেয়। কিন্তু তার ভিতর তোমার প্রেমের পরিপূর্ণ উৎস গভীর বিরহের মধ্যেও তোমার হারানো স্বামীর অনুভূতিতে তোমাকে সঞ্জীবিত রেখেছে। কিন্তু যে নারী তার নারীত্বের সমস্ত মাধুর্য, সমস্ত সৃষ্টিশক্তির কল্যাণকে অস্বীকার ক'রে তার মহিমাকে ধ্বংসের আগুনে ছাই ক'রে পুড়িয়ে ফেলতে চলেছে, তাকে উল্কার বহ্নিলীলার মত ব্যর্থ হয়ে যাবার সর্বনাশ থেকে তুমি বাঁচাও।

কথা শুনতে শুনতে কমলের বুকের ভিতর কেঁপে কেঁপে ওঠে। ভাবে, অপদার্থ আমি, আমার উপর কি এই বিশ্বাস, এই নির্ভর সাজে? নিখিলনাথের এমন অস্থিরতা সে কোন দিন দেখে নি। ভাবে, এ কি শুধু তাঁর গুরুর আদেশ প্রতিপালনের আগ্রহ। মাথা নীচু ক'রে ধীরে ধীরে বললে, আমাকে আপনি চালিয়ে নেবেন। জগতে যদি এতটুকু কাজে আসতে পারি, তবু আমার বেঁচে থাকার কতকটা সান্ত্বনা পাই। ব'লে সে চুপ ক'রে ভাবে, সে কেমন মেয়ে না জানি, ওঁর মত লোককেও যে এমন ক'রে বিচলিত করতে পেরেছে!

নিখিল কমলকে নিয়ে নারী-ভবনে রেখে এল।

সীমার শ্যামশ্রীর সেই স্বতোদীপ্ত উজ্জ্বলতা যেন ম্লান হয়েছে। তার মুখে তার অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যের মধ্যে ঘনায়মান করাল মেঘের ছায়া। তার চোখের বিদ্যুদ্দীপ্তি ঘনপক্ষজালের অন্তরালে যেন সংশয়াচ্ছন্ন দুরাশায় রহস্যময়। নিখিলনাথ তার এ রূপ কখনও দেখে নি। ইস্পাতের তরবারির মত সীমার যে রূপ তার মুগ্ধ চিত্তের উপর উদ্যত ছিল, আজ তার সেই বিদ্যুৎহাস্য-মুখরিত শ্লেষতীক্ষ্ণ দ্যুতি কিসের

ছায়াপাতে যেন দীপ্তিহীন! অকারণ বেদনায় নিখিলের চিত্ত পীড়িত হতে লাগল। তবু সে সীমাকে তার বিপদের, তার দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পেল না।

নিজেকে সম্পূর্ণ আত্মস্থ ক'রে নিতে সীমার বিলম্ব হ'ল না। কমলাকে নমস্কার ক'রে, নিখিলকে একটু বসতে ব'লে, সে তাকে মেয়েদের সঙ্গে পরিচিত করতে ভিতরে নিয়ে গেল। যখন সে ফিরে এল, তখন সেই ছায়া তার মুখ থেকে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়েছে। নিখিল অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চাইলে। সীমা সেই চাহনিটুকু অগ্রাহ্য ক'রে বললে, এখন পরিচয় দিন।

সীমাকে কমলের ইতিহাস সংক্ষেপে ব'লে নিখিলনাথ চ'লে আসবার সময় সীমাকে জিজ্ঞেস করলে, অর্থের তার আবশ্যক আছে কি না!

মুহূর্তকাল চুপ ক'রে থেকে সীমা বললে, দেখুন, অর্থের প্রয়োজন আমার অনেক। কিন্তু আপনাকে বঞ্চনা ক'রে অর্থ নিতে আমি পারব না। দেশের প্রয়োজনে অর্থবান্‌কে বঞ্চিত ক'রে তাদের আহৃত অর্থ গ্রহণকে যে উচিত মনে করি তা তো আপনাকে বলেছি, তবু বঞ্চনা ক'রে অর্থ সংগ্রহ করতে আমারও মনে বাধে এখনও। তা ছাড়া অকারণে এর মধ্যে আপনাকে আমি জড়াতে চাই নে। আমার সেদিনকার ধৃষ্টতার জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনার দয়ার কথা আমি ভুলব না কিন্তু আপনার উপদেশে চলবার রাস্তা আমার খোলা নেই।

সীমার শেষ কথাগুলিতে আশার ক্ষীণ আলোক নিখিলের মনের মধ্যে একটুখানি পথের সন্ধান এনে দিলে যেন। আগ্রহের সুরে একটু অনুনয় মিশিয়ে সে বললে, খোলা নেই? কেন নেই?

সে কথা বলবার যদি কোন দিন অবসর পাই তো বলব। আজ আমার সে কথা বলবার সময় আসে নি। এ নিয়ে আপনার সঙ্গে তর্ক

করবার ক্ষমতা আমার নেই। আপনার দেখানো পথ কোন মতেই আমার পথ হবার জো নেই। এইটুকু মাত্র আজ আপনাকে জানাতে পারি। ব'লে কথার মোড় ফিরিয়ে নিয়ে যেন একটু অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বললে, জ্যোৎস্না দেবীর সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এখানে তার কোন অসুবিধা হবে না।

সীমার এই কথাগুলির মধ্যে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত যে সুরটি তার কানে পৌঁছল, তাতে তার মনটা যেন কতকটা আশা এবং ঔৎসুক্যে চকিত হয়ে প্রস্তুত হয়ে বসল। মুখে বললে, ওর জন্যে আমি চিন্তিত হই নি; আমি ভাবছি যে, তোমার কাজের কোন অসুবিধা হয় কি না! অর্থাৎ—

এই 'অর্থাৎ'টা অবশ্য নিতান্তই অনাবশ্যক। সীমার দিকে চেয়ে নিখিল কোন বিশেষ ভাবের বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করতে পারলে না।

সীমা বললে, আমার আর এতে সুবিধে অসুবিধে কি? বরং বোর্ডিঙের একজন মেম্বার বাড়লে লাভই আমাদের। তবে বোর্ডিঙে যাদের থাকা অভ্যাস নেই, তাদের প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে ঠেকেই; তা ছাড়া ওর তো আবার পরীক্ষা কাছে।

নিখিল ভাবলে, ওর মন যেন বিজলী বাতির নিষ্কম্প দীপশিখার মত—কিছুতেই বিচলিত হয় না।

অত্যন্ত চিন্তাকুল হয়ে নিখিল ফিরে গেল। সীমার মুখে যে একটা আসন্ন বিপৎপাতের ছায়া দেখেছিল, তার কথা সে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। সীমার কথাগুলি অসহায় আবেগে তার মনকে উতলা করতে লাগল।

৪৩

হাসপাতালে ফিরে সে এমন একটা ব্যাপারের মধ্যে প'ড়ে গেল যে, কিছুক্ষণ তার অন্য চিন্তার কোন অবসরই রইল না।

একটি মেয়েকে আগুনে-পোড়া অর্ধদগ্ধ অবস্থায় তাদের হাসপাতালে এনেছিল। লোকজন আত্মীয়-অনাত্মীয় পুলিস-ডাক্তারের ভিড়ে হাসপাতালে আর স্থান নেই।

নিখিল অগ্রসর হতেই ইন্‌স্পেক্টর তাকে খুব পরিচিতের মত বললে, আরে, নিখিল যে! আরে, তুমিই ডক্টর রয়? তারপর এখানে কত দিন? আরে, কি, চিনতে পারছ না আমায়? 'বুলডগ'কে ভুলেই গেলে যে!

নিখিল সত্যিই প্রথমটা চিনতে পারে নি, সে তারই এক সহপাঠী ভুলু দত্ত। তা ছাড়া মৃতকল্প মেয়েটিকে সামনে রেখে রহস্যালাপ করবার মত মন তখন তার ছিল না।

ও, ভুলু! সত্যি ভাই, তোমার ও পোশাকে এতদিন পরে তোমায় চিনতে পারি নি। একটু ব'স ভাই, মেয়েটিকে একটু দেখে আসি।

ভুলু দত্ত একটু তাচ্ছিল্য ভরে হেসে বললে, হ্যাঁ, ও আবার দেখবে কি? ও তো হামেশাই হচ্ছে। একটা ফ্যাশান বই তো নয়। তুমি ঠিক তেমনিটিই আছ দেখছি।

নিখিলনাথ আর তার রসিকতার জন্য অপেক্ষা না ক'রে তাড়াতাড়ি মেয়েটির কাছে গেল। বিশেষ আর কিছু করবার ছিল না।

মেয়েটির বাপ দাঁড়িয়ে অশ্রুবর্ষণ করছিল। মেয়েটির বয়স অল্প— কুমারী। তার মৃত্যুর কারণ প্রকাশ্য নয় দেখে নিখিল সকলকে বাইরে যেতে আদেশ ক'রে বাপকে নিয়ে পুলিসের কাছে ফিরে গেল।

রিপোর্ট নেওয়া হ'লে ভুলু দত্ত উঠে নিখিলকে বললে, এস হে একদিন আমার ওখানে, তোমার বউদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

অবাক হচ্ছ আমাকে দেখে, ভাবছ, বুলডগ আবার পুলিস ইন্‌স্পেক্টর হ'ল! তা ঠিকই হয়েছে, বুলডগ নাম দিয়েছিলে—বুলডগেরই কাজ করছি। ব'লে নিজের রসিকতায় নিজেই উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসতে লাগল। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে বললে, যেও একদিন নিশ্চয়—সব সুখ-দুঃখের কথা হবে। ব'লে সে সবলে নিখিলের পিঠে একটা চাপড় মেরে বেরিয়ে গেল।

নিখিলের মনটা ভুলু দত্তের উপর প্রথমটা যতটা বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, শেষটা তা আর রইল না, একটু ক্রোর্স্ এই যা, লোকটাকে খারাপ ব'লে মনে হ'ল না। তা বুলডগ বরাবরই অমনই। এক কালে সে তো বিপ্লবী দলে ভিড়েছিল ওদেরই সঙ্গে, তারপর নিখিল জেলে যাবার পর আর তার খোঁজখবর রাখে নি।

ইতিমধ্যে পুলিস-সংস্কারের সুযোগে কবে যে সে পরীক্ষা দিয়ে পুলিসের কাজে বহাল হয়েছে, সে সংবাদ তার জানা ছিল না।

* * *

হপ্তাখানেক পরে বিকেলবেলার দিকে সেদিন নিখিলের হাতে কোনও কাজ ছিল না। নারী-ভবন থেকে ফিরে এসে মনটাও ছিল ভারাক্রান্ত। কমলাকে অধ্যাপনার ছলে সে প্রতিদিন একবার ক'রে নারী-ভবনে যেত। সীমাকে দেখবার সুযোগলাভ করার চেয়েও কমলাকে ধীরে ধীরে বিপ্লববাদের রূপ, পরিচয় এবং তার বিরুদ্ধে যুক্তি-তর্কে দীক্ষিত করা তার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কেন না, প্রয়োজন ছিল কমলাকে দিয়ে সীমার মতপরিবর্তনের। দুরাশা ছিল, একদিন হয়তো বা সীমা এই দুর্দান্ত নারীস্বভাব-বিরোধী হিংস্রপন্থা বর্জন করতে পারে। হয়তো বা—কিন্তু অতটা দুরাশা মনে স্থান দিতেও তার দুঃসাহসে কুলায় না। ছাত্রীটিও মন্দ নয়। কমলা স্বভাবত শান্ত স্থিরবুদ্ধি এবং সংরক্ষণপন্থী। তা ছাড়া নারীসুলভ স্বাভাবিক কৌতূহল

এবং নিখিলনাথের মনোভাবের প্রতি তার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি তাকে এই উদ্যমে আগ্রহান্বিত করেছিল কম নয়। ইতিমধ্যে দু-এক দিন কথার ছলে সীমার সঙ্গে সামান্য দু-একটা বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল, তাতে সবচেয়ে আশ্চর্য হ'ল সীমার মনের একান্ত নিষ্ঠায়, অবিচলিত বিশ্বাসে এবং দেশের পরাধীনতায় কারও ব্যথা যে সত্যই এমন নিবিড় এমন গভীর এমন অতলস্পর্শ হতে পারে তা প্রত্যক্ষ ক'রে। ও অনুভূতির তীব্রতার সামনে তার যুক্তির চেষ্টা যেন খেলো হয়ে পড়ে, কথা যেন হাল্কা হয়ে যায়, তর্ক শোনায় যেন ভীরু নীচতার প্রতিধ্বনি।

আজ সীমাকে দেখে নিখিলনাথের মনে কেমন একটা আশঙ্কার মেঘ ঘনিয়ে উঠছে। সীমার কথায় বা ব্যবহারে যে স্পষ্ট কোনরূপ উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাচ্ছিল তা নয়, তবু তার সমস্ত চেহারার মধ্যে তার অন্তর্নিহিত কি এক অগ্নিদাহের পরিচয়ে নিখিলের চিত্ত যেন শঙ্কান্বিত হয়ে উঠল।

এ সম্বন্ধে যে-কোন প্রশ্নই যে বাচালতার পর্যায়ে গিয়ে পড়বে, বারংবার আহত হয়ে নিখিলনাথের সে শিক্ষা হয়েছিল। কিন্তু সীমার তনুদেহের সুস্পষ্ট কৃশতা, তার দৃষ্টির অস্বাভাবিক শুষ্ক তীব্রতা ক্ষণে ক্ষণে তার উন্মনা চিত্তকে সন্নিবিষ্ট করার গোপন প্রয়াস নিখিলের সীমা সম্বন্ধে সচেতন দৃষ্টির অগোচর ছিল না। অনাগত বিপর্যয়ের ধূমায়িত কল্পনায় তার চিত্তাকাশ সমাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। এ কয়দিন সীমাকে এক রকম এড়িয়েই চলেছে সে—পাছে তার শঙ্কিত ক্ষুব্ধ চিত্তের দুর্বলতা সীমার পরিহাসের আঘাতে পর্যুদস্ত হয়। পাছে তার ভীরুতার আভাসে সীমার মন কঠিনতর প্রতিজ্ঞায় নিজেকে অধিকতর বিপদের পথে জিদ ক'রে নিয়ে যায়। পাছে জ্যোৎস্নার বিতর্কের সুর ও কথা তার নিজের অতর্কিতে উচ্চারিত কোনও ভাবের সঙ্গে মিলে গিয়ে সীমার মনে কোন সন্দেহ জাগায়।

নিজের কামরায় ব'সে চিন্তা করতে করতে তার নিজেকে অত্যন্ত শ্রান্ত অসহায় বোধ হতে লাগল। বিপ্লবীদের নানা জটিল এবং বিপদ-সঙ্কুল কর্মধারার কথা চিন্তা করতে করতে হঠাৎ মনে হ'ল যে, ভুলু দত্ত সেদিন বলেছিল যে, সি. আই. ডি. থেকে কিছুদিনের জন্য তাকে ধার নেওয়া হয়েছে। শীগগিরই তাকে আবার নিজের কাজে ফিরে যেতে হবে। সে মনে মনে স্থির করলে যে, ভুলু দত্তের সঙ্গে বন্ধুতার সম্পর্কটা ভাল ক'রে ঝালিয়ে নিতে হচ্ছে। যদি বিপদের সঙ্কেত কোন রকমে পূর্ব হতে সংগ্রহ ক'রে সীমাকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। এতে পরোক্ষ ভাবে সে যে বিপ্লবেরই সহায়তা করছে, সীমাকে রক্ষা করতে পারার প্রবল মোহে সে কথা তার মন আমল দিতে চাইলে না। সে উঠে তৎক্ষণাৎ ভুলু দত্তের বাড়ি গেল।

* * *

বাইরের প্রশস্ত বারান্দায় বিস্তৃত চায়ের সরঞ্জাম সামনে রেখে ভুলু দত্ত খবরের কাগজ পড়ছিল। নিখিলকে দেখে অত্যন্ত হৃদ্যতার সঙ্গে বললে, আরে, এস এস। আমি তো ভেবেছিলাম যে, পুলিসের কাজ নিয়েছি ব'লে তুমি আর আমার মুখদর্শনই করবে না। তারপর? ব'স, চা খাও। আরে এ তেওয়ারী—

নিখিল বললে, ব্যস্ত হ'য়ো না ভাই। হবে এখন। হাতে কাজ ছিল না, তাই ভাবলাম, একবার তোমার এখানে এসে গল্পসল্প করা যাক। তারপর আছ কেমন? কতদিন ঢুকেছ সি. আই. ডি.-তে?

হচ্ছে, হচ্ছে, সব বলছি। এই তেওয়ারী, মা-জীকে বোলো একঠো বাবু আয়া, হাম বোলাতা, সমঝা?

নিখিল সসঙ্কোচে বাধা দিয়ে বললে, না ভাই, আজ থাক, আজ তোমার সঙ্গেই একটু গল্প করি। ও আর একদিন এসে আলাপ ক'রে যাব এখন।

সেদিন বাড়ি যাবার সময় ভুলু দত্ত বারংবার তাকে আসতে অনুরোধ ক'রে বিদায় দিলে। বললে, এস ভাই, মধ্যে মধ্যে। পুলিসের কাজ ক'রে মনে মনে তো দেশের লোকের কাছে একঘরে হয়েইছি। তোমরাও যদি ওই সঙ্গে একেবারে পরিত্যাগ ক'র, তা হ'লে মনুষ্যসঙ্গ-বিহনে অমানুষ হয়ে উঠব যে, তার জন্যে তোমরাও দায়ী কম হবে না। ব'লে হাসতে হাসতে বললে, তা ছাড়া তোমার বউদি তো পুলিস নয়, কি বল ?

এমনি ক'রে ভুলু দত্তের উৎসাহে এবং নিখিলের নিজের আবশ্যকে আত্মীয়তা ক্রমে জ'মে উঠতে লাগল। এমনি অভিনয় ক'রে যেতে প্রথম প্রথম নিখিলের মনে যেটুকু গ্লানি ছিল, সেটা ভুলু ও ভুলু-পত্নীর হৃদ্যতায় এক সময় কেটে গেল। নিখিল ভাবলে যে, মানুষকে দূরে রাখি ব'লেই কল্পনায় তাকে বীভৎস ক'রে দেখি। তার মনে পড়ল, পাড়ায় একদিন 'চোর' ধরা পড়েছে শুনে একটি ছোট মেয়ে তাকে দেখতে গিয়েছিল। ওই ছোট্ট মানুষটির মনে চোরের মূর্তির যে একটি অপরূপ ছবি ছিল, তাই স্মরণ ক'রেই বোধ হয় সে ভয়ে এবং কৌতূহলে তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে তাকে দেখছিল। তখন চোরকে সবাই আপন আপন বীরত্বের নমুনা স্বরূপ চাঁদা ক'রে কিছু উত্তম-মধ্যমের ব্যবস্থা করছে; কারোরই উৎসাহের অভাব নেই। হঠাৎ তার বাবাকে দেখে সে কেঁদে ছুটে গিয়ে তাঁর হাত ধরলে, ও বাবা, চোর কই, ও তো মানুষ; ওকে মারছে কেন ? বৃদ্ধ পিতা কন্যাকে তৎক্ষণাৎ জড়িয়ে কোলে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ মা, মানুষই তো। ওই কথাটাই আমরা ভুলে যাই। ব'লে তাকে নিয়ে চ'লে গেলেন। ঘটনাটা সামান্য, কিন্তু নিখিল কথাটা কখনও ভুলতে পারে নি।

ক্রমে ভুলু দত্তের সঙ্গে নিখিলনাথের বেশ একটা ঘনিষ্ঠতা দাঁড়িয়ে

গেল। একদিন কথাপ্রসঙ্গে ভুলু দত্ত নিখিলকে বললে, তোমাকে একটা অদ্ভুত খবর দিতে পারি।

নিখিল মনে মনে কান খাড়া ক'রে বসল। বাইরে উদাসীন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, বটে! কি রকম?

সত্যদাকে মনে আছে?

নিখিল গলার স্বরে স্বাভাবিক আগ্রহ বজায় রেখে বললে, কে, সত্যবান? নিশ্চয়। খবর জান নাকি তার?

লাফিও না। জানি, তাও সুখবর নয়। কিংবা তাই হয়তো সুখবর। শোন, মাস আষ্টেক আগে একটা বিশেষ সংবাদ পেয়ে শ্রীরামপুরে একটা তল্লাসে যাই। একজন খবর দিয়েছিল যে, ওখানে একটা পোড়ো বাড়িতে বিপ্লবী কোন একটা ছোট দল আড্ডা নিয়েছে। সঙ্গে একটা মেয়ে ছিল। অনেক তোড়জোড় ক'রে গিয়ে যা দেখলুম, তাতে পুলিসের দিক দিয়ে বিশেষ কিছু ফল হ'ল না। আমার সঙ্গে আমার সুপিরিয়র ছিল। তার রিপোর্টটাই বলব। রিপোর্টে লিখেছে যে, একটা মৃতদেহ বাড়িটাতে পাওয়া গেছে, বোধ হয় কোন ভিখারীর। বাড়িটাতে মনুষ্য-বসবাসের অল্প যা চিহ্ন আছে, তা ওই ভিখারীটার ব'লেই মনে হয়। একটা লণ্ঠন, দুটো ভাঁড়, একটা বাটি আর কলসী প্রভৃতি দু-একটা বাজে জিনিস ছাড়া আর কিছু নেই। মিঃ দত্তকে পরদিন ভাল ক'রে অনুসন্ধান করবার জন্যে রেখে এলাম। মিঃ দত্ত অবশ্য তোমাদের বুলডগ। জানই তো আমার মাথায় একটা কিছু ঢুকলে তার হদিস না ক'রে আমার শান্তি হয় না। সাহেবের বোধ হয় কলকাতায় ফেরবার তাড়া ছিল। বাড়ির ভাঙা ঘরগুলো এবং বাড়ির চতুর্দিকে ঘুরে তার কাজ শেষ ক'রে সে চ'লে গেল। আমিই ইচ্ছে ক'রে সাহেবকে ব'লে আরও অনুসন্ধানের অনুমতি নিয়ে র'য়ে গেলাম। একটু কারণও ছিল তার। বাড়িটাতে ঢোকবার আগে

রাড়িটা ঘেরাও করা হয়। তারপর আমিই প্রথম হল-ঘরটাতে যাই ; মৃতদেহটাকে দেখে আমিও প্রথমে ভিখারীর মড়াই ভেবেছিলাম ; তবু শব্দ না ক'রে আমার সঙ্গের কন্‌স্টেব্‌লটাকে দিয়ে সাহেবকে ডাকতে পাঠিয়ে দিলুম। হঠাৎ আমার চোখ টর্চের আলোয় একটা ইন্‌জেক্‌শানের অ্যাম্‌পিউলের উপর পড়ল। চুপি চুপি সেটা পকেটে পুরলাম। এইটাই আমার ভিখারীর থিওরিটা পাল্টে দিলে, তবু সাহেব কি বলে তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম। সাহেবও অনেকক্ষণ দেখে তাকে ভিখারী ব'লেই ঠিক করলে। একবার ভাবলাম, অ্যাম্‌পিউলটা দেখাই। তখনি মনে হ'ল, মরুকগে যদি কিছু বার করতে পারি তো তার ক্রেডিটটা ও ব্যাটা আত্মসাৎ করে কেন! তবু আমি তাকে সাবুর বাটি দেখালাম। সাহেবের মাথায় তখন ভিখারীর থিওরি জ'মে বসেছে। বললে, কেউ দয়া ক'রে দিয়ে গেছে ; খাবার আগেই কাবার হয়েছে। কিংবা ব্যাটা নিজেই তৈরি ক'রে থাকবে, হঠাৎ বোধ হয় হার্টফেল ক'রে মরেছে। ওই তো চেহারা ; যক্ষ্মা হে যক্ষ্মা নিশ্চয়, যাকে বলে—কন্‌সম্পশন। এখানে বেশিক্ষণ থেকো না। আজ বরং দুজন সেপাই পাহারায় রেখে যাও। উৎসাহ থাকে তো কাল দিনের বেলা এসে দেখো খুঁজে, কোন গুপ্তধন পাও কি না! ব'লে একটু ঠাট্টার হাসি হাসলে। আমি আর তর্ক করলুম না।

পর দিন গিয়েছিলাম। আমার একটুও আর সন্দেহ নেই—যে মৃতদেহটা দেখেছিলাম তা সত্যবানের ; এবং শেষ পর্যন্ত তার চিকিৎসা হয়েছিল। তবু সে কথা আমি প্রকাশ করি নি—না-করার আমার উদ্দেশ্য আছে। সত্যবান যে একলা ছিল না, তা ঘুরে ঘুরে পরদিন অনেকগুলি জিনিস থেকে টের পেয়েছিলাম।

ইন্‌ফর্মেশনের একটা কথাও ভুল নয়। আমার বিশ্বাস, ভেলোয়ারের কাণ্ডের পর যে মেয়েটাকে পুলিস গিরিডি অবধি ধাওয়া করেছিল, সেই

ওর সঙ্গে ছিল। ভীষণ ধড়িবাজ মেয়ে হে। পুলিসকে একেবারে ঘোল খাইয়ে ছেড়েছে। তাই ভেবেছিলাম যে, একেবারে গ্যাং সুদ্ধ গ্রেপ্তার করার ক্রেডিটটা একলাই নেব। তা আর হ'ল না—ফস্কে গেল। তা যাক, আমিও ছাড়বার ছেলে নই, ও একদিন বুলডগের মুখে পড়তেই হবে দাদা, হেঁ-হেঁ। ব'লে গর্বিত হাস্যে তার অকৃতকার্যতা যেন চাপা দিয়ে ফেললে।

নিখিল মনে মনে একটু অস্বস্তি অনুভব ক'রে ব'লে ফেললে, ও নিয়ে আর মিছে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? পালের গোদাই যখন মারা পড়েছে তখন বাকি ক-টা এতদিনে দেখগে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে ঘর-সংসার করছে। চাই কি তোমার পুলিসে নতুন যারা ভর্তি হয়েছে তাদেরও মধ্যে খোঁজ ক'রে দেখ, দু-এক জনকে পাওয়া বিচিত্র নয়। তারাই আবার তোমাদের দক্ষিণ হস্ত হবে, কি বল?

ভুলু দত্ত হা-হা ক'রে হেসে উঠল। বললে, বেশ বলেছ ভাই, এই আমাকেই দেখ না। আমি যত টেররিস্টদের ঘাঁৎ-ঘোঁৎ জানি, আর কোন ব্যাটা জানে তত? তাও বলি ভাই, আমার জন্যেই আবার অনেকগুলো নিরপরাধ ছোকরা বেঁচে গেছে। কর্তারা তো হন্যে হয়ে আছে। ছায়া দেখলেই আঁৎকে ওঠে; দোষী-নির্দোষী বাছবার সময় কি হয় তখন? তুমি যদি নির্দোষী হও—তবে প্রমাণ ক'রে খালাস হও; নইলে পচ হাজতে প'ড়ে। আরে, ওতে যে ডিস্‌এফেক্‌শন স্প্রেড করে দেশে, তা কোন বড়কর্তা বা ছোটকর্তাকে বোঝানো যায় না। মরুকগে, কে আবার কোন্ দিক থেকে শুনে আমার দফাটি সারবে এখন আর কি। যা দিনকাল পড়েছে ভায়া!

একটু মুচকি হেসে নিখিল বললে, কিন্তু মূর্খ লোকের ধারণা যে, যেমন চোর ডাকাত গুণ্ডা না থাকলে পুলিস বেকার হয়ে পড়ে, মিলিটারী আর সি. আই. ডি.-ও অনাবশ্যক হয় তেমনি দেশে এইসব

মুভমেণ্ট না থাকলে। তা ছাড়া সময় অসময়ে এই সব হতচ্ছাড়া মুভমেণ্টগুলোই নাকি গভর্মেণ্টকে নানা রকম 'নাগ-পাশ' আইন পাস করার অজুহাত জোগায় ?

ভুলু দত্ত প্রসঙ্গটা আর চলতে না দিয়ে একটু শুষ্ক উগ্রস্বরে বললে, কি জানি ভাই, অত পলিটিক্স্ আমি বুঝি নে। আমাদের উপর হুকুম টেররিজ্‌ম্ উচ্ছেদ করবার—তোমরা আবার তারও একটা উল্টো মানে বের করবে। এই জন্যেই তো বাঙালীদের ওপর ওরা চটে। যত নেই-কথাকে ফেনিয়ে খই-ভাজা। এ যেন সেই তোমাদের রবি ঠাকুরের কবিতা। তার একটা আধ্যাত্মিক মানে বের করাই চাই, নইলে লোকে নির্বোধ বলবে। ওসব আমি বুঝি নে—আমি বুঝি কাজ। টেররিজ্‌ম্‌কে দেশ থেকে আগাছার মত উপড়ে ফেলতে হবে —অ্যাণ্ড আই উইল ডু দ্যাট।

নিখিল বললে, আরে, চট কেন ভাই; টেররিজ্‌মের উচ্ছেদ হ'লে আমি যতটা খুশি হব—তুমি অন্তত ততটা হবে না। কারণ ওটাই তোমার খোরাক যোগায় কি না! রাগ ক'রো না ভাই। বন্ধু ব'লেই এসব বলছি।

হাঃ হাঃ! রাগ কি হে? বেশ বলেছ। আজ সি. আই. ডি. উঠে গেলে ভুলু দত্তকে কেউ পঁচিশ টাকার একটা মাস্টারিও দেবে না যে! তবে কিনা, আগাছা কাটবার জন্যে, পাথর ভাঙবার জন্যে খোন্তা-কোদালেরও তো দরকার। ওগুলোর তো উচ্ছেদ করা চাই—

নিশ্চয়, টেররিজ্‌মের উচ্ছেদ আমি মনে প্রাণে কামনা করি। শুধু খুনোখুনির আতঙ্কে বলছি না; বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে ভয় মনে ঢুকেও থাকতে পারে, জানি না। টেররিজ্‌ম্ মানুষকে মনুষ্যত্বহীন করে, মানুষকে কাপুরুষকে ক'রে তোলে ব'লে তা কামনা করি।

টেররিজম্ দুর্বলকে কুৎসিত করে—সবলকে বীভৎস করে। সুতরাং অত্যাচারের ভয় দিয়ে মৃত্যুর ভয় দিয়ে যেই শাসাক, সেই নিজেকে এবং অন্যকে পিশাচ ক'রে তোলে ;—সে তোমার গভর্মেন্টই হোক কি সত্যবানই হোক। ভয় দেখানো পিশাচেরই ধর্ম, মানুষের নয়। ব'লে সে ভুলু দত্তের মুখের দিকে দৃষ্টিহীন চোখ রেখে আরও বলবার কথাগুলো মনে মনে ভাবতে লাগল। ভুলু দত্তও অল্প একটু অপ্রস্তুতের হাসি হেসে মাথা নাড়তে লাগল। খানিকটা দম নিয়ে নিখিল যেন নিজের মনের অবরুদ্ধ আবেগে আবার শুরু করলে, শুধু আমার দেশের জন্যে বলছি নে—চাই যে, সমগ্র মানবজাতির মন থেকে এই টেররিজ্‌ম্ দূর হয়ে যাক। এই পন্থা দেশে দেশে মানুষকে মনুষ্যত্বের পথ থেকে বঞ্চিত করছে, মানুষকে দলে দলে শিক্ষিত হত্যারক পশুতে পরিণত করতে চলেছে। নরনারীর স্বাভাবিক সৃষ্টিশক্তিকে, আধ্যাত্মশক্তিকে ধ্বংসের পথে, পাশবিকতার পথে, সর্বনাশের পথে নিয়ে চলেছে। লোভে ক্রোধে হিংসায় জিঘাংসায় তার মুখ থেকে দেবতার ছবি মুছে গেল—হায় হায়, কেউ কাউকে রক্ষা করতে পারলে না—শুধু পরস্পরকে ধ্বংস করার জন্যে অন্ধ উন্মত্ততায় সর্বনাশের আগুনে ঝাঁপ দিতে চলেছে দলে দলে— বলতে বলতে ভুলু দত্তের মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ সে থেমে গেল। এতটা আবেগের কারণ বুঝতে না পেরে ভুলু হাঁ ক'রে তার দিকে চেয়ে আছে—যেন কোন একটা কারণ সে তার দৃষ্টি দিয়ে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। নিখিল জোর ক'রে একটু কৃত্রিম সলজ্জ হাসি টেনে এনে বললে, ভাবছ, হঠাৎ নিখিলকে বক্তৃতায় পেয়ে বসল কেন? তুমি জান তোমাদের সঙ্গে আমিও একদিন ওই দলে ছিলুম। তার পরে এ নিয়ে অনেক ভেবেছি। জীবহত্যা-টত্যার কথা আমি ভাবি না। প্রতিদিন স্লটার-হাউসে তো

কত কোটী কোটী প্রাণী আমাদের খাদ্যের জন্যে আমরাই হত্যা করি। সেটা ন্যায় কি অন্যায় তার বিচার এখানে করবার নয়। ভয় দেখিয়ে মানুষকে অমানুষ ক'রে আত্মাকে বামন ক'রে রাখার মত অপরাধ নেই। যে কেউ তা করে, সেই ওই পাপে লিপ্ত। প্রবল কেউ যদি শুধু ভয় দেখিয়ে লোককে শিষ্ট করতে চায় তবে 'টেররিজ্‌ম্‌-এর উচ্ছেদ করতে চাই' এ কথা তার অন্তত বলা সাজে না। নিজের শক্তির উপর নিশ্চিন্ত নির্ভর থাকলে কেউ টেররিস্ট হয় না। সন্ত্রাসন ভীরুর অস্ত্র—তা সে যেই ব্যবহার করুক।

ভুলু দত্ত বললে, ভাই, তোমার মত ক'রে আমি ভাবি নে। দেশে শাসক থাকবেই—পেনাল কোডও বুদ্ধদেবের রচিত হবে না। চুরি, ডাকাতি, খুন, জখম, অরাজকতা নিবারণের জন্যে শাস্তির ভয় দেখালে যদি দুর্বলতার অস্ত্র বল, তবে দেশের শাসন অচল হবে। দেশের শান্তি-রক্ষাও বড় জিনিস—তা না হ'লে উন্নতি হওয়া সম্ভব হয় না, দেশ সমৃদ্ধ হয় না। এই তো বাবা সোজাসুজি বুঝেছি। দি এণ্ড জাষ্টিফাইজ্‌ দি মীন্‌স্‌। এ ক্ষেত্রে তাই না?

নিখিল দেখলে যে, এই উত্তেজনা প্রকাশ ক'রে সে ভাল করে নি। তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ এতে রুদ্ধ হতে পারে। ভুলু দত্তের কন্‌ফিডেন্‌স্‌ হারালে তার চলবে না। বললে, তা সত্যি, তবু কেমন যেন মনে হয় যে ওতে পাগলের পালকে আরও ক্ষেপিয়ে তোলা হচ্ছে।

একটু উৎসাহ পেয়ে ভুলু দত্ত বললে, না হে না; দেখতে দেখতে কত দুঁদে টেররিস্ট্‌ সিধে হয়ে গেল। কত ব্যাটা আবার কান কেটে সরকারী কাজে জুতে গেছে, দেখ গে। কথায় বলে—যেমন কুকুর তেমনি মুগুর—বিলেতের আমদানি কথা নয় হে, অনেক অভিজ্ঞতার ফল। এই শর্মাই কত ব্যাটাকে ঠাণ্ডা করলে—

ভাল মানুষের মত নিখিল বললে, তা ঠিক, টেররিজ্‌ম্‌কে একেবারে ঠাণ্ডা করেছ তোমরা, তা বলতে হবে—অন্তত বাংলা দেশে।

তা আর কই হ'ল হে! এ ব্যাটারা রক্তবীজের ঝাড়। ধোঁয়াচ্ছে হে ধোঁয়াচ্ছে—আবার একদিন শুনবে, কিছু একটা কাণ্ড কিংবা তার আগেই যদি বুলডগের মুখে না পড়ে—

বটে, কই কিছু দেখি না তো আর কাগজে! সব চুপচাপ ঠাণ্ডা।

চুপচাপ থাকবে না তো কি জয়ঢাক কাঁধে ক'রে বিজ্ঞাপন দিয়ে বেড়াবে? এরা আর আগেকার মত বোকা নেই হে। এরা ঢের চালাক, ঢের কাজের লোক হয়ে গেছে। এদের মুভমেণ্ট একটুও বোঝবার জো নেই। এদের ফন্দী ফাঁস করতে পারায় সুখ আছে হে; কারণ তা সহজ নয়। এই ধর না কেন, সেই যে মেয়েটার কথা বললুম —সত্যদার সঙ্গে ছিল! স্রেফ চোখে ধুলো দিলে হে!

নিখিল আর বেশি কৌতূহল প্রকাশ না ক'রে বললে, আমাদের তখনকার মেথড্‌স্‌ কি রকম ক্রুড ছিল মনে করলে এমন হাসি পায়।

তা সত্যি, এখনকার তুলনায় আমাদের লম্ফঝম্ফ ছিল যেন যাত্রার দলের আখড়াই। শুনলে অবাক্ হয়ে যাবে এদের সব কথা।

নিখিল দাঁড়িয়ে উঠে বললে, আজ কাজ আছে ভাই উঠি। শোনা যাবে একদিন তোমার মক্কেলদের কেরদানি, আর তোমার কেরামতি। ঝোঁকের মাথায় এক চোট বক্তৃতা মেরে নিলুম, কিছু মনে ক'রো না।

আরে, না হে না, আমি আর কি মনে করব! তবে দিনকাল খারাপ, কথাবার্তা একটু সামলে বলাই ভাল—বুঝলে কি না!

তা আর কি বুঝি না! তবে তোমার কাছে ব'লেই বললাম। ব'লে নিখিল বিদায় হয়ে গেল।

'বুলডগের মুখে পড়া'র কথাটা তার মনের মধ্যে খচখচ করতে লাগল।

৪৭

অনিন্দিতা দেবীর নারী-ভবনে আজ ছ মাস কমলা কতকটা নিরুদ্বেগে এবং অপেক্ষাকৃত মনের স্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত করবার সুযোগ পেয়ে এক দিকে যেমন নিশ্চিন্ত হয়েছিল অন্য দিকে অজয়ের অদর্শনে তার মনের অশান্তিও কিছু কম ছিল না।

সীমার বন্ধুত্বে এবং সীমা সম্বন্ধে নিখিলনাথের অনুরোধ পালনের চেষ্টায় সময় তার কাছে অবশ্য নিতান্ত ভার হয়ে ওঠে নি এই যা। তবু সময় সময় দরোয়ান পাঠিয়ে গোপনে নিখিলনাথকে অজয়ের সংবাদ সংগ্রহ ক'রে এনে দিতে হয়েছে। এতে যে দুর্ঘটনার সূত্রপাত হয়, কমলের জীবনে অহেতুক অনুশোচনার কারণ তার চেয়ে বড় আর কখনও ঘটে নি।

কয়েকদিন হ'ল কমলের হাসপাতালের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। হাতে কিছু বিশেষ কাজ না থাকায় উপরের জানলায় ব'সে রাস্তার জনস্রোতের দিকে চেয়ে তার দীর্ঘ অলস প্রহর যাপন করছে সে। মনটা যেন তার অসাড় হয়ে গেছে। তার স্বামীর আশু অনুসন্ধানের সম্ভাবনা নিখিলনাথের উদ্বেগপীড়িত চিত্তে চেতিয়ে তোলবার মত স্বার্থপরতা তার স্বভাববিরুদ্ধ। নিখিলনাথ এ বিষয়ে যে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত বা উদাসীন নয় তা সে কৃতজ্ঞচিত্তে অনুভব করে। ব্যথিত হৃদয়ে অসহায় ব্যাকুল বেদনায় সে পথের দিকে চেয়ে ব'সে আছে। সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়। গ্যাসের বাতি জ্বালানো হয়ে গেছে। অল্প দূরে একটা গ্যাস-পোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে একটা লোক তাদেরই বাড়িটাকে লক্ষ্য করছে ব'লেই মনে হ'ল। আলো-আবছায়ার মুখ ভাল দেখা যায় না। কমলা ভাবলে, সীমার দলের লোক বোধ হয়। তবু কি জানি—সীমাকে জানানো উচিত ব'লেই মনে হ'ল। উঠে যাবে—এমন সময় তার ভঙ্গী দেখে

বুকটা ধড়াস ক'রে তার মনে হ'ল, নন্দলাল নয় তো? লোকটা তখন স'রে গেছে। কমলের মনটা কেমন বিকল হয়ে রইল।

নিজের চিন্তাকে ভোলবার জন্য সে নিখিলের কাজে তার ক্ষুদ্র শক্তি নিযুক্ত করতে চেষ্টা করে। সুযোগ খুঁজে নিয়ে প্রায়ই সে সাবধানে ধীরে ধীরে তর্ক তোলে এবং নিখিলনাথের শিক্ষার যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার ক'রে নিখিলের প্রতি তার কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করতে চেষ্টা করে। কমলের চিত্তে এই তর্কের আর একটি আকর্ষণ ছিল; তা সীমাকে নিরীহ পন্থায় প্রত্যাবৃত্ত করা নয়; সীমার প্রতি নিখিলের দুর্নিবার আকর্ষণের কথা কমলের ক্রমে আর অগোচর ছিল না। স্ত্রীলোকের চিত্তে অনুপ্রেরণার পক্ষে এর বেশি আর কি আবশ্যক?

তর্কের মুখে শিক্ষামত কমলা সেদিন সীমাকে বলেছিল, হবে না কেন? পৃথিবীর সমস্ত মানুষ স্বাধীনতা লাভ ক'রে নিজে নিজের জন্মগত উপস্বত্ব ভোগ করবে, মনুষ্য-সমাজের এ নিয়মই নয়। এক জন অপরের উপর প্রভুত্ব করবেই। কোন একটা স্বাধীন দেশের মানুষও যে সেখানকার অন্য কতকগুলি মানুষের প্রভুত্বের বা আইনের বা সামাজিক স্তরগত নিয়মতন্ত্রের অধীন এ তো দেখতেই পাচ্ছি। তবে তোমারই দেশের কতকগুলি মানুষ তোমার উপর প্রভুত্ব করছে না, অন্য দেশের মানুষ করছে, এতে পরাধীনতার তফাত হচ্ছে কোথায়?

হচ্ছে; একশো বার হচ্ছে। স্বাধীনতা বলতে পশুর জীবন আমি কখনও বলতে চাই নি—যাদের রাষ্ট্র সমাজ সংস্কৃতি—কিছুই নাই। স্বাধীনতা বলতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, জাতীয় স্বাধীনতা বোঝায়। যেখানে নিজের অর্থ আমি নিজের কল্যাণের জন্য স্বেচ্ছায় ব্যয় করতে পারি, যেখানে মানুষের অধিকার নিয়ে সমস্ত জাতির সঙ্গে সমান গৌরবে দাঁড়াতে পারি, যেখানে দেশকে ভালবাসার

দেশের স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষার অপরাধে মানুষ মানুষকে বন্য জন্তুর মত খাঁচায় পুরে রাখতে পারে না; যেখানে দেশের মানুষকে স্বাধীনতা-চেষ্টার অপরাধে শেয়াল-কুকুরের মত নির্বিচারে নিঃশঙ্ক-চিত্তে অবাধে হত্যা— কিন্তু কী-ই বা হবে এসব কথা তোমাকে ব'লে! বিরক্ত মুখে সে জানলার বাইরে চেয়ে রইল। বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে অপেক্ষাকৃত শান্ত দৃঢ় স্বরে বললে, স্বাধীনতা আমাদের চাইই। আপাতত আর আমি কিছুই চাই না। নইলে আমরা একেবারে ডুবে যাব।

সীমার উত্তেজনায় কমলা নিজের খেই হারিয়ে ফেলেছিল। এবার একটু সাহস সংগ্রহ ক'রে শান্ত স্বরে বললে, সোজা কথায় বল না ভাই, যে মানুষের মঙ্গলের চেয়ে মানুষের দেমাকটাকে বড় ক'রে তুলতে চাও—তাতে মঙ্গল হয় ভাল, না হয় নেই, নেই। স্বাধীন হ'লেই যে মানুষে মনুষ্যত্বলাভ করে না, সে তো হাজার বার তুমিই ভাই দেখাচ্ছ—অন্য সব স্বাধীনতা-মত্ত জাতির দৃষ্টান্ত দেখিয়ে। তবে স্বাধীনতা স্বাধীনতা 'ক'রে ক্ষেপে বেড়াবার আমাদের কি আছে বল তো? দেশের লোককে মানুষ ক'রে তোল, দেখ স্বাধীন হওয়ার চেয়ে সে অনেক বড় হবে। এমন কি শেষে, চাই কি স্বাধীনও হয়ে যেতে পারে। মনুষ্যত্বলাভ করলে স্বাধীন যারা তাদের চেয়েও কি বড় হবে না? এই যে তুমি নারী-ভবন করেছ, এইটাকেই গ'ড়ে তোল না। আমাদের দেশের স্ত্রী-পুরুষ কেউ আত্মনির্ভরশীল নয়। সকলকে পায়ের ওপর দাঁড়াতে শেখাও না। আরও তো কেউ কেউ এই কাজে তাদের জীবন উৎসর্গ করেছে। তারা তোমার মনুষ্যত্ব-বিরোধী স্বাধীনতা লাভের চেষ্টার চেয়ে খারাপ কিছু করছে ব'লে তো আমার মনে হয় না। এই

কমলাপুরীর কথাই ধর না কেন। দেখ না, পার্বতী দেবী কী ক'রে তুলেছেন? এই তো কাজ।

পার্বতী দেবীটি কে? ও হ্যাঁ, নিখিলবাবু একদিন বলেছিলেন বটে। তা আমার ভাই খবর নেবার অবসর হয় নি।

এখানে একটা কথা ব'লে রাখা প্রয়োজন। কমলাপুরী প্রতিষ্ঠানের কথা নিখিল প্রথম যখন শুনেছিল তখন এই কথা মনে ভেবেই তার মনে একটা দুরাশার সঞ্চার হয়েছিল যে, পার্বতীর সংস্পর্শে সীমাকে যদি এনে ফেলা যায় এবং এই যোগসূত্রে নারী-ভবনের কাজটাকে দেশের কল্যাণসাধনের পথে যদি পরিচালিত করতে পারে তবে একদিন হয়তো সীমার চিত্ত কর্মের স্রোতে প'ড়ে সন্ত্রাসনপন্থা পরিত্যাগ করতেও পারে—নিজের উদ্বুদ্ধ সৃজনীশক্তির আকর্ষণে। তাই সে প্রতিষ্ঠানটির সংবাদও সংগ্রহ করতে শুরু করেছিল। কিন্তু সীমার ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস-প্রচেষ্টা এবং আনুষঙ্গিক বিপদের আশু সম্ভাবনার প্রতীকার-চেষ্টায় নিখিলের মন অধিকতর ব্যাপৃত থাকায় সে দুরাশা তাকে আপাতত ত্যাগ করতে হয়েছিল।

যাই হোক, এই অনুসন্ধানের সূত্রে কমলাপুরী সম্পর্কে নানা সংবাদ এবং গুজব নিখিলের কানে এসেছিল। পার্বতী দেবীর প্রতিষ্ঠানের পশ্চাতে যে কোনো বিলাত-প্রত্যাগত জমিদারের পত্নীস্মৃতি-রক্ষার চেষ্টা প্রচ্ছন্ন আছে, এ কথাও সে শুনেছিল। কমলার ইতিহাস শুনতে শুনতে বারংবার তার কেমন একটা সন্দেহ জাগতে থাকে। কমলাকে একদিন সে জিজ্ঞেস ক'রে—আপনার স্বামী তো মস্ত জমিদার বলেছেন। আচ্ছা, তিনি কি বিলেত-ফেরত? মানে, সাহেবদের দেশে কি—

না তো! তবে হ্যাঁ, ওদেশ বেড়াবার তাঁর বরাবর খুব শখ ছিল। নিখিলের মনে হয় এমন স্ত্রীরত্ন হারিয়ে দেশত্যাগ ক'রে যাওয়া তো খুবই স্বাভাবিক।

জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা, পার্বতী দেবীর নাম কখনও নিশ্চয় শোনেন নি?

কই, মনে তো পড়ে না। কেন এসব জিজ্ঞেস করছেন, বলুন তো?

বলছি। পার্বতী দেবী একটি বিলেত-ফেরত বাঙালী মেয়ে। আজ ক বছর তিনি কমলাপুরী নামে একটি নারী-প্রতিষ্ঠান খুলেছেন। প্রতিষ্ঠানটি এরই মধ্যে খুব নাম করেছে। তার প্রস্‌পেক্‌টাসগুলো আমার কাছে আছে। প'ড়ে দেখবেন, খুব চমৎকার কাজ করছেন এই মহিলাটি। আপনাদের নারী-ভবনের সাহায্য হতে পারে ভেবে এক সময় এঁদের খোঁজখবর নিয়েছিলাম। আপনাদের ডাক্তার ক্ষিতীশ গুপ্তকে জানেন তো? দুনিয়ার খবর ওর কাছে; ভদ্রমহিলা সংক্রান্ত হ'লে তো কথাই নেই। একটা কেচ্ছা সে বানাবেই। ও একদিন বলছিল যে, একজন ইয়ংম্যান জমিদার মেয়েটিকে সঙ্গে ক'রে আনে। বিলেতেই ভাব হয়। জমিদার নাকি মেয়েটিকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু তা নাকি হবার জো নেই। মেয়েটির স্বামী বর্তমান, ইত্যাদি ইত্যাদি। যাই হোক আমি ওদের খোঁজ নিয়ে জেনেছি। মেয়েটি অসাধারণ কর্মী। জমিদারের অস্তিত্বটা মিথ্যে নয়। তার মৃতপত্নীর স্মরণেই এই প্রতিষ্ঠানটি বটে। একবার ভাল ক'রে খোঁজ নিতে হবে আমার। কারণ এমন তো বড় দেখা যায় না। আমাদের দেশের জমিদার নিজের নামটি পর্যন্ত প্রচ্ছন্ন রাখে, আবার বিয়ে না ক'রে পত্নীর স্মৃতি-রক্ষায় হিতসাধনে লেগে যায়! এ যে অভাবনীয়!

বলতে বলতে নিখিল ভাবে যে, বড় ঘরের নিরুদ্দিষ্টা পত্নীকে মৃত ব'লে প্রচার করা কি অসম্ভব, অস্বাভাবিক! খোঁজ নিতে হচ্ছে।

শুনতে শুনতে কমলা উন্মনা হয়। ভাবে, তাঁরও আমাকে নিয়ে বিদেশে বেড়ানোর শখ ছিল।

যাই হোক, সীমার প্রশ্নের জবাবে কমলা বললে, এ রকম একটা

প্রকাণ্ড জিনিস এক জন মাত্র মেয়ের পক্ষে গ'ড়ে তোলা যে কী—পড়লে অবাক হতে হয়, দাঁড়াও। এই ব'লে কমলা নিখিলনাথের সংগৃহীত কমলাপুরীর প্রসপেক্টাস ইত্যাদি এনে দেখালে।

কাগজ পড়তে পড়তে সীমার মনের চিন্তা অন্য ধারায় বইতে লাগল। এত বড় একটা প্রতিষ্ঠানকে যদি হাতে পাওয়া যায়। উঃ! এই তো চাই; নিজের পায়ের উপর নির্ভর ক'রে আত্মীয়ের পরাধীনতাকে যারা ঘৃণা করতে শিখেছে, তাদের মনে বিজাতির পরাধীনতার উপর বিদ্বেষ আনতে পারলে—তা ছাড়া অত বড় একটা জমিদার হাতের মুঠোয় পেলে—তার মনের ভিতরটা উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং এই প্রতিষ্ঠানের উপর যেন প্রায় কৃতজ্ঞ বোধ করতে লাগল। যেন তারই কাজ এরা অনেকটা ক'রে রেখেছে। এই তো একটা বৃহৎ জমি প্রস্তুত—অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হ'লে এই রকম একটা জায়গা থেকে কি না হতে পারে! বললে, যাবে একবার? কমলা বললে, কোথায়?

কমলাপুরী।

না না ভাই, চিনি না, জানি না—

সীমা নিজের প্রায় অজ্ঞাতসারেই যাওয়ার ইচ্ছেটা প্রকাশ ক'রে ফেলেছিল। সে একটু সামলে নিয়ে পরিহাসের হাসি হেসে বললে, পাগল! কে যাচ্ছে! কাজকর্ম ফেলে নীল পাখির পিছনে ধাওয়া করবার আমার সময় আছে নাকি?

বলতে বলতে সে মনে মনে কমলাপুরী দেখে আসবার সঙ্কল্প স্থির ক'রে ফেলবে—মুখে অবশ্য কোনও কথা আর সে প্রকাশ করলে না; কিন্তু তার মনের ইচ্ছেটা অগোচর রইল না।

সীমাকে স্তব্ধ হয়ে চিন্তা করতে দেখে কমলার মনে একটু আশার সঞ্চার হ'ল। সে উৎসাহিত হয়ে বললে, সত্যি যাবে ভাই? সীমা একটু হেসে বললে, পাগল! কমলা বললে, মানুষকে কল্যাণের পথে চালাচ্ছে

হ'লে যে শক্তির দরকার, এই মেয়েটির তা নিশ্চয় প্রচুর আছে। কিন্তু আমি জানি না তোমার মত ক্ষমতা তাঁর আছে কি না! তুমি যদি মনে কর, কী না করতে পার বল তো? সমস্ত দেশের শিক্ষা, শিল্প, শক্তিকে জাগাতে তোমার এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়ে অনায়াসেই তুমি পার। যাদের স্বাধীনতা চাও, তাদের ভিতর থেকে স্বাধীন ক'রে তোল—বাইরের পরাধীনতার খোলস একদিন খ'সে যাবেই।

হঠাৎ সীমার মুখের দিকে চেয়ে তার শূন্য দৃষ্টির উপর চোখ পড়ায় কমলা চুপ করলে—সীমা তার কথা শুনছে না কি! না, তারই কথায় তার মনটা বিচলিত হয়েছে। বললে, সত্যি ভাই, তুমি এমনি একটা কাজে লেগে যাও তো আমার এই অপদার্থ জীবনটা একটা কাজের রাস্তা পেয়ে বেঁচে যায়। আমি সামান্য, কিন্তু তোমার উপর আমার ভালবাসা তো কম নয়। কাঠবেড়ালি দিয়েও সেতু বাঁধার কাজ হয়েছিল—কি বল? ব'লে হাসতে লাগল।

সীমা অল্প হাসবার ভান ক'রে বললে, তবে কাঠবেড়ালি তো জতুগৃহ-নির্মাণে লাগে নি। না না, সত্যি, আসল কথা তোমরা উল্টো ক'রে ভাব, তাই আমার কথা তোমরা বোঝ না। এটা তো প্রতিমা গড়া নয় যে, তার কাঠ-খড় ঠিকমত সাজাও, রঙ দাও, তার পর একদিন মন্ত্র পড়লেই তাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হবে। দেশ একটা জীবন্ত মহাতরু; মরতে বসেছে যে সূর্যালোকের অভাবে, সেই সূর্যালোক তাকে যোগাও—দেখ, ফলে ফুলে পাতায় সৌন্দর্যে হিল্লোলে আপনিই ঝলমল ক'রে উঠবে। স্বাধীনতা আমাদের সেই সূর্যালোক—সেই আমাদের অমৃতরস যোগাবে। গাছকে সূর্যালোক থেকে বঞ্চিত ক'রে তার তদ্বির-তদারক করতে বললে সেটা উপহাস করা ছাড়া আর কিছু করা হয় না। ব'লে অসহিষ্ণু চোখে জানলার বাইরে চেয়ে চুপ ক'রে রইল।

কমলা তার বিরক্তি দেখে আর কিছু বলবে না ভাবছে, এমন সময় সীমা তার দিকে ফিরে বললে, কিছু মনে ক'রো না ভাই, তোমাদের ঐ রকম বিনিয়ে বিনিয়ে চুনিয়ে চুনিয়ে ভাবতে দেখলে আমার ধৈর্য থাকে না। নিখিলবাবুর মত লোক, যাঁর মৃত্যুভয় কেন, কোন ভয় কোন লোভ নেই ব'লে আমার বিশ্বাস; যাঁর মত লোক দেশের কাজে নামলে আমাদের বুকটা দশ হাত বেড়ে যায়, এই বয়সে তিনিও যখন বালাপোশ-মুড়ি-দেওয়া তামাক-খেকো বুড়োদের মত ওজন ক'রে ক'রে কথা বলতে থাকেন, তখন তোমায় আর কি বলব বল? কিন্তু সত্যি বল তো—সত্যিই কি তোমরা দেশের স্বাধীনতাকে মনে প্রাণে কামনা কর না? স্বাধীনতার চেয়ে বড় কাম্য কেমন ক'রে লোকের মনে থাকতে পারে তা আমি ভেবেই পাই না। সমস্ত স্বাধীন দেশের লোকেদের গিয়ে জিজ্ঞেস কর যে, কি হারালে তারা সবচেয়ে নিজেদের দরিদ্র ব'লে অনুভব করবে। একবাক্যে তারা বলবে—স্বাধীনতা। আমরাই কেবল নানা আরামলোভী ও বিপদভীরু মনোভাবের তাড়নায় প'ড়ে দার্শনিক সেজে রইলাম।

কমলা খুব নরম সুরে বললে, ভাই, তোমাদের মত তো আমি পড়াশুনো করি নি। খবরের কাগজ প'ড়ে প'ড়ে যেটুকু শিখি। সব ভাই আবার বুঝিও না। স্বাধীনতা যে ভাল সে কথা তো না বলছি না। তবু আজকাল আবার অনেক চিন্তাশীল লোক তো দেখি এই সব জিনিসকে অন্য চোখে দেখতে শুরু করেছেন। সেদিন কোথায় যেন দেখলাম যে, এই রাজনৈতিক জাতিভেদ এবং জাতীয় স্বাধীনতা এসব জিনিস সভ্যতা এবং মনুষ্যত্বের বিরোধী—আর এটা নাকি সভ্যজগতে আর বেশি দিন টিকবে না। 'এতখানি জমি আমি দখল ক'রে আছি, এর মধ্যে কেউ পা বাড়িও না, তা হ'লেই

খুনোখুনি বাধবে—কিংবা আমার গায়ের জোর বাড়লেই তোমারটা কেড়ে নেব,' এসব অসভ্যতা বেশি দিন টিকিবে না। 'দেশ জাতি' এসব মানুষের মধ্যের তফাত উঠে গিয়ে পৃথিবীর জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের যোগাযোগে শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্যের কেন্দ্র সব গ'ড়ে উঠবে। এই রকম সব কথা; ঠিক বুঝি নে। কিন্তু তাই যদি হয়, তবে কোন একটা দেশে আজ সেই দেশের লোক প্রভুত্ব করতে পেল না ব'লে—

কমলা বেচারা নিতান্ত মরিয়া হয়েই নিখিলের শেখানো মুখস্থ কথা আওড়াতে গিয়ে মুশকিলে প'ড়ে গেল। সীমা আর ধৈর্য রাখতে পারলে না, বললে, হয়েছে, হয়েছে। নিখিলবাবুর চেলাগিরি আর করতে হবে না। ওসব ঢের শুনেছি—তাঁকে শোনাও গে যাও, তোমার উপর ভক্তি বেড়ে যাবে। ব'লে একটু নরম হয়ে হেসে বললে, অমনিই কিছু কম নেই অবিশ্যি।

কমলা জিভ কেটে বললে, ছিঃ, ও কি ভাই! শ্রদ্ধা যদি তিনি সত্যি কাউকে করেন তো সে তোমাকে। তা ভাই, তোমার মুখের উপর বলছি ব'লে নয়, তোমার মত মেয়েকেও যদি তাঁর শ্রদ্ধা করবার চোখ না থাকত তো তাঁকে নিন্দে করতুম নিশ্চয়।

সীমা ঠাট্টার মুখে একটা ঝাঁজ দিয়ে বললে, আচ্ছা, থাক্, আর শ্রদ্ধা করাতে হবে না। তোমার নিখিলবাবুকে তাঁর বালাপোশ-বৃত্তিটা একটু পরিত্যাগ করতে বল, তা হ'লে আমার শ্রদ্ধাও কিছু পেতে পারেন। তারও মূল্য কিছু অল্প নয়, কি বল? ব'লে হাসতে হাসতে উঠে গেল।

সীমার কথার ঝাঁজে তার মনের রহস্যটুকু কল্পনা ক'রে কমলা মনে মনে বেশ কৌতুক অনুভব করলে।

৪৮

কমলার মুখে বিস্তারিতভাবে সীমার সঙ্গে তার কথাবার্তা এবং অকস্মাৎ সীমার অন্তর্ধানের কথা শুনে নিখিল চিন্তাকুল হয়ে উঠল। তা ছাড়া আজ কিছুদিন যাবৎ কয়েকটা অদ্ভুত ডাকাতির সংবাদ পাওয়া যাচ্ছিল, সেগুলির কোন কিনারা হয় নি। ডাকাতিতে লুটপাটের কোন চেষ্টা ছিল না। অর্থবান লোককে হঠাৎ গুম ক'রে তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করাই এগুলির উদ্দেশ্য ছিল। অনুসন্ধানের দাপটে পুলিসের ও গৃহস্থের আর আহার নিদ্রা ছিল না।

অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে নিখিল প্রায় স্বগতই ব'লে উঠল, তুমিও সঙ্গে গেলে ভাল করতে জ্যোৎস্না। কমলা অবাক হয়ে নিখিলের মুখের দিকে চাইলে। নিখিলের এ কথা বুঝতে বাকি ছিল না যে, সীমা কমলাপুরী গিয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি নিখিলের মনে ক্রমে একটা শ্রদ্ধা এবং দরদ জন্মেছিল। পাছে সীমার দল এদের উপর কোন উৎপাত করে, কিংবা যদি সেই জমিদার ভদ্রলোকটির উপর—! হঠাৎ এই ভয় তাকে পেয়ে বসল এবং সেও বিনা বিলম্বে সীমার সন্ধানে কমলাপুরী যাওয়া মনে মনে স্থির ক'রে হাসপাতালে ফিরে গেল।

নিখিল সীমার সীমানার মধ্যে গতায়াত করলেও সীমা বা রঙ্গলাল অবশ্য তাদের নিজেদের গতিবিধি কার্যকলাপ সম্বন্ধে কখনও নিখিলের সঙ্গে আলোচনা করত না। নিখিল সম্বন্ধে রঙ্গলালের মনের দ্বিধা যদিও কোনদিন সম্পূর্ণ নিরাকৃতি হয় নি, তবু সীমার খাতিরেই সে নিখিলকে বাহ্যত সহ্য ক'রে চলত।

নিখিলকে এই স্রোতের মধ্যে আকৃষ্ট করবার জন্যই হোক বা মনস্তত্ত্বঘটিত অন্য কোন কারণেই হোক সীমা যে তাকে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করে, এটুকু তার ব্যবহারে সে গোপন করত না। দমদমার বাড়িতে

যেতেও নিখিলের বাধা ছিল না, এবং এইটুকু গলাধঃকরণ করতেই রঙ্গলালের সবচেয়ে বাধত বেশি। সীমার খাতিরে কোনমতে সে সহ্য ক'রে যেত এই ঘা।

রাগের কারণও ছিল তার। রঙ্গলাল মোটের উপর বলতে গেলে এই নূতন উদ্যমের কর্মকর্তা। আর সেই হিসাবে সীমার অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা সে মনে মনে দাবি করত। সীমাও নিজের সেনা-নায়ক হিসাবে অবশ্য তাকে তার উপযুক্ত মর্যাদা দিতে ত্রুটি করত না; কিন্তু দেশের কাজে আত্মনিয়োগের জন্য রঙ্গলালের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার চিন্তা তার কাছে হাস্যকর ছিল। দেশের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারায় রঙ্গলাল যদি নিজেকে ভাগ্যবান মনে না করে, তবে দেশের কাজে না নেমে হাততালির লোভে তার যাত্রার দলে গিয়ে যোগ দেওয়া উচিত ছিল—এই তার মত, এবং স্পষ্টভাষায় এ মত ব্যক্ত করতে কে কসুর করত না।

রঙ্গলালের এই ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার কারণ নির্জলা দেশপ্রীতি মনে করলে একটু ভুল হবে। আরও ভুল হবে সে সীমার প্রতি বা অন্য কোন ক্ষুদ্র আকর্ষণে এ কাজে নেমেছে মনে করলে। আসল কথা আদিম বোম্বারু দলের কোন কোন নায়কের মত, দুর্ধর্ষ কিছু একটা ক'রে দেশময় একটা বিরাট হুলস্থুল বাধিয়ে দিয়ে দুন্দুভি নিনাদ করার উচ্চাভিলাষ তার মনে মনে বরাবরই ছিল। তা ছাড়া দুরন্ত বিপদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে মরার নেশাও তার ছিল প্রবল। স্বাধীন দেশে এরাই হয়তো দুঃসাহসী সেনা-নায়ক হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু দৃপ্ত যৌবনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে তাকে অন্য পথে নিয়ে গেল। ভীরু সে কোন কালেই ছিল না; সুতরাং সীমার আহ্বানে সীমাকে কেন্দ্র ক'রে একটা কিছু ঘটিয়ে তোলার আশাতেই সে এই দল গঠনের, এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনের ভার নিয়েছিল।

সম্প্রতি নিখিলকে নিয়ে সীমার সঙ্গে তার বিরোধ ঘটেছিল। সংগঠনের কাজে সীমা নিখিলকে মনে মনে একটা বড় আসন দেয় এবং সেই হিসাবে দলের মধ্যে তাকে পেতেও চায়, এটা রঙ্গলালের পক্ষে বরদাস্ত করা সোজা ছিল না। সীমাকে অবশ্য সে লঙ্ঘন করতে ভরসা পেত না। কারণ সীমার নিষ্ঠায় একাগ্রতায় সাহসে সে সহজেই দলের মধ্যে শ্রদ্ধা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এমন কি তাকে একচ্ছত্র প্রভুত্বও বলাও চলে। সে যাই হোক, কিছুদিন হ'ল একটি ঘটনায় রঙ্গলাল সীমার উপর আন্তরিক বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে উঠেছিল। ঘটনাটি এই—

কৃতকার্যতার উৎসাহে রঙ্গলাল এবং তার পল্টনদের কাণ্ডজ্ঞান প্রায় লোপ পাবার জো হয়েছিল। এবারে যাকে চুরি করেছিল সে একটা পাড়াগাঁয়ের কুশীদজীবীর একমাত্র পুত্র—নিতান্ত কচি ছেলে। এই লোকটির ধনের, কার্পণ্যের এবং কুশীদ-ব্যবসায়ের দুর্নাম ছিল অল্প নয়। এমন লোককেও একমাত্র শিশুর প্রতি মোহের তাড়নে, প্রাণের আতঙ্কে অর্থব্যয় ক'রে কলকাতায় আনতে হয় চিকিৎসার জন্যে। অর্থ তখন তার কাছে তুচ্ছ বোধ হয়।

শিশুটিকে যে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল, সেইখানকার দাইয়ের সাহায্যে শিশুটিকে হরণ ক'রে তারা দমদমার বাগানে এনেছিল। তাগা-তাবিজ-মাদুলি-ভারাক্রান্ত জীর্ণ এতটুকু দেহের মধ্যে প্রাণ যেন শুধু শক্তির অভাবেই বেরিয়ে যেতে পারে নি। সীমার মনের মধ্যে কেন যে তার অবচেতন মাতৃস্নেহ অকস্মাৎ উদ্বেল হয়ে উঠল বলা শক্ত। অকস্মাৎ তার শুষ্ক চোখ জলে ভ'রে এল। সে শিশুটিকে বুকে চেপে নিয়ে বললে, রঙ্গদা, একে দিয়ে এস, এর মা এতক্ষণে হয়তো আত্মহত্যা করেছে, এ এক্ষুনি মারা যাবে তাতে কারও কিছু লাভ হবে না।

ফিরিয়ে দিয়ে আসার প্রস্তাব অবশ্য কঠিন, ধরা পড়বার ভয় ছিল। রঙ্গলাল কিছুতেই রাজি হ'ল না, ব্যঙ্গ ক'রে বললে, এত করুণাময়ী দিয়ে দেশের কাজ হবে না, তার চেয়ে সময় থাকতে তুমি গিয়ে ঘরকরনা শুরু কর গে। চাই কি, শিশুপালনের সুযোগও ঘ'টে যেতে পারে।

যে বালকটি রঙ্গলালের সহায় ছিল, সীমার কথায় তারও চোখ ছলছল ক'রে এসেছিল। তার ছোট ভাইটিকে মরণাপন্ন দেখে এসেছে কাল। এমন সময় বিভ্রাট হ'ল নিখিল উপস্থিত হয়ে। তীব্র গভীর স্বরে এই অমানুষিকতার সে প্রতিবাদ করলে। বললে, এই রকম শ্বাপদবৃত্তির মূল্যে ক্রয় করা স্বাধীনতার চেষ্টায় দেশ যদি তাদের হাতে স্বাধীন হয়, তবে তা মানুষের দেশ থাকবে না, পশুরই দেশ হবে। এমন ঘটতে দিও না সীমা। তোমার মধ্যে যে মাতৃস্নেহ এখনও বেঁচে আছে তার নামে বলছি, এমনি ক'রে দেশকে মনুষ্যত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রো না।

সীমা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে শিশুটিকে বুকে চেপে ধ'রে তার স্বল্পাবশিষ্ট প্রাণস্পন্দন নিজের বুকের মধ্যে অনুভব করতে লাগল। এক মুহূর্তে এই সব স্বাধীনতার প্রয়াস, বিজাতীয় শৃঙ্খল, দেশের অধিকার ইত্যাদি মহৎ ব্যাপার তার কাছে বীভৎস হয়ে দেখা দিল। কিন্তু হায়, ফেরবার তখন তার পথ নাই। চারিদিকে পরের এবং নিজের, শত্রুর এবং মিত্রের গ'ড়ে তোলা বেড়াজালে তাকে ঘিরেছে। মুক্তিপথপ্রয়াসীর মুক্তি-অবকাশবিহীন সেই জতুগৃহের মধ্যে যে আগুন সে জ্বেলেছে, তার থেকে পালাবার পথ কোথায়? এবং অন্য সকলকে এই আগুনের মধ্যে ফেলে একাকী পলায়নের মত ভীরু নীচতার চিন্তাও তার পক্ষে অসম্ভব।

রঙ্গলাল দাঁড়িয়ে সীমার ভাবটুকু লক্ষ্য ক'রে নিখিলের কথায়

একেবারে জ্ব'লে উঠল, বললে, বাঃ বাঃ, বেশ বেশ, থিয়েটার জমেছে, মন্দ নয়! নিখিলবাবু, আপনাকে তো কেউ দালালি করতে ডাকে নি! বেশ খাচ্ছেন-দাচ্ছেন, নিরাপদে আরামে আছেন, বুদ্ধি ক'রে এ পথ থেকে সময় থাকতে প্রাণ নিয়ে স'রে পড়েছেন, সেই তো বেশ। আবার মিশনারিগিরি ফলাবার চেষ্টা নাই করলেন। নারী নিয়ে আপনার কারবার, নারী-ভবনে যান, মিশনারির কাজটা জমবে ভাল, সীমাকেও বরং টেনে নিয়ে যান; তার সুপ্ত মাতৃত্ব জাগ্রত করবার চেষ্টা দেখুন, কি বলেন? অঁ্যা? হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ! ব'লে পাশের বালকটির দিকে চেয়ে চোখ মটকে একটা কুৎসিত ইঙ্গিত করলে। বালকটি লজ্জায় মুখ নীচু ক'রে রইল।

সীমা আর সহ্য করতে পারল না। এগিয়ে এসে বললে, রঙ্গলাল তোমার ইতরামি করবার জায়গা এ নয়। যাও, এখনই এখান থেকে চ'লে যাও, নইলে সীমাকে তুমি জান; আমি এখনই গিয়ে পুলিসে ধরা দেব, তোমাকেও বাদ দেব না।

রঙ্গলাল এতটা আশঙ্কা করে নি। ধরা দিয়ে কুকুরের মত মারা পড়বার মত মনোবৃত্তি তার নয়। প্রচণ্ড বিপদের মধ্যে বিপুল অভিযান ক'রে দেশের ও দুনিয়ার লোককে চমকে দিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে সামনা-সামনি লড়াই ক'রে মারা যাবার বেপরোয়া কল্পনায় সে তুড়ুক-সওয়ার।

ক্রোধে, হিংসায়, হিংস্রতায় মুখ তার বিকৃত হয়ে এল। তবু আপাতত নিজেকে সামলে নিয়ে মনে মনে একটা শপথবাক্য উচ্চারণ ক'রে সে স'রে গেল।

সীমা এগিয়ে এসে বালকটির কোলে শিশুকে দিয়ে বললে, নিখিলবাবু, এঁকে ফিরিয়ে দিতে যাওয়ায় অনর্থক বিপদ আছে, তা তো আপনি বোঝেন। আপনি কি দয়া ক'রে এ বিষয়ে একটু সাহায্য করবেন?

নিখিল অত্যন্ত খুশি হয়ে আগ্রহের সঙ্গে বললে, নিশ্চয়, আমাকে যে-রকম বল তাই করতে প্রস্তুত আছি। আমি একে নিয়ে কি ওর বাবার কাছে—

সীমা একটু হেসে বাধা দিয়ে বললে, না না, তেমন কিছু করবেন না। তাতে আপনার তো মঙ্গল নাই-ই—আমরাও এড়িয়ে না যেতে পারি। আমরা টাকা দিচ্ছি। আপনি দয়া ক'রে একে ওর বাবার নাম ঠিকানা লিখে নিয়ে আপনার হাসপাতালে শিশু-বিভাগে একটা ক্যাবিনে একটা আগেকার তারিখ দিয়ে ভর্তি ক'রে নিন। আর তাদের খবর দিন এই ব'লে যে, তারা শিশুকে ভর্তি ক'রে দিয়ে আর কোন খোঁজ করছে না কেন? তাতে আপনার চিকিৎসায় ওরও বাঁচবার উপায় হবে, কি বলেন?

সীমার ব্যবস্থায় তার প্রতি নিখিলের প্রশংসমান চিত্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল; বললে, সত্যি তোমার তুলনা নেই। এই প্রশংসার লজ্জায় এবং একটা অপরিচিত তৃপ্তিতে সীমার মনটা ভ'রে গেল।

ঘটনাটি মাসখানেক পূর্বের। ইতিমধ্যে রঙ্গলালের ব্যবহারে অবশ্য কোন বিচ্যুতি ঘটে নি। সামরিক নিয়মে রঙ্গলাল নিজের কাজ ক'রে যায়। সীমার সঙ্গেও ব্যবহারে তার আর কোন কঠিন ঋজুতা নেই। সীমা ব্যাপারটা ভুলে যায় নি। সে সতর্কই ছিল। কলকাতা ত্যাগ করবার পূর্বের সন্ধ্যাবেলা সেই বালকটি হঠাৎ এসে একটা প্রণাম ক'রে সলজ্জভাবে তাড়াতাড়ি একটি ছোট চিঠি তার হাতে দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। ছেলেটি সীমাকে ভক্তি করত। সেই কাগজখণ্ডে 'প্রধানে'র সম্বন্ধে সাবধান হতে সনির্বন্ধ অনুনয় ছিল। সেইটুকু প'ড়ে সীমার মুখে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠল। সে উঠে গিয়ে কাগজটার অগ্নিসৎকার করলে।

নিখিলের দুশ্চিন্তার আর একটা গুরুতর কারণ ছিল। শিকারের গন্ধ পেলে হাউণ্ডের মুখের ভাবখানা যেমন হয়, ভুলু দত্তের মুখের ভাবখানা প্রায় তারই অনুরূপ হয়ে উঠেছে আজ ক'দিন। আগেকার মত বেশি কথা আর সে কয় না, মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ে, যেন কোন বিশেষ সমস্যার এক-একটা সমাধান তার মনে মনে হচ্ছে। বন্ধু-বান্ধবকে আর তেমন হৃদ্যতার সঙ্গে ব্যাপকভাবে আদর-আপ্যায়ন করে না। লোক এলে তাড়াতাড়ি বিদায় ক'রে দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়। আবার অধিকাংশ সময় তাকে বাড়িতেও পাওয়া যায় না।

এক নিখিলের সঙ্গে ব্যবহারে ভুলু দত্তের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। টেররিজ্‌মের প্রতি নিখিলের নিদারুণ বিরুদ্ধতা এবং অসহিষ্ণুতা ক্রমে ভুলু দত্তের মনেও একটা বিশ্বাস, এমন কি তার উত্তেজনার প্রতি একটু কৌতুকের ভাবই এনে দিয়েছিল। বস্তুত টেররিজ্‌ম সম্বন্ধে ভুলু দত্তের মনে নিখিলের মত বিশেষ কোন উত্তেজনাই ছিল না, থাকার কথাও নয়। টেররিস্ট্‌দের কার্যকলাপ গতিবিধি নিয়েই ভুলু দত্তের সমস্ত মনের এবং ক্ষমতার প্রেরণা নিযুক্ত ছিল। টেররিজ্‌মের নৈতিক দিক সম্বন্ধে তার কোন মাথাব্যথা ছিল না। সুতরাং দিনের পর দিন নিখিলের অসহিষ্ণু উত্তেজনার সূত্রে সে নিজের চেয়েও নিখিলকে টেররিজ্‌মের ঘোরতর শত্রু ব'লে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিল। নিখিল যে খাঁটি লোক—এ বিশ্বাস তখনকার দিনে তার দলের সকলেরই ছিল; এবং এবারকার পরিচয়েও ভুলু দত্তের মনে সে মতের কোন পরিবর্তন হয় নি। বিশ্বাসঘাতকতা তার দ্বারা যে সম্ভব নয়, এ ধারণা তার মনে বদ্ধমূল ছিল। সুতরাং নিজের কাজকর্ম কৃতিত্ব নিয়ে অল্পস্বল্প গর্ব করা নিখিলের কাছে বিপজ্জনক ব'লে তার মনে হ'ত না। শুধু মাঝে মাঝে অভ্যাসমত বলত, দেখো ভাই, কোথাও গল্প ক'রে আমার হাতে হাতকড়ি দিয়ে অন্নটি মেরো না।

৪৬

পার্বতীর সঙ্গে দু'দিন কথাবার্তা ব'লে এবং তাঁর মতামতের আভাস পেয়ে সীমা একটু নিরাশ হ'ল। যে ব্যক্তিত্বের খোঁজ পার্বতীর মধ্যে সে আশা করেছিল, পার্বতীর মধ্যে সেই তীব্র উত্তেজনাময় উগ্র ব্যক্তিত্বের প্রায় সম্পূর্ণ অভাব দেখে সে মনে মনে একটু তুচ্ছই করেছিল তাকে। পার্বতী বিনীতভাবে বললে, দেখুন, এই মহৎ প্রতিষ্ঠানের কোন কৃতিত্বই আমার প্রাপ্য নয়। আমি একজন কর্মচারী মাত্র। যাঁর প্রেরণায়, অর্থে এবং শক্তিতে এর প্রতিষ্ঠা, তাঁর নাম শচীন্দ্রনাথ সিংহ; তিনি এখানকার জমিদার। তিনি এখানে থাকেন না, মাঝে মাঝে পরিদর্শনে আসেন। সুতরাং আপনার যে নারী-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একে যুক্ত ক'রে একযোগে কাজ করবার প্রস্তাব করেছেন, তা কার্যে পরিণত করতে হ'লে আপনাকে তাঁরই সঙ্গে দেখা ক'রে সব বন্দোবস্ত ঠিক করতে হবে। ব'লে অল্পক্ষণ থেমে আবার বললে, তা ছাড়া আমি অন্তত যত দূর জানি, দেশের স্বাধীনতা-লাভের দিক থেকে চিন্তা ক'রে এই প্রতিষ্ঠানের কোন উদ্যোগ হয় নি। বাংলা দেশের নারীকে পরান্নপ্রত্যাশী পরমুখাপেক্ষী হয়ে জীবন কাটাতে হয়। বাঙালী মেয়ের সেই দুরবস্থার যদি কোন প্রতিকার করা যায়, সেই ভেবেই এই উদ্যোগটুকু করা। অন্য কোন মহত্তর বা বৃহত্তর গূঢ় উদ্দেশ্য এর মধ্যে আছে ব'লে তো আমার মনে হয় না।

পার্বতীর কথার মধ্যে একটু শ্লেষ কল্পনা ক'রে এবং দেশের সম্বন্ধে এমন উদাসীন উক্তিতে সীমা মনে মনে বিরক্ত হয়ে বললে, আপনার কাছেই শুনেছি যে আপনি বিলেতে মানুষ হয়েছেন, সুতরাং আপনি যে পরাধীন দেশে ভারতবাসী হয়ে জন্মেছেন, তা ভুলে যাওয়া অসম্ভব নয়। আপনার কথা না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু দু-এক বছর

বিলেতী জমি মাড়িয়ে এসে শচীনবাবু কি তাঁর ভারতীয় চর্ম বদলে এসেছেন না কি যে, দেশের পরাধীনতার চিন্তা তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে উঠবে? আমাদের দেশের যে-কোন মঙ্গল কাজ, যে-কোন প্রতিষ্ঠান, দেশের মুক্তি কামনা ক'রে না করলে আমার তো মনে হয় সবই বৃথা। কাজ যত বড়, শক্তির অপব্যয়ও তত বেশি। নয় কি?

পার্বতী স্থির হয়ে সীমার মুখের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বললে, তা কেন হবে বলুন তো? মঙ্গল কাজ তো তাই যাতে লোকের ভাল হয়। সুতরাং সে আপনি দেশের মুক্তি কামনা ক'রেই করুন আর যা কামনা ক'রেই করুন, তাতে যদি মানুষের মঙ্গল হয় তবে শক্তির অপব্যয় কেন হবে বলছেন ঠিক বুঝলাম না।

সীমা বললে, সে হয়তো বোঝানো আপনাকে সম্ভব হবে না। তবু ভেবে দেখুন, আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তির মূলধন অল্পই। সুতরাং আমাদের সমগ্র শক্তিকে যদি স্বাধীনতাসূত্রে না গাঁথতে পারি, আমাদের সমগ্র চিত্তকে একমাত্র সেই চিন্তায় পূর্ণ ক'রে না তুলতে পারি, তবে আমাদের স্বল্পাবশিষ্ট প্রাণশক্তি ক্ষুদ্রতর মঙ্গল কাজের মধ্যে নিশ্চিহ্নে হারিয়ে যাবে—স্বাধীনতা এবং দেশের বিরাট বৃহত্তর ভবিষ্যৎ সুদূরপরাহত হয়ে উঠবে। অমনিতেই আমাদের অলস দুঃখভীত চিত্ত স্বাধীনতালাভ-চেষ্টার দুঃখ ও ত্যাগকে বরণ করবার আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত। তাই সে দেশের আপাত দুঃখ মোচনের ক্ষুদ্রতর তথাকথিত স্বদেশহিতৈষণার আশ্রয়ে নিজেকে এবং অপরকে ভুলিয়ে রেখে নিরাপদ হতে চায়। সেই নিরাপদ নীড় সে বেঁধেছে আজ বিদেশীর খাঁচায়—

সেখানে আকাশের মুক্তি নেই। সেখানে তার ভোজ্য পরের উদ্বৃত্ত ভোজ্যের উচ্ছিষ্ট মাত্র। কিন্তু এসব কথার মূল্য আপনার কাছে কিই বা? আপনাকে মিছে বিরক্ত করছি।

কথার খোঁচায় পার্বতী কিছুমাত্র উষ্মা প্রকাশ না ক'রে শান্ত কণ্ঠে বললে, দেশকে আপনি ভালবাসেন; তাকে স্বাধীন করতে চান, আপনার এই কথাগুলি সত্যিই আমার ভাল লেগেছে, স্বাধীন দেশে মানুষ হবার গুণেই বোধ হয়। আমি জানি কোন ইংরেজই আপনার এই সেন্টিমেণ্টকে তুচ্ছ করবে না। তবে দেশের কথা বলছেন যে, সেটা কোন্ দেশ, বাংলা, না ভারতবর্ষ? তা আমি ঠিক জানি না—ও-কথা ভাবিও নি কখনও। দেশকে আমিও একরকম ক'রে ভালবাসি, সে আমার মাকে ভালবাসি ব'লে। আমার কাছে দেশের মূল্য মায়ের বাংলা দেশ ব'লে—যেখানকার শ্যামলতা ও সরসতা নিয়ে আমার মা সমস্ত প্রাণ দিয়ে আমাকে ভালবেসেও আমার জীবনে তাঁর ইচ্ছাকে সার্থক ক'রে তুলতে পারেন নি। যেখানকার পুরুষ তার নারীকে মানুষের অধিকার থেকে তিলে তিলে বঞ্চিত ক'রে, সবলে দেবী বানিয়ে তোলবার মূঢ় গর্বে নিষ্ঠুর; যেখানে লক্ষ মায়ের চোখের জল দিনের পর দিন মাটিতে মিশেছে সেই বাংলা দেশকে আমি ভালবাসি। নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার বলে সেই বাংলা দেশকে যদি নারীনির্যাতনের পাপ থেকে একটুও মুক্ত করতে পারি, নিজেকে ধন্য মনে করব। সেই সামান্য উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানের সেবায় আমি যোগ দিয়েছি। আপাতত এর চেয়ে বড় মুক্তির কথা আমি ভাবি না। আপনি বলেছেন বটে, কিন্তু সমস্ত ভারতটাকে দেশ ভেবে সেই দেশের স্বাধীনতার রূপ এখনকার অবস্থায় কিছুতেই স্পষ্ট ক'রে ভেবে উঠতে পারছি নে। তা ছাড়া পোলিটিক্যাল ইম্যানসিপেশন ইত্যাদির কথা

আমার কখনও মনে হয় নি। আপনি বরং শচীনবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে এসব কথা বলুন, দেখুন তিনি কি বলেন।

সীমা পার্বতী সম্বন্ধে মনে মনে হতাশ হয়ে বললে, আপনার পূর্ব-জীবন যেমন ভাবে কেটেছে বলছেন, তাতে আপনার নিজের দেশের স্বাধীনতার সম্বন্ধে দরদ হওয়ার কথা নয়। সে যাই হোক গে, শচীনবাবুর ঠিকানাটা যদি—

তাঁর বর্তমান ঠিকানা তো ঠিক জানি না। তারপর একটু ভেবে বললে, আচ্ছা, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। ব'লে সে বেরিয়ে ভোলানাথের কাছে গেল।

পার্বতীর মনের অন্তরালে শচীনের সঙ্গে দেখা করবার বাসনা অনেক দিন থেকেই প্রচ্ছন্ন ছিল। ভাবলে, এই মেয়েটির সঙ্গে গেলে মন্দ হয় না। মেয়েটির প্রস্তাবের আলোচনায় আমাকেও তো দরকার হবে। মেয়েটির কথাবার্তায় তাকে অত্যন্ত আন্‌প্র্যাক্‌টিক্যাল অব্যাপারী ব'লে পার্বতীর মনে হয়েছিল—এবং তার স্নেহের প্রতিষ্ঠানটিকে ওর সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেবার প্রস্তাব পার্বতীর ভাল লাগে নি। মনে মনে ভাবলে, দু মাস এলেন না। কোথায় একলা একলা ঘুরে অসুস্থ হয়ে পড়বেন হয়তো। তারই কথায় যে এমনটি ঘটেছে, এই কথা মনে ক'রে অনুতপ্ত হয়ে সে মনে মনে বললে, না; এর একটা বিহিত ক'রে ফেলতেই হবে।

শচীন্দ্রের মায়ের কাছ থেকে যদি কোন ঠিকানা পাওয়া যায়—এই আশায় ভোলানাথকে গিয়ে বললে, ভোলাদা, একটা নৌকা ঠিক ক'রে দিতে পার?

কেন দিদিমণি, বেড়াতে যাবে?

না, তোমাদের দেশে যাব। নৌকায় কতক্ষণ লাগবে বল তো?

তা বাতাস পেলে একদিনেই যেতে পারে ওতরবাড়ি। সেখান

থেকে সিংযোড় রেলে এক ঘণ্টা। আর সিংযোড় ইষ্টিশন থেকে বল্লভপুর এক পো পথ।

তোমায় কিন্তু এখানে কদিন থাকতে হবে। সব দেখবে শুনবে। পারবে তো?

তা খুব পারব। সে তোমায় ভাবতে হবে না।

আচ্ছা ভোলাদা, এলাহাবাদে যেখানে ছিলে সে জায়গাটার নাম জান?

তা তো মনে নেই দিদিমণি। যোমনোর ধারে 'রাণী কুঠি' বললেই নে যাবে এখন। সামনেই যোমনোর ওপর একটা ভাঙা ইটের বাঁধানো মত আছে। ত্রিবেণী থেকে বেশি দূর নয়।

আচ্ছা যাও, নৌকা ঠিক কর গে। দুপুরে খেয়ে দেয়ে বেরুব।

তাড়াতাড়ি ক'রে কয়েক দিনের জন্যে সমস্ত বন্দোবস্ত ক'রে সীমাকে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল।

পরদিন সীমা ও পার্বতী যখন শচীন্দ্রের গ্রামে গিয়ে পৌঁছল, তখন রাত ন-টা। ম্যানেজার অত্যন্ত সমাদরে পার্বতী ও তার সঙ্গিনীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। তার পরদিন ঘুরে ঘুরে শচীন্দ্রের প্রকাণ্ড অট্টালিকা তার বিপুল ঐশ্বর্যের বিচিত্র রূপ সমস্ত দেখাতে এবং গল্প করতে লাগলেন। পার্বতীর মনে থেকে থেকে একটা অস্পষ্ট বেদনা জেগে উঠছে। শচীন্দ্র তার এই সুখসমৃদ্ধির সহজ আরাম পরিত্যাগ ক'রে তারই জন্য আজ গৃহত্যাগী। তাকে তার স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে এনে আবার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ তো তারই কাজ। এই সব চিন্তায় অন্যমনস্ক রয়েছে সে; সীমাও নির্বাক বিস্ময়ে শচীন্দ্রের এই ঐশ্বর্যের পরিমাণ অনুমান করবার চেষ্টা করছে। ধীরে ধীরে তার মনে এই বিত্তশালী পুরুষটিকে করতলগত করবার বাসনা জেগে উঠছে। শচীন্দ্রকে যদি কোন মতে তার পথের পথিক করা যায়। ভাবে, মন

যার পরের জন্য কাঁদে দেশের ক্রন্দন তার কানে নিশ্চয় পৌঁছবে, নিশ্চয়, নিশ্চয়। আবার মনে হয়, যদি সে অন্য দশ জন জমিদারের মত বিলাসী অপদার্থ হয়, যদি ভীরু হয়।, যদি ইংরেজের প্রসাদজীবী হয়। মন তার জ্ব'লে ওঠে, রঙ্গলালের কথা মনে হয়। ভাবে, তবে রঙ্গদার বড় শিকার জুটবে—উঃ, কি খুশিই হবে সে! ভাবতে ভাবতে ঠিক করে, সে কলকাতায় গিয়ে সব বন্দোবস্ত ক'রে তবে যাবে।

শচীন্দ্র সত্যই প্রয়াগে গিয়েছিল একাকী যাপন করবার জন্য, এবং যদিও ম্যানেজারের প্রতি হুকুম ছিল যে, কোন বিষয়কর্ম নিয়ে তাকে বিরক্ত করা না হয়, তবু পার্বতীর কাছে তার ঠিকানা গোপন করতে ম্যানেজার সাহস করে নি। কমলাপুরী ও পার্বতী সম্বন্ধে শচীন্দ্রনাথের মনোভাব ম্যানেজারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অগোচর ছিল না। ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে পরদিন সীমা ও পার্বতী রেলপথে কলকাতায় রওনা হয়ে গেল। কলকাতায় শচীন্দ্রের বাসার ঠিকানা পার্বতীর জানা ছিল। দুজনে প্রথমে সেখানেই গিয়ে উঠল। সীমা বললে, দেখুন, আজ রাত্রের ট্রেনেই আমরা রওনা হতে চাই, আপনি তৈরি থাকবেন। আমি এখন একটু কাজে বেরুব। সময়মত আপনি স্টেশনে যাবেন, সেখানেই আপনার সঙ্গে দেখা হবে। পার্বতী একটা নমস্কার ক'রে সীমাকে বিদায় দিলে। তার চিত্ত তখন নানা চিন্তায় আকুল। শচীন্দ্র এই বাড়িতে আজ অনুপস্থিত। সে আজ শচীন্দ্রের সত্তাকে তার সমস্ত অন্তর দিয়ে একবার অনুভব ক'রে নিতে চায়। সেখানে তৃতীয় ব্যক্তির অস্তিত্ব তার কাছে আনন্দদায়ক নয়।

সমস্ত দিন সে নিজেকে বিশ্রাম দিল না। শচীন্দ্রের বিশৃঙ্খল সংসার সে নিজের নৈপুণ্য দিয়ে সুন্দর মনোরম ক'রে তুলতে চায়, যেখানে এলে শচীন্দ্রের এতদিনকার লক্ষ্মীছাড়া শ্রীহীন জীবনটাকে সে তৃপ্তিদান করতে পারবে। বৈকালের দিকে কাজকর্ম সমাধা ক'রে সে শচীন্দ্রের শোবার

ঘরের নূতন সরঞ্জামগুলি তদারক করতে গেল। শচীন্দ্রের শয্যার পাশে তার দোলা-চেয়ারটিতে শুয়ে সে শ্রান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। উঠে বসল একটা দুঃস্বপ্নের আঘাতে ঘুম ভেঙে। স্বপ্নে দেখল, কমলা ফিরে এসেছে। কমলাপুরীর ঘাটের কাছে লঞ্চ প্রস্তুত, এখনই তাকে চ'লে যেতে হবে—তার মালপত্র সব তোলা হয়ে গেছে, অথচ কিছুতে শচীন্দ্রের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। যে লজ্জাহীনা, কমলার অনুপস্থিতিতে তার স্বামীকে গ্রাস করতে চেষ্টা করছে, তার কাছে শচীন্দ্রকে কমলা বিদায় নেবার ছলেও যেতে দেবে না। ঘুম ভেঙে পার্বতীর মনটা বিকল হয়ে গেল। যদিও স্বপ্ন, তবু এ কথা সে না ভেবে থাকতে পারল না যে, শচীন্দ্র বস্তুত কমলারই। ভোলানাথের উক্তি তার মনে পড়ল। তবে কেন সে শচীন্দ্রের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করতে প্রলুব্ধ করবে! এলাহাবাদে সে যাবে না। দেবে না সে শচীন্দ্রকে দুর্বল হতে—নিজের লোভকে মূঢ় প্রশ্রয়। কত সামান্য কাল্পনিক কারণে মানুষ নিজের মত বদলায়! যাবে না স্থির ক'রে চাকরকে দিয়ে সে সীমার কাছে স্টেশনে চিঠি পাঠিয়ে লিখল, বিশেষ কারণে আমার যাওয়া ঘ'টে উঠল না। আমাকে ক্ষমা করবেন।

ভৃত্যটি সকালে সীমাকে দেখেছিল, সুতরাং পার্বতীর নির্দেশমত স্টেশনে সীমাকে খুঁজে বার করতে তার কষ্ট হয় নি।

৫০

সীমা যে কলকাতায় ফিরেছে—এ কথা নারী-ভবনে প্রকাশ করতে তার বাধা ছিল। তাই সে সোজা রঙ্গলালের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলে নিজেদের আস্তানায়।

রঙ্গলাল সীমার কথা শুনে লাফিয়ে উঠল, বললে, দরকার কি আর ঘোর-প্যাঁচ খেলে! ওসব ভুঁড়ো-প্লেট জমিদার তোমার ওসব কথায়

রাজি হবে না। ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের তাঁবেদারিতে জমিদারি বাঁচিয়ে তাদের খেতে হবে তো? রেভল্যুশনারি হ'লে তাদের চলবে কেন? ড্যাম ইট; তার চেয়ে একেবারে এলাহাবাদ থেকে তাকে কিড্ন্যাপ ক'রে আনা যাক—কি বল?

সীমা বললে, রঙ্গদা, তোমার দুঃসাহস যতখানি বুদ্ধি যদি ততটা খেলত, তবে এই বিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে তোমার জুড়ি মিলত না। লোকটাকে আমি কলকাতায় এনে ফেলি। তখন তোমার ট্যাক্সির সাহায্যে তোমার খাঁচায় এনে পোরা শক্ত হবে না। একেবারে হাওড়া স্টেশন থেকে দমদমার বাগানে—বুঝলে কিনা! আজ বুধবার, শুক্রে আর শনিবার সন্ধ্যার সময় হাবড়া স্টেশনে প্রস্তুত থেকো।

আহতপুচ্ছ রঙ্গলাল মনে মনে ক্রোধ পরিপাক ক'রে চ'লে গেল। সীমার নিয়ত শ্লেষ তার আর সহ্য হচ্ছিল না। সীমার কর্তৃত্বে নরহত্যার উত্তেজনা নেই, বিপদের সন্ধান নেই, মাত্র নির্জীব নিয়মের অধীনে সুদূর ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সুযোগের অপেক্ষায় নীরবে কাজ ক'রে চলায় তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে এসেছিল। দুর্দান্ত দুর্ধর্ষ একটা কিছু ক'রে ফেলবার তাড়নায় তার চিত্ত নিজের বাইরের পরিবেষ্টনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। ধর্মজ্ঞান ব'লে কোন বালাই তার বড় একটা ছিল না। সীমার অনুপস্থিতিতে সে কি করবে, তার একটা প্ল্যান মনে মনে ছকে নিয়ে সীমাকে বললে, বেশ কথা, আমি এদিকে সব ঠিকঠাক ক'রে রাখব; কেবল আসবার আগে একটা খবর দিও।

৫১

নন্দলাল প্রাণপণে তার সংসারযাত্রায় পরিপূর্ণ আগ্রহ ও একাগ্রতার অভিনয় ক'রে চলেছিল, তবু মন তার সুস্থ ছিল না। জ্যোৎস্নার সম্বন্ধে তার মতিচ্ছন্ন চিত্ত কিছুদিনের মধ্যেই আবার তাকে বিভ্রান্ত ক'রে

তুললে। হতভাগা ডাক্তার যে জ্যোৎস্নাকে তার কাছ থেকে এমন ক'রে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের আয়ত্তের মধ্যে একেবারে নিরুদ্দেশ ক'রে ফেলবে—এ সে সহ্য করতে পারে না।

কিছুদিন সে অকারণে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরাঘুরি ক'রে নিজের মনকে বশে আনবার চেষ্টা করতে লাগল। একবার মনে করলে, মরুক গে ডাক্তার, আর এমন ক'রে অশান্তি ভোগ করা যায় না। কিন্তু 'মরুক গে' বললেই উদ্দাম বাসনাকে কিছু আর সংযত করা যায় না। তবু সে অনন্যোপায় হয়ে অর্থোপার্জনের দিকে প্রাণপণে নিজেকে নিযুক্ত করতে লাগল। নাওয়া-খাওয়ার সময়ের আর কোন স্থিরতা রইল না। প্রতিদিন রাত্রে ফিরে নিতান্ত শ্রান্ত নির্জীব হয়ে সে রাত্রে শয্যার আশ্রয় নিত। শ্রান্ত চোখে নিদ্রা আসতে বিলম্ব হ'ত না এবং প্রাতঃকালে উঠেই আবার ব্যবসা-সংক্রান্ত নানা জটিল ব্যাপারে নিজেকে ব্যাপৃত ক'রে তোলবার অসাধ্য সাধনে সময় ও শরীরকে সে ক্ষয় করতে লাগল।

এমন সময় একদিন সন্ধ্যাবেলা হাসপাতালের পরিচিত দরোয়ানের সঙ্গে বাড়ির দরজায় তার সাক্ষাৎ হ'ল। জ্যোৎস্নার নামে মালতীর একখানা চিঠি নিয়ে সে বেরিয়ে যাচ্ছিল। তাকে দেখেই নন্দলালের মনে একটা কুটিল সন্দেহপূর্ণ আশার সঞ্চার হ'ল। নিতান্ত অকারণে যে হাসপাতালের দরোয়ানের তার গরিবখানায় আগমন সম্ভব নয়, এটুকু বুঝতে তার দেরি হয় নি। জ্যোৎস্নার কাছ থেকেই যে দরোয়ান এসেছে—এই কথা মনে ক'রে সে পরিচিত দরোয়ানকে নিতান্ত পুরাতন বন্ধুর মত প্রায় সমাদর ক'রে বললে, এই যে, এস দরোয়ানজী। ভাল তো সব? তোমাদের ওদিকে অনেক দিন যেতে পারি নি। তার পর আছ কেমন?

দরোয়ান অত্যন্ত আপ্যায়িত হয়ে কুশল প্রত্যভিবাদন করলে।

নন্দ নিতান্ত ভালমানুষের মত বললে, আরে একটু ব'স দরোয়ানজী। তোমার একটা বড় বকশিশ পাওনা আছে; যাই না ব'লে দেওয়াই হয় নি। নিয়ে যাও আজ।

একগাল হেসে দরোয়ান বললে, হুজুর মা বাপ, আপনাদের পরবস্তিতেই গরিব বেঁচে আছে। ইত্যাদি বলতে বলতে বৈঠকখানার ঘরের মেঝেয় বসল।

প্রথম চেষ্টাতেই এতটা ফল পেয়ে খুশি হয়ে নন্দ তার হাতে একটা পাঁচ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বললে, পরবস্তি আর কি দরোয়ানজী, তোমারই ভরসাতে তো জ্যোৎস্না-মাইকে ওখানে রাখা। তা, মাই ভাল আছে তো?

মাইজী তো বাবু ওখানে থাকে না। সে একটা বোডিমে উঠে গেছে।

নন্দ তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললে, আরে হ্যাঁ, সে তো গেছেই, ওখানে পড়াশুনার অসুবিধা হয় কিনা তাই তাকে অন্য বোর্ডিঙে দিতে বলেছি। আমার আবার কাজকর্মের চাপে যাওয়া হয় না। বাড়িটার নম্বরও ছাই গেছি ভুলে, একখানা চিঠি দেব, তাও হয় না।

দেন না, আমাকে দিয়ে দেন, আমি পৌছে দেব।

না না, আজ মাইজী চিঠি দিয়েছে, আজ আর কাজ নেই। ঠিকানাটা এনে দিও, আর ভাল ক'রে দেখাশুনা ক'রো, তোমায় আরও ভাল ক'রে বকশিশ করব। পাস করলেই দোপাট্টা আর পাগড়ী পাবে।

হুঁজুর মা বাপ। কালই আপনাকে ঠিকানা এনে দেব।

বেশ বেশ। বুড়া হয়ে কিছু মনে থাকে না, বুঝলে এ বড় শরমের বাৎ।

দরোয়ান তাকে অভিবাদন ক'রে বিদায় নিলে।

ঠিকানা সংগ্রহ হওয়ার পর থেকে নন্দর আর স্বস্তি রইল না।

দুঃসাহসে ভর ক'রে সে যে নারী-ভবনে জ্যোৎস্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবে তেমন সাহস সে সংগ্রহ ক'রে উঠতে পারে না, অথচ নিত্য সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে নারী-ভবনের আশেপাশে ঘুরে বেড়াবার নেশায় তাকে পেয়ে বসল। নারী-ভবনের একটা জানালায় একদিন কমলাকে দেখে তার নেশা আরও বেড়ে গেল। মোহগ্রস্ত 'মেহের আলি'র মত সে যেন নারী-ভবনের 'ক্ষুদিত পাষাণে'র আকর্ষণ থেকে নিজেকে কিছুতেই দূরে রাখতে পারে না। কমলাকে অপহরণ করবার নানা অসম্ভব কল্পনায় সে প্রায় সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান হারিয়েছিল।

প্রত্যহই একটা লোককে সন্দেহজনকভাবে নারী-ভবনের আশে-পাশে ঘুরে বেড়াতে দেখে রঙ্গলালের অনুচরদের একজন আর এক-জনকে এ কথা জানালে। ক্রমে রঙ্গলালের কানেও কথাটা উঠল। দু-চার দিন পর্যবেক্ষণ ক'রে রঙ্গলালেরও লোকটাকে সুবিধের মনে হ'ল না। পুলিসের চর যে, সে বিষয়ে তার আর সন্দেহ রইল না। নন্দর উপর তারা কড়া নজর রাখতে লাগল।

ভবিতব্য কে খণ্ডাতে পারে! কমলাকে উদ্ধার করবার কোন উপায় চিন্তা ক'রে উঠতে না পেরে সে মনে মনে অস্থির হয়ে উঠল। এমনই ক'রে রাস্তায় রাস্তায় একটা স্ত্রীলোকের মোহে উন্মাদের মত ঘুরে বেড়ানোর গ্লানিও মনে সঞ্চিত হচ্ছিল তার। তবু নিজের মনকে ও নিজের অজ্ঞাতে মালতীকে কৈফিয়ৎ দেবার উদ্দেশে সে নিজেকে বুঝিয়েছিল, 'জ্যোৎস্নার অভিভাবক সে, জ্যোৎস্নাকে এমন ক'রে ভেসে যেতে দেবার তার কোন অধিকার নেই।' জ্যোৎস্নার প্রতি তার চিত্ত লোভাতুর—এ কথা সে মানতে চাইলে না। কোন এক সময়ের মোহের দুর্বলতার জন্য চিরকাল কি সে অমানুষ হয়ে আছে নাকি? কখনই না। মনে মনে বললে, জ্যোৎস্না সম্বন্ধে তার একটা দায়িত্বও তো আছে! ডাক্তার কে? কে বলতে পারে তার অতি ভদ্রতার আড়ালে

বদমতলব নেই। এই তো হাসপাতালের ডাক্তাররাই তো কত কি বলে ওর নামে! এমনি কিছু আর বলে না? হ্যাঁ, অমন সাধুগিরি ঢের দেখেছি! আরে, তুই কে রে বাবা যে, জ্যোৎস্নার জন্যে তোর এত মাথা ব্যথা? আর ছাড়া জ্যোৎস্নাই না হয় নির্বোধ। ওর মতলব কিছু বোঝে না; তাই ব'লে তাকে বাঁচানো তো তারই কাজ।

তার অন্তরের বাসনা তার কর্তব্যবোধের মহৎ প্রেরণা পেয়ে একেবারে উদ্দাম ক'রে তুললে তার চিত্ত ও চেষ্টাকে। সে যখন অভিভাবক, তখন সে পুলিসের সাহায্যে জ্যোৎস্নাকে উদ্ধার করবে না কেন! এই ভেবে সে একদিন উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে পুলিস-স্টেশনে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। কিন্তু সেখানে উপস্থিত হয়েই তার উৎসাহ এল জুড়িয়ে। যদি জ্যোৎস্না তার বিরুদ্ধে অত্যাচার করার পাল্টা নালিশ করে? পুলিসকে সে চিরদিনই ভয় ক'রে এসেছে। পুলিসের কাছে নালিশ জানালে ভোগান্তি তারও যে কিছু কম হবে না—এ কথা সে যতই চিন্তা করতে লাগল, উৎসাহ তার ততই এল ক'মে। তা ছাড়া, ব্যাপারটাকে এত প্রকাণ্ড ক'রে ফেলা তার 'সৎসাহসে' কুলচ্ছিল না। মালতী তার এই প্রচেষ্টার পশ্চাতে তার গোপন অভিসারের কাহিনী জানতে পারলে আর এক হাঙ্গামে তাকে পড়তে হবে, এবং তার অধুনা নিরাময় গৃহব্যবস্থার মধ্যে আবার একটা বিপ্লব উপস্থিত হবে। কোন দিকেই সে আর যেন কোন উপায় খুঁজে পায় না। চিন্তা করতে করতে মনে আর তার স্বস্তি নেই। পুলিসের কোন হাঙ্গামে নেমে পড়তে তার ভীরু মন সঙ্কুচিত হয়।

কোনও দিকে কোন উপায় না করতে পেরে তার চিরাভ্যস্ত গৃহানুগত ভদ্র অন্তঃকরণ আবার তাকে গৃহাভিমুখে ফিরিয়ে আনবার সুযোগ পেল। সে ভাবতে লাগল, কেন আমি আমার শান্ত নীড়টুকুর অন্তরালে মালতীর অকৃত্রিম স্নেহ সেবা যত্নে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে

পারব না! আমি ভদ্রসন্তান, কেন আমি বারংবার অভদ্র লোভে বিশ্বাসঘাতকের নীচতার মধ্যে নামতে চাচ্ছি! ছি ছি! এতটুকু সংযমে আমি নিজেকে যদি না বাঁধতে পারি, তবে মনুষ্যসমাজে আমার স্থান হওয়া উচিত নয়।

ভাবলে, ফিরে গিয়ে নিজেকে মালতীর সুনিশ্চিত স্নেহাশ্রয়ে সমর্পণ করি। জ্যোৎস্নার জন্য আমার চিত্তে যে-প্রেম, তা যেন আজ থেকে অহেতুকী হয়। তারই মঙ্গলের জন্য যেন সে প্রেমকে নিয়োজিত করতে পারি। ভাবতে ভাবতে সে ভাবের আবেগে নিজেকে যেন মার্টারের পংক্তিতে নিয়ে বসালে এবং নিজের প্রতি করুণা, এমন কি এক প্রকার শ্রদ্ধা তার মনে জেগে উঠল।

শ্রান্তচিত্তে সে বাড়ি ফিরে গেল এবং অনুতপ্ত মনের পুরস্কারস্বরূপ মালতীর কাছে অধিকতর স্নেহ করুণা এবং আদরের প্রার্থী হয়ে নিজেকে সমর্পণ করলে। রাত্রে মালতী উদ্বিগ্ন হয়ে শুধালে, কি গো, অমন করছ কেন? নন্দলাল তার জবাব না দিয়ে মালতীকে ঘনিষ্ঠতর আলিঙ্গনে আবদ্ধ ক'রে তার বুকে মাথা গুঁজে নীরবে অশ্রুবর্ষণ করতে লাগল।

এমনি ক'রে দিনের পর দিন যায়। রাত্রির পর রাত্রি কেটে যায় অনিদ্রায়, নিজের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে আর যেন পারে না সে। তবু নিজের বাসনার বিরুদ্ধে সংগ্রামের তার নিবৃত্তি নাই। দিনে রাত্রে নিখিলের কুমতলবের চিন্তা সে কিছুতেই মন থেকে দূর করতে পারে না। ভাবতে ভাবতে মাথা যেন খারাপ হয়ে যায়। এক দিন কর্মাবসানে সন্ধ্যায় গৃহপ্রত্যাগমনের পথে অভ্যাসমত জ্যোৎস্নার চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে পথ চলতে চলতে কখন এক সময় সে নারী-ভবনের পিছনে এসে উপস্থিত হয়েছিল, তা তার খেয়ালও ছিল না। যখনই খেয়াল হ'ল, তখনই নিজেকে সামলে নিয়ে ফিরবার জন্যে সে ঘুরে দাঁড়াল।

বাড়ির তলায় রকে ব'সে দুজন ঝাঁকামুটে গল্প করছিল। নন্দর মনে হ'ল, ওকে দেখে তারা যেন পরস্পরের দিকে চেয়ে কি একটা বললে। ভীরু নন্দ তাড়াতাড়ি ঘুরে বাড়ির অন্য দিকে রাস্তায় চ'লে গেল। এইদিকেই কমলার ঘরের সেই জানলাটা। জানলাটার দিকে আপনিই তার চোখ গেল। কেউই ছিল না জানলায় আজ। ভাবলে, কেউই তো নেই, তা হ'লে একটু দাঁড়াতে দোষ কি? কিন্তু পরক্ষণেই আবার জোর ক'রে নিজের মনকে শাসন ক'রে ফিরে যাবার জন্যে একপা একপা ক'রে এগোতে লাগল। চলতে চলতে সেই ল্যাম্প-পোস্টটার তলায় এসে দাঁড়িয়ে অভ্যাসমত আর একবার সে জানলার দিকে চাইলে। জানলায় কেউ নাই বটে, কিন্তু বাড়ির দরজায় ও কে! নিখিলনাথকে দরজায় প্রবেশ করতে দেখে বেচারার সমস্ত সঙ্কল্প, সমস্ত প্রাণপণ চেষ্টা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। পা আর চলতেই চাইল না। মাথায় হঠাৎ যেন আগুন ধ'রে গেল, রক্ত চনচন ক'রে উঠল। বাইরের সমস্ত জ্ঞান যেন মিলিয়ে গেল; কেবল ওই বদমায়েশ ডাক্তারটার—। আর সে ভাবতে পারছে না। ইচ্ছে হচ্ছে, একখানা ইট তুলে মারে সে ছুঁড়ে আজ ডাক্তারের মাথায়। কিন্তু হাতের কাছে মারবার মত ইট সে খুঁজে পেল না। কি করবে তার কোনও দিশা না পেয়ে পূর্বচিন্তানুযায়ী সে ছুটে চলল পুলিসের দরবারে। এবার কিন্তু আর কোনও বাধা, কোনও ভয় তার মনে রইল না।

প্রশ্ন করতে করতে দারোগাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কি চুরি গেছে বললেন?

আজ্ঞে, নিখিল ডাক্তার ভারি বদমায়েশ, তার মতলব ভাল নয়।

দারোগা ধমকে উঠল, মতলবের কথা কে শুনতে চাচ্ছে তোমার কাছে? সেসব আমরা বুঝব। কি চুরি গেছে তোমার বললে? বউ?

বউ? হ্যাঁ, না, ঠিক বউ নয়। মানে—নিখিল ডাক্তার বদমায়েশ লোক, তার মতলব—

চুপ কর। যা জিজ্ঞেস করছি, তার উত্তর দাও ঠিক ক'রে। বউ চুরি যায় নি তা হ'লে?

না।

তবে কি চুরি গেল?

মানে, নিখিল ডাক্তার বদমায়েশ, তার মতলব—

আবার, ফের আবোলতাবোল বকে! চুপ! কোথাকার পাগল এটা!

আজ্ঞে, নিখিল ডাক্তার ভারি বদমায়েশ, তার মতলব—

আরে! এ তেওয়ারী, ব্যাটাকে বাঁধকে হাজতমে ভরো তো।

নন্দ কিছুতেই ঠাওর করতে পারছে না যে তার বলার মধ্যে কোথায় গোলমাল হচ্ছে! তার কেবলই মনে হচ্ছে যে, সমস্ত দুনিয়া একজোট হয়ে জ্যোৎস্নাকে চুরি করবার ষড়যন্ত্র করছে। কি করবে সে! কি করবে! কিন্তু, তাকে যদি এখন বেঁধে হাজতে ভ'রে ফেলে! তা হ'লে? তা হ'লে জ্যোৎস্নাকে ডাক্তারের কবল থেকে বাঁচাবে কে?

যেমনি এই কথা মনে হওয়া অমনি পিছন ফিরে একছুটে সে দৌড়ে পালাল। পুলিসের দু-চারটে ছোকরা কন্‌স্টেব্‌ল, 'আরে বউরা হ্যায় রে, বউরা হ্যায়' ব'লে পিছনে তালি দিতে দিতে হৈ-হৈ ক'রে গেট পর্যন্ত এল। তাদের দেখাদেখি রাস্তার একপাল ছেলে তার পিছনে গেল লেগে। তখনও নন্দর শ্রান্ত মস্তিষ্কের মধ্যে একটা ক্ষীণ আভাসের মত তার বাড়ির কথা মনে ছিল—একটু ঘুমুতে পারলে—আঃ! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে হ'ল, জ্যোৎস্নার তা হ'লে কি হবে? নিখিল ডাক্তারের হাত থেকে কে বাঁচাবে? বদমায়েশ ডাক্তার, ওর মতলব ভাল নয়। মনে হতেই সে ফিরে ছুটল নারী-ভবনের দিকে। পথে কোঁচড় ভ'রে পাথর কুড়িয়ে নিতে নিতে চলল। পিছনে ছেলের পাল চলেছে হৈ-হৈ

করতে করতে। নারী-ভবনের সামনে এসেই সে চিৎকার ক'রে নিখিলকে গাল পাড়তে পাড়তে প্রাণপণে পাথর ছুঁড়তে শুরু করলে। ছেলেরাও হৈ-হৈ ক'রে উঠল। এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে সেই ঝাঁকামুটে দুজন এবং আরও চার-পাঁচজন লোক এসে নন্দকে ধ'রে ফেললে। একজন বললে, ওরে, এই সেই ব্যাটা। মার্ ব্যাটাকে। আর একজন বললে, পাগল রে, উন্মাদ পাগল। নন্দ প্রাণপণে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে আর গালাগালি করছে, শালা ডাক্তার! তোমায় না সাবড়েছি তো—ইত্যাদি। মুখ দিয়ে তার ফেনা উঠছে, চোখ দুটো লাল, ঠিকরে পড়বে যেন।

নিখিল নীচেই কমলার সঙ্গে কথা বলছিল। গোলমাল শুনে বেরিয়ে এসে কাণ্ড দেখে তো তার চক্ষুস্থির। বুঝতে কিছুই আর বাকি রইল না তার—নন্দলাল হঠাৎ উন্মাদ হয়ে গেছে। নারী-ভবনের রক্ষীদের সাহায্যে দুখানা গাড়ি ডাকিয়ে নন্দকে ধ'রে কমলাকে সঙ্গে নিয়ে সে নন্দর বাড়ি গেল। কমলা কাঁদতে লাগল। বললে, কি সর্বনাশী হয়েই জন্মেছিলাম আমি ডাক্তারবাবু—দিদিকে আমি কি ক'রে শান্ত করব। আমারই জন্যে তার সোনার সংসার পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

নন্দলালের অবস্থা দেখে মালতী হাউমাউ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে তার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল। ওগো, এ কি হ'ল; এ আমার কি সব্বনাশ হ'ল!

নন্দ শশব্যস্তে জিভ কেটে স'রে গেল। দূর থেকে গড় হয়ে একটা প্রণাম ক'রেই কেঁদে ফেলে বললে, রাণী রাসমণি! বাঁচাও আমাকে রাণীমা। আমার বউ চুরি গেছে হুজুর। ব'লে হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে লাগল।

নন্দকে পৌছে দিয়েই নিখিল কাছেই গিয়েছিল দোকান থেকে কয়েকটা আবশ্যক ওষুধ আনতে। ফিরে এসে রক্ষীদের সাহায্যে জোর

ক'রে স্নান করিয়ে ওষুধ খাইয়ে দিল। কমলাকে বললে, মালতীকে বুঝিয়ে বল, এখানে তো চিকিৎসা আর শুশ্রূষার সুবিধে হবে না, ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। কাল তোমরা দেখতে যেয়ো। বল, ততক্ষণে অনেকটা ভাল হয়ে যাবে।

ভাল হয়ে যাবে শুনে মালতী আর আপত্তি করলে না। নিখিল রক্ষীদের সাহায্যে তাকে তার পরিচিত একটা মেণ্টাল হাসপাতালে নিয়ে গেল।

৫২

অত্যন্ত দুশ্চিন্তার মধ্যে নিখিলনাথের সময় অতিবাহিত হতে লাগল। তার ভয় ছিল শুধু অনুপস্থিত সীমা সম্বন্ধে। এদের দলের অস্তিত্বের অনেকখানি সন্ধান যে ভুলু দত্তের আয়ত্তে এসেছে, তা সে স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিল। একটা অজানা ভয়ে সীমা সম্বন্ধে তার মনকে অত্যন্ত আতঙ্কিত ক'রে তুললে। কোন রকম কথাবার্তা পুলিসের কাছে না-বলতে কমলাকে অবশ্য সে সাবধান ক'রে দিয়েছিল। তবু তার মনে স্বস্তি রইল না। সীমার সাক্ষাৎ পাওয়া তার নিতান্ত আবশ্যক। সময়মত সীমাকে সাবধান ক'রে দেওয়ার জন্যে মন তার ব্যাকুল হয়ে উঠল; তা ছাড়া কমলাপুরীর সেই প্রতিষ্ঠাতা জমিদার ভদ্রলোকটির জন্যেও তার উৎকণ্ঠা কম ছিল না মনে। সীমার এই উৎসাহের অর্থ তার কাছে অজানা ছিল না। ভদ্রলোকটিকে গুম ক'রে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা এ ক্ষেত্রে যে অধিক সম্ভব, এ কথাও তার মনে হতে লাগল। কিন্তু এই ভদ্রলোকটিই যদি জ্যোৎস্নার স্বামী হয়! ভেবে দেখলে যে, তা নিতান্তই যে অসম্ভব তা নয়। কারণ, জ্যোৎস্নার মত সুন্দরী পত্নীর জন্যে তার স্বামী যে এই রকম একটা স্মৃতি-প্রতিষ্ঠান গড়বে, তা আর আশ্চর্য কি! এ কথা মনে হতেই জ্যোৎস্নার স্বামীর জন্যে সে অত্যন্ত উৎকণ্ঠা

অনুভব করতে লাগল ; এবং অনতিবিলম্বে কমলাপুরীতে যাওয়া ঠিক ক'রে সে শ্রান্তচিত্তে নিজের কামরায় ফিরে গেল।

রাত তখন প্রায় একটা। এমন সময় হাসপাতালে এমার্জেন্সি ঘরে নিখিলের জরুরী ডাক পড়ল। গিয়ে দেখে, একজন বাঙালী ইন্সপেক্টরকে কে বা কারা গুলি ক'রে হত্যা করার চেষ্টা করেছে। অবস্থা খারাপ। ভুলু দত্তর বাড়ি যাতায়াতের জন্য এই ইন্সপেক্টর মুখার্জির সঙ্গে নিখিলের পরিচয় ছিল। ইনিই সীমাদের মানুষ গুম করে টাকা লুঠ করার কার্যের অনুসন্ধানে লিপ্ত ছিলেন। সমস্ত রাত চেষ্টা ক'রেও নিখিল তার প্রাণ রক্ষা করতে পারলে না। তারই মৃত্যু-কালের জবানবন্দীতে রঙ্গলালকে হত্যাকারী ব'লে উল্লেখ করে।

রঙ্গলালের সঙ্গে সঙ্গে সীমারও যে সমূহ বিপদ, এটুকু ভেবে নিখিলের দুশ্চিন্তার আর সীমা রইল না। এবং আর কিছুমাত্র বিলম্ব করলেই যে সীমাকে তার নিশ্চিত মৃত্যু থেকে সে কোনমতেই রক্ষা করতে পারবে না—এ কথা মনে ক'রে পরদিন প্রত্যুষেই সে কমলাপুরী রওনা হয়ে গেল।

লঞ্চের সারেঙকে প্রশ্ন ক'রে সে বুঝতে পারলে যে, সীমা সত্যিই কমলাপুরী গিয়াছে এবং সেখান থেকে এখনও ফেরে নি। এইটুকু সংবাদে মন তার শান্ত হ'ল অনেকটা। আর কিছু না হোক, সীমাকে সে কলকাতায় ফেরবার পূর্বেই ধরতে পারবে। সীমাকে যে সে এই পন্থা থেকে নিরস্ত করতে পারবে, সে আশা তার মনে ছিল না। তবু আপাতবিপদ্‌সম্ভাবনার হাত থেকে বাঁচাতে পারলে ভবিষ্যতের সম্ভাবনার পথ মুক্ত থাকে—এই চিন্তা ক'রে সে নিজের চিত্তকে স্থির করতে চেষ্টা করতে লাগল।

কতকটা এই চিন্তার হাত থেকে নিস্তার পাবার আশায় এবং কতকটা কমলাপুরী এবং তার প্রতিষ্ঠাতা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করবার

আগ্রহে নিখিল সারেঙের সঙ্গে দিলে গল্প জুড়ে। অপ্রশস্ত রঙ্গিণী নদীর তীরে তীরে নিশ্চিন্ত আনন্দকলোচ্ছ্বাসপূর্ণ সহজ জীবনযাত্রার বিচিত্র লীলা তার চিত্তে কোলাহলমুখরিত নগরীর উদ্বেগ উত্তেজনাপূর্ণ জটিল ব্যর্থ অজস্রতার প্রতি একটা বিতৃষ্ণা জাগিয়ে তুলছিল। তার মনে হ'ল, মানবের মঙ্গলসাধনের উন্মাদ মোহের উন্মত্ত গতিবেগ থেকে যদি কোনমতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে এনে এই শান্ত স্নিগ্ধ নিশ্চিন্ত গ্রাম্য কুটিরের কোমল শীতল মাতৃক্রোড়ে স্থান লাভ করতে পারে; যেখানে একটিমাত্র বিক্ষুব্ধ হিংসাতপ্ত জর্জরিত জীবনকে সে আপনার স্নেহের আশ্রয়ে স্নিগ্ধ শান্ত পরিতৃপ্ত ক'রে নিজের অবখ্যাত অস্তিত্ব নিয়ে অনন্ত বিস্মৃতিসাগরের একটি বুদ্বুদের মত মিশিয়ে যেতে পারবে।

সারেঙ গল্প ক'রে চলেছিল মনের আনন্দে, তার মধ্যে অধিকাংশই তার আত্মকথা; তার জলচর-জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিস্ময়কর ইতিহাস। সত্যের চেয়ে রূপকথার সঙ্গেই তার সম্পর্ক অধিক। কিন্তু বহু আবৃত্তির ফলে তারও মনে সেগুলি বিশ্বাসের কেন্দ্রে স্থান পেয়েছে। সত্য-মিথ্যায় পূর্ণ তার এই সরল কাহিনী নিখিলের মনে আনন্দের সঞ্চার কম করে নি। মাঝে মাঝে তারিফ ক'রে, প্রশ্ন ক'রে গল্পের ধারাকে সে অক্ষুণ্ণ রাখলে।

আত্মকাহিনীর গতিবেগ মন্দ হয়ে এলে এক সময় নিখিল তাকে প্রশ্ন করলে, হ্যাঁ সাহেব, এই কমলাপুরীতে নাকি কোন পুরুষমানুষ নেই— সব নাকি মেয়েরা করে? সত্যি? কোন পুরুষ সেখানে যেতে পায় না?

সারেঙ প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বললে, উঁহু, একেবারে বাদশাহদের হারেমের মত। তুলনাটা অদ্ভুত, তবু কমলাপুরী সম্বন্ধে গর্ব করবার, ওর চেয়ে আর সম্মানজনক উপমা তার মনে ছিল না। তারপর একটু থেমে বললে, কেবল রাজাসাহেব মাসে একবার আসেন। তা হুজুর, সেই

তো বাদশাহ্। কথাটা বিসদৃশ, কিন্তু সে বেচারার মনে মনিবের পদমর্যাদার পরিমাণটা বোঝাবার আগ্রহও কম নয়।

তার কথায় হাসি পেলেও নিখিল গম্ভীর হয়েই শুনছিল। কৌতূহলও হ'ল তার, বললে, পার্বতী দেবী মালিক না ?

সারেঙ আবার উৎসাহের সহিত বললে, আলবৎ, ওই তো সব। রাজাসাহেব তো শুধু টাকা দিয়ে খালাস। তিনি জমিদার কিনা। পেল্লায় জমিদার সাহেব। গ্রামে তার হাতীঘোড়া, লোকলস্কর, সাত মহলা বাড়ি—বাড়ি তো নয়, একটা শহর।

বটে! তা নিজের গ্রামে এ সব না ক'রে এমন একটা জায়গায় এ সব কেন করলেন ?

তা কি জানি সাহেব! রাজা-রাজড়ার মর্জি। গ্রামে তো তিনি থাকেনই না। বেলাত থেকে আসার পর কলকাতাতেই থাকেন বেশি। সাহেব-লোকের কি আর গ্রাম ভাল লাগে! আর তা লাগবেই বা কি সাহেব, রাণীমা ছিল যেন 'বেহস্তর পরী'। অমন জরু গেলে লোকে গলায় দড়ি দেয়।

এবার নিখিল একটু হেসেই ফেললে। তারপর জিজ্ঞেস করলে, রাজার ছেলেপিলে নেই বুঝি ?

হায় আল্লা, ছেলেও তো ওই এক সাথে গেছে। কত তল্লাস হ'ল সাহেব; তা কারোরই খোঁজ মিলল না। ব'লে সারেঙ অত্যন্ত ব্যথিত হয়েই বোধ করি বাইরের দিকে চেয়ে চুপ করলে।

নিখিলনাথ এতক্ষণ অলস অবসর যাপন করবার আশায় শিথিল চিত্তে গল্প শুনছিল। হঠাৎ সে খাড়া হয়ে ব'সে সারেঙের হাত প্রায় চেপে ধরলে। এত বড় আশ্চর্য সংবাদ যে এই দুঃসময়ে তার কাছে এসে ধরা দেবে, তা যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। কিছুক্ষণের জন্যে সে কালকের দুর্ঘটনা, সীমার সর্বনাশ, ভবিষ্যতের দুর্ভাবনা সব ভুলে

গেল। সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলে, বল, বল সাহেব, বল তো ব্যাপারটা কি? তোমাদের রাণীমা আর তাঁর ছেলে কি হারিয়ে গেছে?

তার এই আগ্রহ এবং কৌতূহলে সারেঙ অত্যন্ত আশ্চর্য হ'ল, বিরক্তও হ'ল মনে মনে। এতখানি গল্প করার তার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু নিখিলনাথের স্বাভাবিক সৌজন্য এবং সহানুভূতির ছোঁয়া পেয়ে সেদিন গল্প করতে করতে তারও মনটা একটু অসাবধান হয়ে পড়েছিল। এখন সচেতন হয়ে সে মনে মনে চ'টে গেল। তার মনে হ'ল, ঘরের বউয়ের নিরুদ্দেশের সংবাদে কেমন যেন ইজ্জতের হানি হয়ে যাচ্ছে—প্রায় একটা বে-আবরু হওয়ার সামিল আর কি! হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সে বললে, অতশত জানি নে। হারিয়ে গেছে, না চোরে নেছে, তাতে আপনার আমার কি? আমার অনেক কাজ আছে সাহেব, তুমি আপনার কামরায় যাও। ব'লে হঠাৎ পিছন ফিরে সে চ'লে গেল।

নিখিল ব্যাপারটা বুঝলে। ঘরের গৃহিণী নিরুদ্দেশ হওয়া এই হতভাগা দেশে যে কত বড় দুর্নামের ব্যাপার, তা চিন্তা ক'রে তার মনটা অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হয়ে গেল। সত্যিই যদি জ্যোৎস্না তার স্বামীর কোন সন্ধান পায়ও, তা হ'লেও তার উপায় কি হবে!

একবার ভাবলে, নিতান্ত সেকেলে কন্‌সারভেটিব বুড়ো নয় বোধ হয়, বিলেত যেত না তা হ'লে। আবার মনে হ'ল, কোথাকার কে তার ঠিক নেই—আগে থাকতেই একটা যোগাযোগ ক'রে সমস্যার সমাধান করতে বসেছি! যাই হোক, এই সূত্রটুকুকে ছাড়া হবে না; ভাল ক'রে অনুসন্ধান ক'রে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে।

নানা চিন্তায় বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে পরদিন সকালে তারা কমলাপুরীর ঘাটে গিয়ে পৌঁছল। কমলাপুরী পৌঁছেই সে শুনতে পেল যে, পার্বতী দেবী আশ্রমে নেই। সম্প্রতি অবশ্য পার্বতী দেবীর অনুপস্থিতি সম্বন্ধে তার দুশ্চিন্তার কোন কারণ ছিল না। তাকে দেখবার

আগ্রহ থাকলেও আসল লোকটির সন্ধান এখনই তার পাওয়া দরকার। সুতরাং যে ভদ্রমহিলা পার্বতীর বদলে আশ্রমের কর্ণধাররূপে ছিলেন, অগত্যা তাঁর সঙ্গেই সাক্ষাৎ ক'রে সে সীমার সংবাদে আরও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। পার্বতীকে নিয়ে সীমা চ'লে গেছে, দুশ্চিন্তার কারণ বইকি!

একে তো সীমাকে কলকাতার দুর্ঘটনার কথা ব'লে তার গতিবিধি সম্বন্ধে সাবধান করবার অবসরই তার হ'ল না; তার উপর নারী-প্রতিষ্ঠানের অধিনেত্রীকে এই ক'দিনের আলাপে সে এমনভাবে আকর্ষণ কেমন ক'রে করতে সমর্থ হ'ল, যাতে তার সমস্ত পরিবেষ্টন থেকে মুক্ত ক'রে এমন অনায়াসে নিজের অনুসরণ করতে তাকে প্রলুব্ধ করলে! পার্বতী যে কিসের আকর্ষণে সীমার অনুসরণ করেছিল নিখিলনাথের তা জানবার সম্ভাবনা ছিল না; সুতরাং রুদ্রপন্থার অগ্নিমোহেই যে পার্বতীকে সীমা আকর্ষণ ক'রে নিয়ে গেছে, সেই কথা ভেবে সে সত্যই বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়ল। এতগুলি অল্পবয়সী নারীর সমগ্র ভবিষ্যৎ অচিরে তাণ্ডবের সর্বনাশে ধ্বংস হয়ে যাবে, অথচ একমাত্র সীমার মোহে এই দুর্গতি থেকে এদের সে বাঁচাতে পারছে না—এই মনে ক'রে অনুশোচনায় আবার তার চিত্ত পীড়িত হতে লাগল। মনে মনে কোন উপায় সে স্থির করতে পারলে না। কোন প্রকারে সীমাকে লুঠে নিয়ে সে যদি উধাও হতে পারে! ভারতবর্ষের বাইরে—জাভায় হোক, আফ্রিকায় হোক, বনে জঙ্গলে মরুভূমিতে, মনুষ্যবিহীন নির্জন দ্বীপে, যেখানে হোক, যদি পালাতে পারে! উঃ, সে আর ভাবতে পারে না। তার মনে হ'ল, এতগুলি জীবনের নিশ্চিত সর্বনাশের অভিশাপ তার উপর উদ্যত হয়ে উঠেছে। তার জীবনের সত্যব্রতের অগ্নিপরীক্ষায় সে একেবারেই অপদার্থ হয়ে রইল। যেমন ক'রেই হোক সীমাকে তার ধরাই চাই।

অন্তরের এই ঝঞ্ঝাকে অন্তরে অবরুদ্ধ রেখে সে উপনেত্রীকে জিজ্ঞেস করলে, দেখুন, অনিন্দিতা দেবীর আশ্রম থেকেই আমি আসছি। তাকে আমার বিশেষ দরকার। তাঁর বোর্ডিঙের একজন মেয়ের বাড়িতে ডাকাতি হয়ে তাঁর ভগ্নীপতিকে খুন করেছে। সেই সম্পর্কে অনিন্দিতা দেবীকে এখনই আবশ্যক। দয়া ক'রে তিনি কোথায় গেছেন—। নিখিলকে তার কথা শেষ করতে হ'ল না।

একটি বাঙালী মেয়ের কাছে অকস্মাৎ একটা খুনের কথা উল্লেখ করলে যে সে অভিভূত হয়ে পড়বে এবং অনেক অবান্তর প্রশ্নের বিড়ম্বনা থেকে সে বেঁচে যাবে এই উদ্দেশ্যে কথাটা সে বলেছিল। উদ্দেশ্য সফল হতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হ'ল না। কিন্তু সে অন্যভাবে।

ও মা গো, কি সর্বনাশ! খুন করেছ? কি ভয়ানক! চলুন, নিয়ে যাই আপনাকে। ভোলাদা, ও ভোলাদা! বিশেষ বিচলিত হয়ে সে ডাকাডাকি শুরু ক'রে দিলে। অল্প অনুসন্ধানের পর ভোলানাথকে তারা নদীর ধারে দেখতে পেল। নিখিল ভাবলে, 'ভোলাদা' 'ভোলাদা' এ নাম যেন কার কাছে শুনেছে। হঠাৎ তার মনে প'ড়ে গেল কমলার প্রলাপ—ভোলাদা, খোকনকে একটু ধর না!

আবার লঞ্চের সারেঙের কথাও মনে পড়ল। অত্যন্ত মনোযোগ-সহকারে সে শুভ্রকেশ সেই বৃদ্ধকে দেখতে লাগল। এই কয় বৎসরের মধ্যেই খোকনের শোকে এবং নানা চিন্তায় তার অনাগতপূর্ব বাধ ক্য তাকে এসে আক্রমণ করেছিল। তবু একটু নিরীক্ষণ ক'রে দেখলে, জ্যোৎস্নার কাছে শোনা তাদের ভৃত্যের বর্ণনার কিছু মেলে বইকি! এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও কতকটা আশার সঞ্চার তার মনের মধ্যে হতে লাগল। আশাতেই আশার বৃদ্ধি। তার মনে হ'ল যে, দুঃসময়ের দুর্গ্রহ যেন কেটে গেছে, যেন সৌভাগ্যের সূচনায় মন তার প্রসন্ন হয়ে উঠতে চাইছে। সীমা সম্বন্ধেও অকারণেই তার মনটা হাল্কা হয়ে উঠল।

ভোলানাথ কাছে আসতে-না-আসতেই সেই মেয়েটি চীৎকার ক'রে বলতে লাগল, ভোলাদা, শীগগির শীগগির এঁর যাওয়ার ব্যবস্থা কর। এঁর—

ভোলানাথ আশ্চর্য হয়ে বললে, বাবু তো এখুনি এলেন, তা যাওয়া তো সেই কাল ভোরের ইষ্টিমারে। তার আগে তো হবার জো নাই। তা দিদিমণি, বাবুরে খাওয়াও দাওয়াও, এখন যাবেন কেন?

আঃ, ভোলাদা, বুড়ো হয়ে তুমি বড় বেশি কথা বল। স্টীমারে যাবেন কেন? ওঁর বাড়িতে খুন হয়েছে যে, নৌকো—নৌকো ঠিক কর। উনি দিদিমণিদের কাছে যাবেন।

ভোলানাথ এসব কথার মাথামুণ্ডু কিছু ঠিক করতে না পেরে একবার নিখিলনাথের দিকে, একবার সেই ভদ্রমহিলার দিকে চেয়ে কোথাকার খুন এবং সেই খুনের সঙ্গে দিদিমণিদের পিছনে নৌকা নিয়ে ধাওয়া করার কি যোগ থাকতে পারে, তা ভেবে উঠতে পারলে না। নিখিল মহিলাটির এই স্নায়বিক উত্তেজনায় অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করতে লাগল। লজ্জিত ভাবে বললে, আপনি ব্যস্ত হবেন না। ভোলাদার সঙ্গে আমি সব ঠিক ক'রে নেব। নমস্কার। ব'লে আর পিছন না ফিরে ভোলানাথকে প্রায় টেনে নিয়ে চলল, ভোলাদা, চল, কথা বলি। ব'লে নদীর দিকে চ'লে গেল। কিছুমাত্র পরিচয় না থাকলেও এ ক্ষেত্রে ভোলানাথকে সঙ্কোচ করবার অবসরমাত্র দিল না। ভোলানাথ বললে, বাবু, আপনাকে তো আমি চিনি নে। আপনি নিশ্চয় ছোড়দিদিমণির (অর্থাৎ উক্ত মহিলাটির) কেউ হবেন। তা বাবু, আপনার বাড়ি কোথায়? খুন হলেন কেমন ক'রে?

নিখিল হেসে বললে, খুন-টুন হয় নি ভোলাদা। যে দিদিমণি পার্বতীর সঙ্গে গেছেন, তাঁর একজন আত্মীয়ের খুব অসুখ হয়েছে। তাই এখুনি তাঁর নাগাল পাওয়া চাই।

ও, তাই কও বাবু। তা দিদিমণিরা নৌকোয় গেছে বাবুর বাড়ি ; তা নৌকো ঠিক ক'রে দিচ্ছি।

নৌকায় ?—সে তো ভয়ানক দেরি হবে। অন্য কোন উপায় নেই ?

তা বাবু পায়ে হেঁটে যেতে পার তো তাড়াতাড়ি হতে পারে। পথ বেশি নয়। কোশ-দশেক হবে। সন্ধ্যে নাগাদ সিংযোড় ইষ্টিশানে পৌঁছবে। বল্লভপুর রাজবাড়ি সেখান থেকে পো'টেক পথ।

পায়ে হেঁটে খুব পারব। তুমি পথটা আমাকে একটু দেখিয়ে দিও, তা হ'লে আর ভাবনা থাকবে না।

নিখিলনাথের কথাবার্তায় ব্যবহারে ভোলানাথের তাকে বেশ ভালই লেগেছিল। লঞ্চে ফিরে সামান্য কিছু জলযোগ ক'রে নিয়ে নিখিল প্রস্তুত হয়ে ভোলানাথের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। পথ বলতে সেখানে কিছু নেই। মাইল চারেক পথ চষা মাঠের মধ্যে দিয়ে গিয়ে ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের রাস্তা পাওয়া যায়, সেই পর্যন্ত ভোলানাথ পৌঁছে দিয়ে এল।

পথে ভোলানাথের সঙ্গে গল্প করতে করতে নিখিল সব জেনে নিতে লাগল। গল্পে গল্পে ভোলানাথ বললে, তা বাবু, এত বড় জমিদারি, তা এর পর ভোগ করবে কে ? বাবু তো ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। কলকাতায় থাকে, মাসে এক দিন ওই কমলাপুরীতে যায়।

কেন, বাবু বাড়ি যান না ?

না বাবু, আগে যাও বা যেত, এখন আর দু বচ্ছর ওমুখো হয় না। আর পুরী তো খাঁ-খাঁ করছে, কার তরেই বা যাবে বল !

নিখিল জিজ্ঞেস করলে, কেন বাবুর ছেলেপিলে নেই ?

আর বাবু, ছেলে ! সোনার চাঁদ ছেলে ছিল, বুকে নিলে বুক জুড়িয়ে যায়। তা অদেষ্ট বাবু, কিছুই তো রইল না। বলতে বলতে ভোলানাথের চোখ ছলছল ক'রে উঠল।

লজ্জিত হয়ে নিখিল বললে, আহা! তা ভোলাদা, দুঃখ ক'রো না, মরা-বাঁচা তো কারুর হাত নয়।

ভোলানাথ বললে, ষাট, ষাট মরার কথা নয় বাবু, মরলে বরং সওয়া যায়। কোথায় যেন মিলিয়ে গেল বাবু। কত খুঁজলাম, তা আর পাওয়া গেল না। সেই থেকে বউমার শোকে বাবু কতদিন একেবারে পাগলপারা হয়ে রইল। তার পর বেলাত চ'লে গেল। ফিরে এসে বউমার নামে ওই কমলাপুরী করলে। সে আজ পাঁচ-ছয় বছর হতে চলল। এদ্দিন কি আর আছে বাবু? তা বাবুর মতিগতি খারাপ নয়। আর বে-থা করলে না। সেই মাঝে মাঝে প্রাগে গিয়ে থাকে। ওইখেনেই কুম্ভমেলায় বউমা হেরিয়ে যায় কিনা। এবারে কোথায় যে গেল, আমারে সঙ্গে নিলে না। কত বললুম, তা শুনলে না। গেছে ঐ প্রাগেই ঠিক। ব'লে দুজনেই অন্যমনস্কভাবে চিন্তামগ্ন হয়ে চলতে লাগল।

নিখিল আর কোন প্রশ্ন করলে না। তার মনে আর সংশয় বড় ছিল না। তার মনে জ্যোৎস্নার প্রলাপবাক্য ভেসে উঠল—উঃ, কত হাতী!

ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের রাস্তায় তুলে দিয়ে ভোলানাথ ফিরে গেল। চিন্তায় নিমগ্ন নিখিল পথশ্রমের কষ্ট সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে চলতে লাগল। তার মনে নূতন আশঙ্কা ঘনিয়ে উঠেছে। সীমা যে সম্প্রতি শচীন্দ্রনাথের অনুসন্ধানেই তার গ্রামে গিয়েছে, এ বিষয়ে তার আর সন্দেহমাত্র রইল না। এতে শচীন্দ্রের বিপদ কল্পনা ক'রে নিখিলের মন অত্যন্ত বিচলিত হ'ল। রঙ্গলালের কবলে পড়লে শচীন্দ্রনাথের যে কি পরিণাম হবে, সম্প্রতি ইন্‌স্‌পেক্টর হত্যার পর তা কল্পনা করতেও তার মন কণ্টকিত হয়ে উঠেছিল।

শচীন্দ্রনাথ যদি সত্যই জ্যোৎস্নার স্বামী হয় এবং তার সমূহ বিপদ

জেনেও যদি নিজের মোহের দুর্বলতায় তাকে সেই বিপদে রক্ষা করবার চেষ্টা সে না করে, তবে সে অসহায় জ্যোৎস্নার শুভানুধ্যায়ী সেজে তারই সর্বনাশের পথ পরিষ্কার করা সম্বন্ধে নন্দলালের চেয়ে কোন্ অংশে শ্রেষ্ঠ? চিন্তার বেগে তার চলার গতিও বেড়ে চলল। উত্তেজনার আবেগে সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে যে, যেমন ক'রেই হোক, সীমাকে সে নিবৃত্ত করবে—শচীন্দ্রের সর্বনাশ সে ঘটতে দেবে না।

সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়। বিস্তৃত প্রান্তরের প্রান্তসীমায় সূর্যাস্তের বর্ণচ্ছটায় দিক্‌চক্র অনুরঞ্জিত। শ্যামায়মান ব্যাপ্ত আকাশের তলে জনমানব-পরিশূন্য বিরাট প্রান্তরের মধ্যে দিশাহারা দীর্ঘপথ আশা-আনন্দ-আশ্রয়-বিহীন। মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড সূর্যতাপ আপনার অগ্নিদাহে যেন মূর্ছাতুর। ক্লান্ত চরণ আর চলতে চায় না। তবু তার বিশ্রাম করবার অবসর নেই। পথ এখনও মাইল চারেক বাকি।

স্টেশনে যখন সে পৌঁছল, একটা ট্রেন আসতে তখন আর বড় বিলম্ব নেই। ছোট স্টেশনটিতে তৈলাপচয়ের ভয়ে তখনও আলোগুলিকে সজীব ক'রে তোলা হয় নি। নিখিল সেই অন্ধকারপ্রায় প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে একটু চিন্তা ক'রে নিলে। তার মনে ভয় ছিল যে, সীমা সিংহযোড়ে না নেমে হয়তো সোজা কলকাতায় চ'লে গিয়েছে। খবরটা পাওয়া দরকার। সন্ধ্যাবেলায় যে দু-এক জন বৃদ্ধের পাশা খেলতে সেখানে সমাগম হয়, তারাও নিখিলের উপর সসম্ভ্রম দৃষ্টি রেখে ন'ড়ে-চ'ড়ে ভব্য হয়ে বসল। নিখিল সবিনয়ে তাদের নত হয়ে নমস্কার জানিয়ে একটু-আধটু খোঁজখবর নিতে লাগল। সাহেবের সমতুল্য একজনকে এমন বিনীত ঘরোয়া রকমের আলাপপরায়ণ দেখে মহা খুশি হয়ে বৃদ্ধরা গল্প জুড়ে দিলে।

নিখিলনাথ শচীন্দ্রের পরিচিত নয় জেনে তাদের রসনা চটুল হয়ে উঠল। বললে, হ্যাঁ, জমিদার ছিল বটে শচীন সিংহীর বাপ। তার

দাপটে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত। আর এ একটা মনুষ্য নয়। একটা বউ হারিয়ে যে পাগল হয়, সে আবার কি একটা মানুষ? বউ গেছে গেছে, তার হয়েছে কি? এত বড় জমিদারি, আবার বে-থা কর্, পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে খা। তা নয়, বিলেত গিয়ে খ্রীষ্টান হয়েছে। আবার শুনতে পাই, বিলেত থেকে একটা খ্রীষ্টান মাগী এনেছে, তাকে দিয়ে বিধবাদের সব খ্রীষ্টান করবার মতলব। শুনছি, তাকে নাকি বে করবে! ধর্ম আর রাখলে না!

নিখিল জিজ্ঞেস করলে, দেখেছেন তাকে?

দেখব না কেন? এই তো আর একটা মেয়ে নিয়ে সেদিন সিংযোড় গেল। কি মতলব, সেই জানে। আবার হয়তো কাকে ভোগা দিয়ে বার ক'রে এনেছে। নাঃ, জাত ধম্ম আর রাখলে না!

ট্রেন এসে পড়েছিল, সুতরাং কথাবার্তা আর চলল না। বৃদ্ধদ্বয়কে নমস্কার ক'রে নিখিল বেরিয়ে গেল।

জমিদার-বাড়ি যখন গিয়ে পৌঁছল, তখন রাত হয়েছে, গ্রামের পক্ষে তখন নিষুতি রাত। তার সেবা-যত্ন-খাতিরের ত্রুটি হ'ল না বটে, কিন্তু ম্যানেজারের শরীর অসুস্থ, তাঁর সাক্ষাৎ সে রাত্রে সে আর পেল না। পার্বতীরা যে কলকাতায় চ'লে গেছে—এ সংবাদ দরোয়ানের কাছেই জেনেছিল। ক্লান্ত দেহ এবং চিন্তাকুল চিত্তে সে সমস্ত রাত নির্জীব হয়ে প'ড়ে রইল বিছানায়। দুর্দৈব পদে পদে তাকে ব্যাহত করছে মনে ক'রে একটা দুর্দমনীয় সর্বনাশের আশঙ্কায় মনটা আচ্ছন্ন হয়ে রইল।

পরদিন সে কলকাতায় ফিরে গেল ভোরে উঠে।

অনেক চিন্তার পর, সমস্ত রাত অস্বস্তিতে কাটিয়ে অনুতাপের তাড়নায় অবশেষে ম্যানেজারকে শচীন্দ্র ও পার্বতীর বিপদের কথা জানিয়ে, স্টেশন থেকে এক চিঠি লিখে দিয়ে এসেছিল; এবং অবিলম্বে শচীন্দ্রের সংবাদ নেবার কথা বলেছিল সেই চিঠিতে।

নিজেরই নির্বুদ্ধিতায় মনিবের এই বিপদ ঘটেছে বুঝে, চতুর্দিকে টেলিগ্রাম ক'রে দিয়ে, ম্যানেজারও সেই দিনই রওনা হয়ে গেল কলকাতায়।

৫০

সীমা পার্বতীর চিঠি পেয়ে কিছু আশ্চর্য হ'ল। অকস্মাৎ এ মতি-পরিবর্তনের কারণ সাব্যস্ত করতে না পেরে তার মনে একটা অস্বস্তিকর সন্দেহ প্রথমে তাকে একটু বিচলিত করেছিল—পার্বতী কি কিছু সন্দেহ করেছে? ইতিমধ্যে তার সম্বন্ধে কোন তথ্য সংগ্রহ করেছে নাকি! অনেক চিন্তা ক'রেও তার কোন সঙ্গত কারণ স্থির করতে না পেরে ভাবলে, ও আমারই চোরের মন, তাই।

তবু ট্রেনে উঠে পার্বতী সম্বন্ধে চিন্তাই তাকে পেয়ে বসল। ট্রেনের অলস অবসরে, পার্বতীর মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে তার মনকে সে নিযুক্ত ক'রে রাখলে। যদিচ পার্বতীর বিপুল কর্মপ্রবাহের মধ্যে কোথাও সে শৃঙ্খলার অভাব এবং শৈথিল্য দেখতে পায় নি, তবু তার কথায়, তার প্রতি পদবিক্ষেপে, তার নিজের প্রতি ঔদাসীন্যে এমন একটা ক্লান্তি এবং অবসাদের আভাস পাওয়া যায় যে, এত বড় একটা প্রতিষ্ঠানের প্রাণদাত্রীর পক্ষে যা সম্পূর্ণ আশ্চর্য। যে উৎসাহের আগুন, আবেগের বাষ্প বুকের ভিতর জ'মে উঠলে পশ্চাতের বিপুল মৃতভারকে আনন্দময় গতি দান করা যায়, পার্বতীর মধ্যে সেই প্রেরণার বাষ্পাবেগ যেন শ্রান্ত হয়ে এসেছে। কিন্তু কেন? তার অত্যাচারপীড়িত মায়ের স্মৃতিমাত্র যদি তাকে এই নির্যাতিত বঙ্গবিধবাদের হিতসাধনে উৎসাহিত করত, তবে অকারণে তা নিষ্প্রভ হয়ে আসবার কারণ ঘটত না। তা ছাড়া যে শচীন্দ্রনাথের ইঙ্গিতে এই প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়, তার সামান্য ঠিকানা পর্যন্ত পার্বতীর জানা ছিল না, এ কেমন ব্যাপার! তার নিজের

প্রতি পার্বতীর হঠাৎ কোন সন্দেহ উপস্থিত হবার কারণ সে খুঁজে পেল না। ভাবলে, তা হ'লে শচীন্দ্রের কাছে যাওয়ার বাধা দেওয়ার কথাই সে সর্বাগ্রে বিবেচনা করত এবং কোন প্রকার ভদ্র আচরণ না ক'রে এবং পত্রে তার অক্ষমতা জ্ঞাপন নাকরে পুলিসের সাহায্যে সংবাদ দেওয়াই সে সহজ পন্থা ব'লে বিবেচনা করত। দ্বিতীয় কারণ হতে পারে যে, হঠাৎ কমলাপুরী থেকে তার জরুরী কাজের ডাক এসেছে। কিন্তু সে কথা সীমার কাছে গোপন করবার কোন কারণ নাই, সে অনায়াসেই তাকে লিখে পাঠাতে পারত; বিশেষত যখন সে শচীন্দ্রের কাছেই যাচ্ছে এবং কমলাপুরী সম্বন্ধে সংবাদ শচীন্দ্রের নিকট পাঠানো তার পক্ষে স্বাভাবিক। তা ছাড়া পার্বতী শচীন্দ্রের সন্ধান নিয়ে তার কাছে যেতে যেতে মধ্যপথ থেকে ফিরে গেল কমলাপুরীরই বিশেষ কাজে, এ কথা শচীন্দ্রের কাছে না-জানাবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। অর্থাৎ শচীন্দ্র যেমন তার কাছে আত্মগোপন ক'রে আছে, সেও তার এই অনুসন্ধানের অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত উৎসাহ গোপন করতেই চায়। পূর্বাপর চিন্তা ক'রে সে মনে মনে হেসে বললে, হুঁ। ব্যঙ্গপূর্ণ হাসিতে তার মুখটা ভ'রে উঠল। মনে মনে বললে, বাংলা দেশের এই সব নেড়ানেড়ীদের দিয়ে আবার দেশের স্বাধীনতা ফিরবে! ভাবলে, শচীন্দ্রকে দেশের কাজে ভজাবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম হবে। এদের কাছে রঙ্গলালকেও তার মানুষের মত মানুষ ব'লে মনে হ'ল,—রঙ্গলালের মধ্যে অন্তত এই রঙ্গ ক'রে বেড়াবার ছ্যাকামি নেই।

আসল কথা, নিখিলের প্রতি নিজের এই প্রকার সুকুমার মনোবৃত্তি অধুনা তার কঠোর চিত্তেও বোধ করি অন্তরে অন্তরে গোপনে দুর্বলতার সঞ্চার করছিল। নিজের সেই দুর্বলতার আভাসকে তীব্র ঘৃণায় অস্বীকার করবার উত্তেজনায় কাউকে সে শান্তভাবে সহজভাবে বিচার করবার ধৈর্য মনে মনে রক্ষা করতে পারছিল না। তার নিজের

চিত্তের সম্যক্‌জাগ্রত হৃদয়বেগের বিরুদ্ধে, নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে অন্তরে তার সংগ্রাম চলছিল, এবং সেই সংগ্রামে, তার মগ্ন-অন্তরে তার পরাজয়ের চেতনায় তাকে নিজের প্রতি এবং অপরের প্রতি নিষ্ঠুর ক'রে তুলেছিল।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে একখানি এক্কা ক'রে শচীন্দ্রের বাড়িতে গিয়ে যখন সে পৌঁছল, বেলা তখন প'ড়ে আসছে। ভগ্নপ্রাচীরবেষ্টিত নিস্তব্ধ বনাকীর্ণপ্রায় এই গৃহে প্রবেশ করতে সহসা সকলের সাহসে কুলত না। হঠাৎ দেখলে, বাড়িটিতে লোক আছে ব'লে ধারণাই হয় না। বাটির এক পাশের ঘর থেকে অল্প অল্প ধূমোদ্গীরণ-রেখা লক্ষ্য ক'রে সে গিয়ে ধীরে ধীরে কড়া নাড়া দিতে লাগল।

মিনিট পাঁচেক পরে দরজা খুলে একটি রুদ্রমূর্তি হিন্দুস্থানী মহারাজ (পাচক) 'কৌন্‌ হায় রে ?' ব'লে সীমাকে দেখে অপরাধ-ভয়েই হোক বা স্ত্রীলোক-জ্ঞানে সমীহ ক'রেই হোক, এমন বিমূঢ় হয়ে পড়ল যে, বাক্যব্যয়মাত্র না ক'রে পিছন ফিরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে ছাদে তার মনিবের কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। এবং অত্যন্ত উত্তেজিত সম্ভ্রমের সঙ্গে বলতে লাগল, মাইজী আয়ী হায় হুজুর! হামারা কুছ কসুর নহি হায়। ময়নে সোঁচা কি কোই বদমাস—

শচীন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠে বললে, মাইজি কি রে ? মাইজি কোত্থেকে এল ? হঠাৎ তার মনে হ'ল, মৃত কমলা তার ধ্যানলোক থেকে অকস্মাৎ এসে উপস্থিত হয়েছে; কিংবা কমলা কি জীবিত ? সে কি সত্যই ফিরতে পারে না ?

হাঁ হুজুর, মাইজি বেশক।

কি রকম দেখতে রে, খুব গোরা ?

হাঁ। নহি এতনা গোরা নাহি।

শচীন্দ্র বুঝতে পারলে—কমলা নয়। কমলা হওয়া সম্ভবও নয়।

যে মৃত তাকে জীবিত কল্পনা করার শিশুজনোচিত দুরাশা এখনও তাকে পরিত্যাগ করে নি মনে ক'রে তার হাসি পেল। মেয়েটি যে পার্বতী—এ বিষয়ে তার সন্দেহ রইল না এবং পার্বতীর স্নেহের এই নিদর্শনে তৎক্ষণাৎ মনটা তার কমলার চিন্তা থেকে পার্বতীর প্রতি আবেগে পূর্ণ হয়ে উঠল।

নীচে নেমে সে সীমাকে দেখবার পূর্বেই 'পার্বতী' ব'লে ডেকে বেরিয়ে এল এবং একজন অপরিচিত তরুণীকে দেখে অকস্মাৎ যেন ভদ্রতা করবার ভাষাও খুঁজে পেল না।

শচীন্দ্রকে বিব্রত হয়ে পড়তে দেখে সীমা বললে, আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় নেই, কিন্তু গত কয়েক দিন শুধু আপনার পরিচয়ই নিয়ে বেড়িয়েছি এবং অবশেষে আপনার গ্রামে গিয়ে আপনার ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে এখানে এসেছি। পার্বতী দেবীও আমার সঙ্গে আসতেন, কিন্তু কিছু বাধা পড়ায় তিনি আসতে পারেন নি। আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম। আপনার ঠিকানা সংগ্রহ করতে যে বেগ পেতে হয়েছে তাতেই বুঝছি, এমন নির্জনবাস আপনি ইচ্ছে ক'রে করেন নি এবং লোকে এখানেও আপনাকে এসে বিরক্ত করবে তা কখনই আপনি চান না।

শচীন্দ্র এই মেয়েটির অসময়ে অকস্মাৎ একাকী আগমনে সত্যই এমন বিস্মিত হয়েছিল যে, সহসা কি ভাবে তাকে সম্ভাষণ করবে ভেবে পাচ্ছিল না। সীমার বিরক্ত করার বারংবার উল্লেখে শচীন্দ্র লজ্জিত হয়ে বললে, না না, বিরক্ত কি, নির্জন বাস আমার একটা খেয়াল। আসুন ভিতরে, হাত মুখ ধুয়ে একটু চা-টা খান, তারপর কথা হবে। ছিঃ ছি, আপনাকে অকারণে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছি! ব'লে সীমার সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ ক'রে বলতে লাগল, কিন্তু এখানে আপনার খুব কষ্ট হবে। স্ত্রীলোক তো কেউ বাড়িতে নেই।

সীমা হেসে বললে, কেন! এই তো আমিই রয়েছি। অবিশ্যি যে-লোক সারা ভুবন ধাওয়া ক'রে আপনাকে এসে ধরেছে, তাকে স্ত্রীলোক বলতে আপনার রুচিতে বাধবে।

সীমার এই সহজ রহস্যালাপে সে খুশি হয়ে হেসে বললে, আপনার উত্তর শুনে আমার একটা গল্প মনে হ'ল। প্যারিসে একটা দোকানে লেখা ছিল, 'ইংলিশ ইজ স্পোকন হিয়ার'। এক ইংরেজ সফরী অর্থাৎ টুরিস্ট্ সেখানে গিয়ে যা বলে, তা কেউ বোঝে না; সে তো চ'টেই খুন—শেষে প্রপ্রাইটারের পরিচিত একজন ইংরেজীনবিস এলে সফরী বললে, এমন মিথ্যে কথা লিখে রাখার মানে কি? কেউ এখানে ইংরেজী বলে না, এমন কি বোঝেও না। তখন সেই ইংরেজী-জানা ফরাসী ভদ্রলোকটি হেসে বললে, কেন মসিয়ে, আপনি কি এখানে ইংরেজী বলছেন না। ইংরেজী এখানে বলা হয় ছাড়া আর তো কিছু লেখা হয় নি? ফরাসী জুয়াচুরির নমুনা দেখে ইংরেজটি তৎক্ষণাৎ ঘাড় ফিরিয়ে চ'টে চ'লে গেল।

তাই ব'লে আপনি ঘাড় ফিরিয়ে চ'লে যাবেন না। আপনাকে আমার বড্ড দরকার। না না, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি আপনার চাকরকে দিয়ে সব ঠিকঠাক করিয়ে নিচ্ছি। আপনি কিছুমাত্র ব্যস্ত হবেন না।

চাকরকে ডেকে 'মা-জীর' খিদ্‌মত্ করবার হুকুম দিয়ে সে ছাদে চ'লে গেল। সীমার এত সহজ সপ্রতিভ ভাবে তার মনটাও, কি জানি কেন, বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠল। পার্বতীর সংবাদের জন্য তার মনের মধ্যে চঞ্চলতা থাকলেও সে সম্প্রতি তা প্রকাশ করলে না।

কিন্তু শচীন্দ্র যে তাকে না দেখেই, নেপথ্য থেকে 'পার্বতী' ব'লে ডেকে এগিয়ে এসে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল, সীমার দৃষ্টি তা এড়িয়ে যায় নি। মনে মনে হেসে বললে, দুই আর দুইয়ে চারই তো হয়। আচ্ছা, দেখা যাক।

৫৪

সীমা ইচ্ছা ক'রেই প্রায়পরিচিত আত্মীয়ের মত সহজ নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার দিয়ে তার কাজ শুরু করেছিল। অল্প দু-এক দিনের মধ্যেই তার কার্য সাধন করতে হ'লে প্রথম থেকেই শচীন্দ্রের মনে আত্মীয়ের নিশ্চিন্ত সহজ বিশ্বাস উৎপাদন করা আবশ্যক। চাকর-বাকরের কাছে শচীন্দ্রের ছোট বোন ব'লে পরিচয় দিয়ে সে সহজেই তাদের আত্মীয়তা অর্জন ক'রে নিয়েছিল; এবং শচীন্দ্রের সন্তপ্ত চিত্তে এই প্রবাসে তার স্বচ্ছন্দ মনের স্নেহ-প্রভাব বিস্তার করতে তাকে বেশি বেগ পেতে হয় নি।

কলকাতায় তখন অনিন্দিতা দেবীর নাম একেবারে অপরিচিত ছিল না। এক সময় শচীন্দ্রের মনেও নারী-ভবনের কার্যকলাপ সম্বন্ধে কৌতূহল জেগেছিল। আজ সীমার সঙ্গে ব'সে তার নারী-ভবন সম্পর্কে সে বিস্তৃত আলোচনা শুরু ক'রে দিলে।

সীমা তার অভ্যাস এবং নিয়ম অনুসারে তার সমস্ত আলোচনাকে যেমন ভারতবর্ষের মুক্তির প্রসঙ্গে নিয়ে উপস্থিত করে, আজও তেমনি নিজেদের কার্যকলাপ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে বললে, কিন্তু এ-রকম কাজ হয়তো আরও দশজন বাংলা দেশে করছে, কিংবা এর চেয়েও অনেক বিস্তৃত সুব্যবস্থিত সুপরিচালিত নারী-প্রতিষ্ঠান হয়তো আরও গ'ড়ে উঠতে পারে, কিন্তু অধুনা ভারতবাসীর যেটা প্রধান কাম্য হওয়া উচিত, সেই স্বাধীনতার উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কাজকে নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা তাদের মধ্যে নেই। আপনার প্রতিষ্ঠিত কমলাপুরীর বিরাট ব্যবস্থার মধ্যেও সেই জিনিসটারই অভাব অনুভব ক'রে এসেছি। পার্বতী দেবীর তো ও-সম্বন্ধে কোনও উৎসাহই নেই, থাকার কথাও নয়। কিন্তু পরাধীন কোনও মানুষের মধ্যে এই

স্বাধীনতার প্রেরণাকে নিদ্রিত রেখে লোকশিক্ষা দেবার রীতিটা তো আমার মতে জীবনের মহত্তম উদ্দেশ্য থেকে বঞ্চিত ক'রে শুধু একটা বিলাসী স্বার্থপর জীব গ'ড়ে তোলারই ব্যবস্থা। এ বিষয়ে আপনার মতটা স্পষ্ট ক'রে জানতে চাই।

শচীন্দ্র হালকাভাবে হেসে বললে, যে মত নিজের কাছেই সুস্পষ্ট নয়, তাকে অন্যের কাছে বলতে গেলে অধিকাংশ বানিয়ে বলাই হয়। জানেন তো আমরা বাংলা দেশের জমিদার; দেশের সঙ্গে আমাদের যেটুকু সম্পর্ক সেটুকু জমিদারি-সংক্রান্ত। সেই জমিদারিটুকুকে রক্ষা করতে হ'লে আমাদের তাকিয়ে থাকতে হয় সূর্যাস্ত-আইনের দিকে। সেই আইনের হাতে আত্মরক্ষা করতে, যাদের দেশ বলেছেন, তাদেরই অস্থিপঞ্জর চূর্ণ না ক'রে আমাদের উপায় নেই। সুতরাং দেশের স্বাধীনতার কথা চিন্তা করবার মনোবৃত্তি কোন কালে আমাদের গ'ড়ে ওঠে না। ইংরেজী শিক্ষার ঢেউয়ে বড় জোর কেউ একটা হাই স্কুল, একটা চ্যারিটেব্‌ল ডিস্‌পেন্সারি, মেয়ে-স্কুল, এই সব ক'রেই বাহবা পেয়ে এসেছি। দেশের স্বাধীনতার কথা চিন্তা করতেও সর্বনাশের আতঙ্কে মনে মনে চ'টে উঠি। স্বাধীনতার কথা আমাদের ভাবতে নেই, ভিতরে ভিতরে এমনি একটা সংস্কার দাঁড়িয়ে গেছে। ভারতবর্ষের— স্বাধীনতা! ও দুটো পরস্পরবিরোধী কথা, কি বলেন, তাই না?

নিখিলনাথের সঙ্গে তর্কে সীমা যে রকম অধৈর্য হয়ে পড়ত, এ ক্ষেত্রে তা হবার কারণ ছিল না। নিখিলনাথের কাছে সে যে প্রকাণ্ড আশা নিয়ে উপস্থিত হ'ত, এখানে তার বিপরীত ধারণা নিয়েই সে শুরু করেছিল। তাই শচীন্দ্রের পরিহাস-ছলেও নিজেদের এই আত্মবিশ্লেষণে বরং একটু খুশিই হ'ল মনে মনে। শচীন্দ্রকে যতটা ইংরেজপদবিলেহী ঘৃতপুষ্ট অপদার্থ শ্রেণীর ব'লে সে ভেবেছিল, সে দেখলে যে ঠিক সে-শ্রেণীর জীব সে নয়। তা ছাড়া, বোধ করি অমায়িক প্রসন্ন আচরণে

শচীন্দ্রের বিশ্বাস এবং বন্ধুত্ব অর্জন করার আবশ্যকও তার ছিল। তাই সে আলোচনাটা অন্য রাস্তায় পরিচালিত করবার চেষ্টা করলে। বললে, কথাটা এক রকম আপনি ঠিকই বলেছেন। স্বাধীনতা আনতে গেলে আপাতবিশৃঙ্খলা এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-শান্তি-বিপর্যয়ের যে ছবি আমাদের চিত্তে জেগে ওঠে, আমাদের 'বোতাম-আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান, পোষমানা প্রাণে' তা ধারণা করতেও আমরা আতঙ্কিত না হয়ে থাকতে পারি না। তবু দেখুন, মানুষের মধ্যে স্বাধীনতা-প্রবৃত্তি এমনি স্বাভাবিক যে, ইচ্ছা ক'রেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক, যে-বিধবা-গুলির শিক্ষার ব্যবস্থা আপনি করছেন, তাদের মনে সেই পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করবার শক্তি দেবার জন্যেই তা করছেন। তাই আপনি আপনার সমস্ত শক্তি, সমস্ত অর্থ, সমস্ত চিন্তা আনন্দে নিয়োগ ক'রে চলেছেন। আপনি ঠিক পথই নিয়েছেন। যে স্বাধীনতার বীজ তাদের মধ্যে আপনি ছড়াচ্ছেন, একদিন তা—

শচীন্দ্র তার নিজের প্রশংসাতেই হোক বা তার কমলাপুরীর নিগূঢ় ব্যাখ্যাতেই হোক, একটু বিচলিত হয়ে বাধা দিয়ে সলজ্জ হেসে বললে, দেখুন, প্রশংসা শোনা পাপ, মিথ্যে প্রশংসা শোনা আরও পাপ। প্রথমত কমলাপুরী সম্বন্ধে কোন প্রশংসাই আমার প্রাপ্য নয়; এর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কৃতিত্ব পার্বতী দেবীর। তিনি লক্ষ বার প্রশংসা পাবার যোগ্য, তিল তিল ক'রে নিজেকে দান ক'রে তিনিই এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণসঞ্চার করেছেন।—শচীন্দ্র সম্বন্ধে পার্বতীর প্রায় অনুরূপ উক্তিগুলি স্মরণ ক'রে কিছু কৌতুক কিছু কৌতূহলে সে শচীন্দ্রের প্রতি একটা বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে নিলে।—তাঁর মধ্যে জনহিতের গভীর প্রেরণা না থাকলে আজ এই প্রতিষ্ঠান সম্ভব হ'ত না—

সীমা হাসি চেপে ভালমানুষের মত সুরে বললে, পার্বতী দেবীও

আপনার সম্বন্ধে প্রায় ওই কথাই বলছিলেন। বললেন, আমি কর্মচারী বই তো নয়। শচীনবাবুই এর সব। সীমা ইচ্ছা ক'রেই কথাটাকে বিকৃত ক'রে বললে।

শচীন্দ্র আহত হয়ে জিজ্ঞেস করলে, কর্মচারী! তিনি বললেন?

হুঁ, বললেন, এর মধ্যে তাঁর কোন হাত নেই, কর্তৃত্বও নেই।

না না, সে কি কথা! তিনিই সব। এর প্রত্যেকটি পরিকল্পনা, প্রত্যেকটি প্রত্যঙ্গ, প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান তাঁরই প্রাণের প্রশ্বাসে সঞ্জীবিত। আমি এর কে! আমি কিছুই না। মানবের হিতসাধন কোন দিন আমার চিত্তকে চঞ্চল করে নি। দেশের সেবা, এমন কি বাংলার সেবা কিংবা নারীজাতির মঙ্গলসাধন, কোন কালে আমার চিত্তে স্থান পায় নি। আমার পত্নীর স্মৃতিকল্পে যে-কোন একটা কিছু করতে পারলেই আমি তৃপ্ত হতাম। পার্বতী—পার্বতীই তাঁর প্রাণ দিয়ে হৃদয় দিয়ে এবং অক্লান্ত সেবা দিয়ে একে গ'ড়ে তুলেছেন। তা নইলে জনহিত-টিত ও-সব আমি কখনও চিন্তাও করি নি। কর্মচারী! তিনিই কমলাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

কথাটা ব'লেই শচীন্দ্রের নিজেরই বিসদৃশ বোধ হতে লাগল। সে লজ্জিত হয়ে চুপ ক'রে গেল। উচ্ছ্বাসের মুখে তার পত্নীর স্মৃতির প্রতি এ যেন এক প্রকার অবমাননা। সে অন্যদিকে ফিরে নিজের এই অপরাধ অনুভব করতে চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ভাব তার মন থেকে মুছে গিয়ে পার্বতী যে নিজেকে 'কর্মচারী মাত্র' ব'লে উল্লেখ করেছে, পরিত্যক্ত পার্বতীর সেই উক্তি অভিমানজনিত কল্পনা ক'রে, অনুতপ্ত চিত্তে মনে মনে সেই বিষয় আলোচনা করতে লাগল।

শচীন্দ্রের ও পার্বতীর মনোভাব সম্বন্ধে সীমার আর কোন সন্দেহ রইল না। 'অধিষ্ঠাত্রী দেবী' কথাটা তার কানে কৌতুকাবহ বোধ

হ'লেও কথাটাকে সে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেল। যদিও তার মনে আর সন্দেহ ছিল না যে, শচীন্দ্র তার কথায় তাদের কাজে এসে যোগ দেবে না, তবু সে একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখলে। নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে মনে মনে একটা মোটামুটি রিহার্সাল দিয়ে, সংগত অথচ ভাবালুতার আভাসে স্নিগ্ধ গভীর স্বরে সে বলতে লাগল, দেখুন, সত্যি কথা বলতে কি, জনহিতব্রত, অর্থাৎ নিছক লোকের মঙ্গলের জন্যে কিছু করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। ওটা সভ্যজগতে শুরু হয়েছিল আত্ম-রক্ষার্থে। ক্রমে মানুষ যত পাকা সামাজিক জীব হয়ে উঠতে লাগল, ততই ও-জিনিসটার উপর একটা মহত্তর উদ্দেশ্য আরোপ করলে এবং পুণ্যলোভী মানুষকে পরহিতসাধনে প্রলুব্ধ ক'রে তুললে। কিন্তু স্বাধীনতার ইচ্ছা আমাদের জন্মগত মজ্জাগত, সুতরাং স্বাভাবিক। তাই মানুষ প্রতিনিয়ত ধর্মের মধ্যে, সমাজের মধ্যে, রাষ্ট্রের মধ্যে কেবল মুক্তি কামনা ক'রে চলেছে। আর এক দল স্বার্থান্বেষী মানুষ যুগের পর যুগ এদের বাঁধতে চেয়েছে বৈরাগ্যের, স্বর্গের, শান্তির লোভ দেখিয়ে। কিন্তু পারে নি। মানুষের চাপে মানুষ মুক্তির নিশ্বাসের জন্যে হাঁপিয়ে উঠেছে। সেই আদিম তৃষ্ণা, সেই মহান চেষ্টা, কেউ টুঁটি চেপে মারতে পারে না। সেই তৃষ্ণা এই আমাদের মধ্যেও,—জড় ব'লে, নির্জীব ব'লে, মৃত ব'লে যাদের জীবিতের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাদের মধ্যেও—তীব্র ব্যাকুল চিত্তপ্লাবী কান্নায় ফেটে পড়তে চাচ্ছে। স্বভাবের সেই মহত্তম, পবিত্রতম সম্পদলাভে চিরদিন কেন আমরা নিজেদের বঞ্চিত ক'রে রাখব? একমুষ্টি উচ্ছিষ্টের লোভে মহাকাশের মূল্যে ক্রয় করা লৌহপিঞ্জরের মধ্যে ব'সে আমরা নিমীলিত নেত্রে ইষ্টনাম জপ করব কেন?

বলতে বলতে সীমা উঠে এসে সহসা শচীন্দ্রের দুটো হাত ধ'রে বললে, দেখুন, আপনার চাকরদের কাছে আপনার বোন ব'লে আমি পরিচয় দিয়েছি। এই প্রগল্‌ভা ছোট বোনটির কথা শুনুন। ঝেড়ে ফেলুন আপনার ভাববিলাসী মনের জড়তা। নেমে আসুন আপনার সমস্ত শক্তি নিয়ে, যেখানে মানুষের চাপে মানুষ পিষে মারা যাচ্ছে, মানুষের দেবতা যেখানে নিয়ত লাঞ্ছিত হচ্ছে। আপনার সমস্ত অর্ঘ্য দিয়ে সেই মহাশ্মশানকে মুক্তিতীর্থে পরিণত করুন। ব'লে সে ভাবাবেগে অভিভূত হয়েই যেন তার স্থির দৃষ্টি আকাশের দিকে তুলে চুপ ক'রে পাশে ব'সে পড়ল।

শচীন্দ্র অবাক হয়ে চাইল তার মুখের দিকে। ভাবলে এমনি ক'রে নিজেকে ভুলে একটা মহত্তর কাজের মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মহারা হতে পারলে সে বেঁচে যেত। এই অপরিচিতা তন্বী মেয়েটির অপূর্ব নিষ্ঠা, দেশের কাজে আত্মদানের মহত্ত্ব তাকে অভিভূত করতে লাগল। কি যে তার কাজের স্বরূপ, তা সে ঠিকমত জানে না; কিন্তু এই নিঃসঙ্গ মেয়েটি যে তার গৃহ, তার সমাজ, তার ব্যক্তিগত সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আরাম-আনন্দ পরিত্যাগ ক'রে বেরিয়ে পড়েছে, সহায়-সহানুভূতি-বিহীন নিষ্ঠুর সংসারের মধ্যে তাদেরই জন্য, যারা তার আহ্বানকে বাতুলের প্রলাপ ব'লে অশ্রদ্ধা করবে, এরই করুণা তার মনকে গভীর ভাবে স্পর্শ করলে। তবু তার বড় প্রিয় সেই স্মৃতি-মন্দিরের পবিত্রতা অন্য সাংসারিক বিক্ষোভের আঘাতে আবিল হয়ে উঠবে, এ সে ভাবতে পারে না।

সে ধীরে ধীরে বলতে লাগল, দেখুন, আপনার বাইরের পরিচয় আমি জানি নে; কিন্তু এই অল্পক্ষণের মধ্যে আপনার অন্তরের যে পরিচয় আমি পেয়েছি, তাকে তুচ্ছ করতে পারি এত স্পর্ধা আমার নেই। আপনার বয়স অল্প কিন্তু আপনার ত্যাগে, আপনার নিষ্ঠায়

আপনি আপনার বয়স এবং আপনার বন্ধনকে অতিক্রম ক'রে গিয়েছেন। সমস্ত বন্ধনকে অতিক্রম করতে না পারলে কেউ আপনার মত এমনি ক'রে বেরিয়ে পড়তে পারে না। সেই বন্ধনই আমাকে আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মধ্যে এমন ক'রে আবদ্ধ ক'রে রেখেছে। শক্তি আমার কিছুই নাই, যা নিয়ে আপনার বিরাট মুক্তি-কামনার তীর্থে অর্ঘ্য দান করতে পারি। ব'লে একটু থেমে বললে, পার্বতী দেবী ছাড়া আজ আমার পক্ষে এ-প্রতিষ্ঠানও গ'ড়ে তোলা অসম্ভব হ'ত। বাকি আমার যেটুকু শক্তি, সে আমার পিতৃদত্ত অর্থ—তার যতটুকু আমি কমলাপুরীর কল্যাণে ব্যয় করি ততটুকুই আমার সান্ত্বনা এবং যতটুকু আমার নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের স্মরণে সঞ্চিত রাখি সেইটুকুই আমার নিরাশ্রয় চিত্তের দুরাশা, বাকি আর আমার কিছুই নেই। আপনি আপনার নারী-ভবনকে আপনার মুক্তিমন্ত্রে গ'ড়ে তুলুন, কমলাপুরীর সমাধি-মন্দিরকে সমাধিক্ষেত্র ব'লেই জানবেন, সে আমার ব্যক্তিগত জীবনের গোপন তীর্থ। আমাকে ক্ষমা করবেন, বাইরের জনতার মুক্তি-কোলাহল দিয়ে আমার সেই নির্জনতাকে ক্ষুব্ধ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

সীমা মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠল। ভাবলে, রঙ্গদার কথাই ঠিক। এরা আবার জমিদারির মায়া, টাকার মায়া ছাড়বে! বেশ মজার কথা; অর্ধেক টাকা মৃতা পত্নীর জন্যে সমাধি আর বাকি টাকা হারানো ছেলের জন্যে জমা, আছে বেশ! এই সব প্যানপেনে লোকেরা কি ইচ্ছে ক'রে নাববে? গুঁতোর চোটে এরা বাবা বলে। দাঁড়াও, তোমাকে একবার রঙ্গদার হাতে ফেলি, সেই তোমার ঠিক ওষুধ। ওসব নাকে কান্নার ভব্য চারুকলার সে ধার ধারে না। ভাবলে, দেশটা জুড়েই কি এই যাত্রার দলের নায়ক-নায়িকা ছাড়া আর মানুষ নেই? দাঁড়াও, তোমাকে নিয়ে একবার খাঁচায় তো পুরি, তার পর—

মুখে অত্যন্ত সহৃদয় বন্ধুত্বের ভাব টেনে এনে সে বললে, দেখুন, আমি না জেনে হয়তো আপনাকে অকারণে উত্যক্ত করেছি। আপনার নির্জন-সাধনার পবিত্রতাকে আমার অশান্ত চিত্তের কোলাহল দিয়ে আমি নষ্ট করতে চাই না। আপনার কমলাপুরী দেখে আমার মনে হয়েছিল যে, আমার দেশের মুক্তিকামনার পথে আপনি আমার কাজ অনেকখানি এগিয়ে রেখেছেন। তাই বড় আশা করেছিলাম যে, আমার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে যা সম্ভব হয় নি, আপনার সাহায্যে তাকে সফল ক'রে তুলব। কিন্তু বুঝিতে পারছি, আপনার মন অন্য সুরে বাঁধা। আপনাকে আর বিরক্ত করব না। কালই আমাকে ফিরে যেতে হবে; আমার অনেক কাজ প'ড়ে আছে। তা ছাড়া— ব'লে সে যেন চিন্তাকুল হয়েই একটু চুপ করলে।

শচীন্দ্র এই মেয়েটির হতাশপীড়িত চিত্তের ব্যথিত কণ্ঠে একটু লজ্জিত হয়ে বলতে লাগল, দেখুন, অকারণে আমার শক্তি সম্বন্ধে একটা আশা পোষণ করেছিলেন ব'লেই আজ হতাশার কথা বলছেন। আমাকে আর লজ্জা দেবেন না। যে তুষের শস্য কীটে নিঃশেষ করেছে, তাকে আছাড় মারলে আর কি কিছু পাবেন? কিন্তু কি যেন বলতে গিয়ে আপনি চুপ ক'রে গেলেন; কেন? কোন কথা কোন ভর্ৎসনাই আমার পক্ষে অপ্রযুজ্য নয়। এই কথাই তো বলছিলেন যে, তা ছাড়া আপনার অপদার্থতা এত স্পষ্ট ক'রে আগে বুঝতে পারি নি; অকারণে দেশের কাজের এতগুলো পয়সা এবং সময় আপনার অপব্যয় হ'ল। আপনি যদি কিছু না মনে করেন তবে আমার সামান্য শক্তি অনুসারে আপনাকে অল্প কিছু পাথেয়-স্বরূপ দেব, আর—

সীমা বাধা দিয়ে বললে, না না, ও-রকম কথা আপনার সম্বন্ধে আমার মনেই হয় না। আমি অন্য কথা ভাবছিলাম। কিন্তু আপনাকে

সে কথা জানালে আমার নবলব্ধ বন্ধুটি আমাকে ক্ষমা করবেন কি না, তাই ভাবছি।

নবলব্ধ বন্ধু বলতে নিজের কথা মনে ক'রে শচীন বললে, আমি কিছু মনে করব না। আপনি নিচিন্ত মনে যা খুশি ব'লে যেতে পারেন, শক্তি আমার অবশ্য—

না না, আপনার কথা হচ্ছে না। আমি পার্বতী দেবীর কথা বলছি। ব'লে সে আবার চিন্তাকুল হয়ে পড়ল।

পার্বতী! শচীন্দ্র উৎকণ্ঠিত হয়ে সোজা হয়ে বসল। বলুন, তিনি কি বারণ করেছেন নাকি বলতে?

মনে মনে কৌতুক অনুভব ক'রে নিরীহ কণ্ঠে সীমা বললে, না, ঠিক বারণ করেন নি। তবে তিনিও এখানে আমার সঙ্গেই আসছিলেন কিনা। তা, হঠাৎ আসা বন্ধ হয়ে গেল।

শচীন আরও উৎকণ্ঠা প্রকাশ ক'রে বললে, কেন, তিনি কি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন? কই, এসে তো কিছু বলেন নি!

অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বললে ঠিক হবে না। আমি ভেবেছিলাম, আপনি জানেন। মানে—

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি দয়া ক'রে একটু খুলে বলুন।

সীমা নিজের অভিনয়ে খুশি হয়ে একটু বেধে বেধে বললে, তিনি তো আজ মাস দুই কি-একটা কলিক-পেনে ভুগছেন। আমার সঙ্গে আসার সব ঠিক। তা কলকাতায় এসে কাল এত ব্যথা হ'ল যে, আর আসা সম্ভব হ'ল না। ডাক্তার তো বলেছে অ্যাপেণ্ডিসাইটিস। অপারেশন করা দরকার।

অ্যাপেণ্ডিসাইটিস! তাঁকে ফেলে এলেন? মানে, তাঁকে দেখবার কে রইল? আমার বাড়িতে তো কোন— একটা নার্স ঠিক ক'রে—

সীমার হাসি বাধা মানতে চাইছিল না। অনেক সামলে কৌতুকের হাসিকে চেষ্টায় একটু সহান্থভূতির হাসিতে পরিণত ক'রে সে বললে, কিছু চিন্তা করবেন না। তাঁকে আমাদের বাড়িতে মার কাছে দাদার হেপাজতে রেখে এসেছি। বেলগাছিয়াতে আমার এক দাদা ডাক্তার আছেন, তাঁকে দিয়ে পরশু গিয়ে সব বন্দোবস্ত করব ব'লে পার্বতী দেবীকে কথা দিয়ে এসেছি। তাই তাড়াতাড়ি করছি। আপনাকে বললে যে আপনি চিন্তিত হয়ে পড়বেন—এই আশঙ্কায় বোধ হয় তাঁর আপনাকে জানাতে আপত্তি ছিল। তা ছাড়া আপনার মন-টন ভাল নেই, আপনার শান্তি নষ্ট করতে বোধ হয়—

শান্তি নষ্ট! পার্বতীর অভিমানের ধাক্কাটা মনে মনে অন্থভব ক'রে বললে, আমার ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। স্বার্থান্ধ হয়ে আমি এই দু মাস কারও সংবাদই নেই নি। ওঃ, তিনি আমার জন্যে যা করেছেন! জানেন, বিলেতে আমি মরতেই বসেছিলাম। তিনি সেবা ক'রে আমায় বাঁচিয়ে তুলেছিলেন। ছি ছি! ব'লে সে নিতান্ত অন্থতপ্ত হয়েই চিন্তা করতে লাগল।

শিকার ফাঁদে পা রাখলে শিকারীর মনে যেমন উল্লাস উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, অথচ স্তব্ধ নিষ্ঠুরতার জমাট মূর্তির মত তার দিকে সে স্থির উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে থাকে, সীমা ঠিক তেমনি ক'রে শচীন্দ্রের মনের গতিবিধি লক্ষ্য করেছিল। অল্প অপেক্ষা করতেই তার শেষ প্লানটুকুও পূর্ণ হ'ল।

শচীন বললে, আপনি আজই কলকাতা থেকে এসেছেন তাই বলতে লজ্জা হচ্ছে। দেখুন, শেষ-রাত্রে একটা ট্রেন আছে, কাল সন্ধ্যায় পৌঁছবে। আমি বরং তাতে চ'লে যাই। আমাকে আপনার বাড়ির ঠিকানাটা ব'লে দিন, তা হ'লেই হবে। কিছু মনে করবেন না। কিছুমাত্র আতিথ্য করতে পারলুম না, আবার আপনাকে একলা—

সীমা হেসে বললে, আমার কিছু কষ্ট হবে না। আমি সঙ্গেই যেতে পারব। ও রকম ট্রাভল্ করা আমার অভ্যাস আছে। আমি গেলে দাদাকে দিয়ে সব ঠিক ক'রে দেব। আপনি কিছু সঙ্কোচ করবেন না। দমদমায় আমাদের বাড়ি, সেখান থেকে বন্দোবস্ত করা সোজাই হবে।

৫৫

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় শচীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সহজে দমদমে সীমা এবং রঙ্গলালের আস্তানায় খাঁচায় এসে বন্দী হ'ল।

সীমা বলেল, পার্বতী দেবীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন, শচীনবাবু। তিনি কমলাপুরীতে খোসমেজাজে বহাল তবিয়তে ফিরে গেছেন। সম্প্রতি কিছু দিন আপনাকে আমাদের এখানে অতিথি হয়ে থাকতে হবে। আমাদের কাজ শেষ হ'লে আপনার সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাবে। আশা করি, নির্জনবাসের বিঘ্ন আমাদের এখানে আপনার বেশি হবে না।

শচীন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, মানে?

মানে, আপনি এখন আমাদের বন্দী। আপনার পিতৃদত্ত অর্থের কিছুটা দেশের মুক্তি-ফণ্ডে আপনার দক্ষিণা দিতে হবে। তাতে আপনার এবং দেশের দুয়েরই মঙ্গল। মৃত পত্নী এবং নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের উদ্দেশে অযথা অর্থ ব্যয় করার চেয়ে প্রজাদের রক্ত তাদেরই মুক্তিকল্পে উৎসর্গ করুন—তাতে প্রজারাও রক্ষা পাবে, আপনিও; আর আমাদেরও পরিশ্রমের কিছু লাঘব হবে।

আপনাদের! আপনারা কে?

আমরা আপনাদেরই ভাই বোন। যাদের আপনারা সরকারের সুনের গুণে অ্যানার্কিস্ট্ ব'লে অভিহিত ক'রে থাকেন। যারা দেশ ঘর

আত্মীয়-স্বজন সুখ-সম্পদ সব ছেড়ে আপনাদেরই মুক্তির জন্য মৃত্যুপণ করেছে। নিজের দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার অপরাধে যারা শিকারের জন্তুর মত বনে জঙ্গলে গৃহহীন অন্নহীন হয়ে বিতাড়িত হয়ে বেড়িয়েছে। আমরা পরপদানত দেশের সেই হতভাগ্যের দল। আশা করি, আমাদের এই মুষ্টিভিক্ষাটুকু থেকে আপনার রাজসিক দয়ার্দ্র চিত্ত আমাদের বঞ্চিত করবে না।

শচীন্দ্রনাথ চুপ ক'রে ভাবতে লাগল। অকস্মাৎ এমন একটা অভাবনীয় বিপদের মধ্যে যে পড়তে পারে, এ যেন সে কল্পনাতেই আনতে পারলে না। এ যেন সত্য নয়—স্বপ্ন। সীমার অকস্মাৎ আবির্ভাব থেকে আরম্ভ ক'রে তার সমস্ত আচরণ কেন যে তার কাছে এতক্ষণ অস্বাভাবিক লাগে নি ভেবে সে নিজেই অবাক হ'ল। এখন আর নিজেকে মূঢ় ব'লে ভৎর্সনা ক'রে কোনও ফল নেই। তার প্রাণ পর্যন্ত যে সংশয়, এক মুহূর্তের মধ্যে সে কথা কল্পনা ক'রে মনে মনে তার বুকটা একটু যেন দ'মে গেল। নিতান্ত ভীরু প্রকৃতি না হ'লেও এই নিশ্চিন্ত মৃত্যুর কবলে প'ড়ে মনের উদ্বেজিত অস্বস্তিকে সান্ত্বনা দানে শান্ত ক'রে রাখতে পারছিল না। মহৎ কর্মের অজুহাতে যারা নিষ্ঠুরতায় বা হত্যায় প্রবৃত্ত হয় তাদের চিত্তে করুণা উদ্রেক করবার চেষ্টা যে বাতুলতা মাত্র—এ কথা বুঝতে তার দেরি হয় নি। তার প্রথম প্রবৃত্তি হ'ল যে, একটা মোটা 'চেক' সই ক'রে বেরিয়ে গিয়ে পুলিসের হাতে এদের সমর্পণ করে। কিন্তু নিজের ছেলেমানুষি কল্পনাবৃত্তিতে নিজেরই হাসি পেল। প্রথম তো, টাকাটা হাতে না পেয়ে তাকে মুক্তি দেওয়ার কথা পাগলের জল্পনা বই আর কিছু নয়। তারপর পুলিসের সাহায্য নিলেও এদের সন্ধান সে দেবে কেমন ক'রে? নিশ্চয়ই ধরা পড়বার মহৎ আকাঙ্ক্ষায় এরা এখানে অপেক্ষা করবে না। তা ছাড়া ভবিষ্যতে অবশ্যই এরা তার প্রতিশোধের চেষ্টা না ক'রে ছাড়বে না। সুতরাং

টাকা তো গেলই, প্রাণও এদের হাতে বন্ধক রইল। অতএব হয় এদের দলে নিজেকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেওয়া, নতুবা মৃত্যুবরণ, এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয় পন্থা সে দেখতে পেল না। এই হত্যাকারী দলের দস্যুবৃত্তিতে যোগ দেবার কথা মনে ক'রে ঘৃণায় তার অভিজাত চিত্ত কণ্টকিত, তার সর্বশরীরের রক্ত বিদ্রোহী হয়ে উঠল। মনে মনে বললে, কখনই না। মৃত্যু স্বীকার করতে হ'লেও না। ভেবে দেখলে, তার জীবনের কিই বা মূল্য, যার বিনিময়ে এমন জঘন্য বৃত্তি সে অবলম্বন করতে পারে! কিছুই না। সে কিছুতেই স্বীকার করবে না। চিন্তা করতে করতে সে যেন একটু মরিয়া হয়ে ভাবলে, কি হবে আমার বেঁচে? কত দিন তো এই মৃত্যুকেই কামনা করেছি, দেখিই না কি হয়!

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ভাবতে দেখে সীমা আবার বললে, শচীনবাবু, আপনি শিক্ষিত বুদ্ধিমান লোক। দেশের কথা বিস্তারিত ক'রে বোঝানোর দরকার নেই আপনাকে। সমস্ত দ্বিধা সংশয় পরিত্যাগ ক'রে নেমে আসুন আমাদের মধ্যে; আমাদের দলে অনেক জমিদার গৃহস্থ সভ্য আছেন, আপনিও তাঁদের একজন হয়ে থাকবেন। শুধু আপনার দেয় চাঁদাটা ঠিকমত দিয়ে গেলেই আপনার আর কোন দায় থাকবে না। কি বলেন?

যদি রাজী না হই?

রাজী না-হবার উপায় কি আপনার হাতে? আপনি জানেন যে, আপনার বা আমার প্রাণের মূল্য আমাদের কাছে মাত্র রিভলভারের একটা গুলির দাম। তার আবশ্যক কি? আপনারও কমলাপুরী এবং সুখৈশ্বর্য বজায় থাকুক, আমরাও আপনার কৃপা থেকে বঞ্চিত না হই। এই তো ভাল। আর একটা কথা চিন্তা ক'রে দেখবেন। দেশকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে যে টাকার দরকার, সরকার সেগুলো আদায় ক'রে নেন আত্মরক্ষার্থে ও পোষ্য-পালনে। সুতরাং তা আমরা সংগ্রহ

করতে বাধ্য হই অর্থবানদের কষ্ট দিয়ে। অর্থেরই আমাদের প্রয়োজন —সে-অর্থ আমাদের সংগ্রহ করতেই হবে।

শচীন চুপ ক'রে ভাবতে লাগল।

একটু অপেক্ষা ক'রে সীমা আবার বললে, তা হ'লে চেক-বইটা দয়া ক'রে বের করুন, আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, আর তা বাড়াতে চাই নে।

শচীন্দ্রনাথকে তবুও নিস্তব্ধ হয়ে চিন্তা করতে দেখে সীমা একটু অধৈর্য হয়েই বললে, শচীনবাবু, আপনার মঙ্গলের জন্যই বলছি, আমার কথা শুনুন। বিলম্ব না ক'রে কাজটা সেরে ফেলুন। নইলে আমার এক দাদা আছেন, যাঁকে মোটর-ড্রাইভাররূপে দেখেছেন, তাঁর হাতে পড়লে আপনাকে বাঁচানো দুরূহ হবে। তাড়াতাড়ি করুন, আমার আবার নারী-ভবনে যেতে হবে, সে দিকে অনেক দিন যাই নি।

প্রাণের ভয় মিছে আমাকে দেখাবেন না। আপনাদের যা সাধ্য করতে পারেন।

মানে?

মানে, আপনাদের হাতে প্রাণ ভিক্ষা নিয়ে নরহত্যার কাজে সে প্রাণ উৎসর্গ করতে আমি ঘৃণা করি।

সীমা এই উত্তরে একেবারে নির্বাক হয়ে গেল। তার মৃত্যুঞ্জয়ী চিত্ত মনে মনে শচীন্দ্রের প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারল না। যে ঘৃতপুষ্ট, আলস্যপরায়ণ, সুখস্বপ্নবিলাসী জীব কল্পনা ক'রে সে শচীন্দ্রনাথের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিল, তার বদলে এই বে-পরোয়া লোকটিকে দেখে সে মনে মনে এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল। কিন্তু পরক্ষণেই তার অন্তর্নিহিত নারী কুতূহলী হয়ে উঠল। ভাবলে, পার্বতীর উপর অভিমান, না; আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টা?

সে একটু মিষ্টি সুরে প্রায় যেন অনুযোগের মত ক'রে বললে, দেখুন,

আপনার বীরত্বকে আমি তারিফ করছি। কিন্তু অকারণ-বীরত্বের প্রয়োজন কি? যাদের কাছে আপনার প্রাণটা মূল্যবান তাদের জন্যেও অন্তত প্রাণটা আপনার রাখা দরকার বই কি।

শচীন্দ্রনাথ 'প্রাণটা যাদের কাছে মূল্যবান' কথাটা শুনে একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল। সেইটুকু লক্ষ্য ক'রে সীমা ধীরে ধীরে বললে, দেখুন, আপনি যদি দয়া না করেন, তা হ'লে পার্বতী দেবীরই শরণাপন্ন হতে হবে।

এই কথায় শচীন্দ্রের মনের মধ্যে একটা আশঙ্কার বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে গেল। মুহূর্তে পকেট থেকে চেক-বই বার ক'রে সে বললে, আপনাদের কত প্রয়োজন?

নিজের কৃতিত্বে খুশি হয়ে একটু মৃদু হেসে সীমা বললে, আপাতত দশ হাজার।

এক মিনিট চিন্তা ক'রে সে লিখতে শুরু করলে। লিখতে লিখতে সে ভাবতে লাগল, কিন্তু এ জবরদস্তির শেষ কোথায়? আমার আতঙ্কের হুণ্ডি ভাঙিয়ে যদি টাকা আদায় করতে শুরু ক'রে, তা হ'লে চিরকাল এদের রসদ যোগাবার আতঙ্ক থেকে নিস্তার পাবার উপায় কি হবে? না, এ নির্বুদ্ধিতা সে করবে না। কিছুতেই না। তাকে না পাওয়া গেলে বরং পুলিসে এর একটা কিনারা করতে পারে; কিন্তু চিরকাল এদের তর্জনীর তাড়নে, লাঙ্গুলাহত কুকুরের জীবন যাপন করা অসহ্য। হঠাৎ চেকখানা ছিঁড়ে ফেলে ঝরনা-কলমটা গুটিয়ে সে পকেটে রাখলে।

সীমা বললে, বুঝলাম, আপনাকে সদ্‌বুদ্ধি দান ক'রে কোন ফল নেই। কিন্তু পার্বতী দেবীরও ওই একই দশা ঘটতে পারে। তাকে রক্ষা করাও কর্তব্য।

হঠাৎ তীব্র হয়ে উঠে শচীন বললে, আপনারা নিজেদের নিষ্ঠুরতায়

মূঢ়তায় নিতান্তই অন্ধ। পার্বতী দেবীকে চিনলে বুঝতে দেরি হ'ত না যে, আপনাদের মত গোপনচারী হন্তারক কাপুরুষদের ভয় করবার মেয়ে সে নয়। মৃত্যুভয় দেখিয়ে সেখানে কিছু সুবিধে হবে না, এটা নিশ্চয় জানবেন।

সীমা সত্যিই এবারে যেন একটু মুশকিলে পড়ল। নিজ হাতে সে কখনও খুন করে নি। কোন রকমে চিরকাল হত্যা ব্যাপারটাকে এড়িয়ে চলবার দুর্বলতা তার মনের মধ্যে কোথায় যেন লুকিয়ে থাকত। এই জন্য দিনের পর দিন ক্রমে ক্রমে সে রঙ্গলালের মনে তার বিরুদ্ধে শত্রুতা এবং বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে তুলছিল। কিছুমাত্র উত্তেজিত না হয়েও একটা নিরস্ত্র লোককে অনায়াসে খুন করার বীভৎসতাটা কেমন যেন সে সহ্য করতে পারত না। ফাঁসির হুকুমকে চিরদিনই সে খুনীর পাপের চেয়ে বেশি অপরাধ ব'লে মনে ক'রে এসেছে, তাই সে রঙ্গলালের নিশ্চিত মৃত্যুকবলে এই লোকটিকেও ছেড়ে দিতে যেন পেরে উঠছিল না। নিজের অজ্ঞাতেই নানা প্রকারে শচীন্দ্রের বিবেচনাবৃত্তিকে সচেতন ক'রে তার প্রাণরক্ষার পন্থার যেন চেষ্টা করছিল। এও তার মনে হয়েছিল যে, সাধারণভাবে প্রেমার্তচিত্ত হ'লে জীবনের মায়া ত্যাগ করা এত সহজে কখনই সম্ভব হ'ত না। সে একটু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলে, জীবনের প্রতি সত্যিই কি এত বিতৃষ্ণা আপনার? কিন্তু কেন বলুন তো? আমি সত্যিই আপনার বীরত্বে আশ্চর্য হয়েছি। সত্যিই আপনার মৃত্যুচিন্তা ক'রে আপনি একটুও কাতর নন?

একটুও না। ইচ্ছে ক'রেই সে একটু জোর দিয়ে বললে। তার অবস্থার উপর অনিন্দিতা দেবীর প্রভুত্বের মুষ্টি কেমন একরকম ক'রে একটু শিথিল হয়ে এসেছে, তা যেন সে অনুভব করলে।

কেন, বলতে কি আপনার কোনও বাধা আছে?

শচীন্দ্র চুপ ক'রে ভাবতে লাগল। অনিন্দিতা দেবীর কথার সুরে

পূর্বেকার সেই সুদূরতা সেই কঠিনতা যেন একেবারে পরিচিত ও স্পর্শকোমল হয়ে এসেছে। ভাবলে যে, অ্যানার্কিস্ট্দের আমরা কি অদ্ভুত ব'লে ভাবি। সুখে দুঃখে স্নেহে কৌতূহলে তারা যে আমাদের থেকে কোথাও এতটুকু ভিন্ন নয়, তা যেন আমাদের ধারণাতেই আসে না। মাতাল যেমন যতক্ষণ মদের ঝোঁকে থাকে ততক্ষণই মাতাল; তারপর সে কবি, শিল্পী, বন্ধু, ভাই, স্নেহাস্পদ ইত্যাদি ঠিক তেমনি। মেয়েটির উপর তার মনে কেমন একটু মায়া হতে লাগল। নিজেকে ওর চেয়ে অনেক সুস্থ শান্ত আত্মস্থ ব'লে মনে হ'ল। কার শাপে ওর এই বিপ্লবীর সাজ, এ যেন ওকে মানায় না! ওর অন্তরাত্মা যেন এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে উঠতে চাইছে। ওর বাইরের বিপ্লবী তাকে আমল দিতে চায় না; টুঁটি টিপে তাকে যেন ও বোবা ক'রে রেখেছে। তার মনটা কোমল হয়ে এল। সে ধীরে ধীরে সীমার কাছে একটু একটু ক'রে মোটামুটি তার জীবনের ঘটনা ব'লে গেল। যখন শেষ ক'রে সে বললে, মৃত্যুচিন্তায় কাতর! মৃত্যুকে কত দিনই যে কামনা করেছি, তা বলতে পারি নে।

সীমা তখন ভাবছে কমলার কথা। কি সর্বনাশ, এ যে জ্যোৎস্নার স্বামী! এখন আমি কি করি? রঙ্গলালের হাত থেকে একে রক্ষা করতে হ'লে এখুনি এঁকে মুক্তি দেওয়া দরকার। তার একবার ইচ্ছে হ'ল যে, ছুটে জ্যোৎস্নাকে গিয়ে এই সংবাদ দেয়। কিন্তু তার দলের কর্তব্য, তার দেশের কর্তব্য, তার সকলের আগে। এ কি অলস রসবিলাসিতা তার! ছিঃ! সত্যবানের কাছ থেকে শোনা গীতার শ্লোক সে মনে মনে প্রাণপণে আবৃত্তি করতে লাগল।

ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপঃ।

আমার দেশের স্বাধীনতার কাছে আমার ভাই-বন্ধু স্নেহ-মমতা পাপ-পুণ্য ব্যক্তিগত চিন্তা কি ঠাঁই পাবার যোগ্য? মনে মনে নিজের

দুর্বলতার জন্যে নিজেকে কঠিন তিরস্কার করলে। এবং আর অপেক্ষা না ক'রে সে বাইরে চ'লে গেল।

* * *

নিখিলনাথ তার ব্যর্থ অভিযান থেকে ফিরে বাইরে তখন তার জন্য অপেক্ষা করছিল। সীমা অকৃত্রিম বিস্ময় ও আনন্দে তাকে অভিবাদন ক'রে বললে, ওমা, আপনি কতক্ষণ? তারপর তার ক্লিষ্ট চিন্তাকুল মুখ দেখে বললে, আপনার অসুখ করেছে না কি? এ কি চেহারা হয়েছে আপনার এ কয় দিনে? ব'লে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে তার উত্তরের প্রতীক্ষা করতে লাগল। ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং প্রভৃতি আর মনে রইল না।

নিখিল সব খুলে বললে। সীমার কলকাতা পরিত্যাগ থেকে শুরু ক'রে ইন্সপেক্টরের হত্যাকাহিনী পর্যন্ত বলতেই সীমা সক্রোধে ব'লে উঠল, কী, হত্যা করেছে? আমার বিনা হুকুমে! এ স্পর্ধার শাস্তি তাকে পেতেই হবে।

সীমা যে এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয় নি, এইটুকুতেই যেন নিখিলের মনের অর্ধেক বোঝা নেমে গেল। সে সুযোগ পেয়ে খুব আবেগের সঙ্গে বলতে লাগল, সীমা, আর কেন! এর পর সংযমের পথে, ত্যাগের পথে, মনুষ্যত্বের পথে কখনও তোমার বাহিনীকে আর ফেরাতে পারবে না, এটা নিশ্চয় জেনো। যে ব্লড-হাউণ্ডের দলকে দেশের স্বাধীনতালাভের মুক্তিফৌজ ব'লে কল্পনা করছ, তারা মুক্তিপিপাসু নয়, তারা রক্তপিপাসু। তাদের প্রশ্রয় দিয়ে দেশের কাপুরুষতাকে আর বাড়িও না। এখনও ফেরো দেশের এই সর্বনাশের পথ থেকে।

রজলাল যে কখন পিছনের দরজা দিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছিল, তা কেউ দেখে নি। গরিলার মত বিকট একটা মুখভঙ্গী ক'রে সে চেঁচিয়ে উঠল, চোপ রও ডাক্তার, মুখ সামলে কথা বল। এ তোমার নার্সের

আড্ডা নয়। প্রাণ নিয়ে ছুঁচোর গর্তে ঢুকেছিলে সেই ভাল। প্রাণের মায়া থাকে তো এ রাস্তা আর মাড়িও না, ব'লে দিচ্ছি। সীমার পেয়ারের ব'লে রঙ্গলাল তোমায় ছেড়ে দেবে না।

সীমা রঙ্গলালের দিকে ফিরে ধমকে উঠল, রঙ্গলাল!

নিখিলনাথ রঙ্গলালের দিকে ফিরে একটা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বেশ আস্তে আস্তে বললে, রঙ্গলালবাবু, আমি তো আপনার গোষ্ঠীর লোক নই; সুতরাং আমাকে চোখ রাঙিয়ে কোনো সুবিধে নেই। প্রাণের ভয় যারা করে, প্রাণের ভয় তারাই দেখিয়ে বেড়ায়। লুকিয়ে নিরস্ত্র লোককে খুন করা যাদের ব্যবসা, তাদের মুখে বীরত্বের বড়াই হাস্যকর নয় কি?

ক্রোধে চোখ মুখ বিকৃত ক'রে রঙ্গলাল আবার কি একটা বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় সীমা এগিয়ে এসে তাকে কঠিন কণ্ঠে বললে, রঙ্গলাল, তোমার স্পর্ধা দিন দিন সহ্যের সীমা অতিক্রম ক'রে যাচ্ছে। তোমাকে কিছু সংযত করা আবশ্যক। কার হুকুমে তুমি মুখুজ্জেকে খুন করেছ?

হত্যাকাণ্ডকে সীমা যে প্রসন্ন চোখে দেখবে না, রঙ্গলাল তা ভাল ক'রেই জানত। তাই সীমার অনুপস্থিতিতে সে সীমাকে প্রসন্ন করবার উদ্দেশ্যে বহু পরিশ্রমে সরকারী ট্রেজারি লুঠ করবার বিস্তৃত প্ল্যান ক'রে রেখেছিল। ইচ্ছা ছিল যে, এই সংবাদটি দিয়ে সে ইন্সপেক্টরের হত্যাটা সীমার মনে লঘু ক'রে আনবে। কিন্তু নিখিলের জন্য তা ঘ'টে উঠতে পারল না। ডাক্তার যে সীমাকে গ্রাস করতে বসেছে, এই চিন্তায় সে নিজেকে সংযত রাখতে পারে নি। কিন্তু শাসন-সম্বন্ধে সীমার কঠোরতার কথা রঙ্গলালের অবিদিত ছিল না। স্পর্ধা প্রকাশ ক'রে বা সীমাকে লঙ্ঘন ক'রে নিস্তার পাবার আশা তার নেই। তার নিজেরই রচিত কঠোর শাসনবিধি থেকে তারও পরিত্রাণ পাওয়া অসম্ভব.

তা সে জানত। পুলিস বা সীমা কারও হাতে ইঁদুর-কলে প'ড়ে মারা যাবার বাসনা তার ছিল না। মনে মনে সীমা এবং নিখিলের মুণ্ডপাত করলেও বাইরে তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত হয়ে নিজের অন্যায় স্বীকার ক'রে অবনত মস্তকে সেখান থেকে সে বেরিয়ে গেল।

সীমা এক সপ্তাহের মত তাকে কর্তৃত্ব থেকে চ্যুত করেছিল। নিষ্ফল ক্রোধে, হিংসায়, প্রতিশোধ-কামনায় তার অন্তরটা দগ্ধ হচ্ছিল। মনে মনে বললে, নাঃ, এ প্রহসনের একটা শেষ করতে হবে। তবু ইন্‌স্পেক্টর হত্যার সফলতায় মনটা তার খুশি কম হয় নি এবং গর্বও সে মনে মনে সম্ভোগ করছিল অনেকখানি।

৫৬

নন্দলালের ভীষণ পরিণামের দৃশ্য দুর্ভাগিনী মালতীর কল্পনাবিমুখ চিত্তকে এমন সম্পূর্ণরূপে অভিভূত করেছিল যে, তার নিজের ভবিষ্যৎ সর্বনাশের কোন কাল্পনিক চিত্র তার কাছে কোন বাস্তব তীব্রতা নিয়ে বিভীষিকা দেখাবার অবসর পায় নি। অদৃষ্ট-ঘাতকের যে নিষ্ঠুর তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে তার অতীত সুখৈশ্বর্যের সম্পূর্ণ অবসান ঘটিয়েছিল, নিজের সেই নিঃসহায় চিত্র তার চিত্তপটে প্রতিফলিত হয় নি। স্নেহলালিত নন্দলালের পরিহাসকোমল স্বভাব, মালতীর উপর তার অসহায় নির্ভর ও সংসারের উন্নতির জন্যে তার অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা স্মরণ ক'রে এবং এই দু দিনে নন্দলালের যে বীভৎস পরিবর্তন ঘটেছে তা প্রত্যক্ষ ক'রে সে প্রথম প্রথম অত্যন্ত অধীর হয়ে পড়ত।

তিনি যে এতটুকু যাতনা সইতে পারতেন না দিদি! রাত্রে কোন শব্দ হ'লে ভয়ে ছেলেমানুষের মত আমার কাছে ঘেঁষে আসতেন। উঃ! মানুষে কেমন ক'রে এমন বদলে যেতে পারে! আমাকে চিনতেও পারলেন না! মাগো! ব'লে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদতে থাকত।

অনুতপ্ত কমল সান্ত্বনার কোন ভাষা খুঁজে পেত না। অশ্রুবিগলিত নয়নে সে অজয়কে ধীরে ধীরে মাসীর কোলের কাছে দিয়ে মালতীর গায়ে হাত রেখে নির্বাক হয়ে তার কাছে ব'সে থাকত।

অজয়ের প্রতি তার মোহের আকর্ষণে অল্পে অল্পে মালতীর সন্থবিরহবেদনার তীব্রতা ক্রমে লঘু হয়ে এল। তা ছাড়া শোকের তীব্রতায় বহুদিন অভিভূত হয়ে থাকবার মত মানসিক গভীরতা তার ছিল না। তার রিক্ত হৃদয়কে স্নেহরসে পূর্ণ ক'রে তোলবার সহজধর্মই ছিল তার স্বাভাবিক। অজয়কে সে আরও নিবিড়তর স্নেহে যেন বুকের মধ্যে টেনে নিলে। তার শোকদগ্ধ হৃদয়ের শূন্যতাকে পূর্ণ করবার পক্ষে অজয় তার কাছে ক্রমে আরও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল। এক দণ্ড সে আর অজয়কে চোখের অন্তরাল করতে চাইত না। কমলা চুপ ক'রে দেখত সবই। অজয় ধীরে ধীরে তার শিশুসুলভ সুবিধাবাদিত্বের আস্বাদে তার মার চেয়ে ক্রমে তার মাসীর আদর এবং প্রশ্রয়ের পক্ষপাতী হয়ে উঠল। কমলার আশ্রয়বিহীন চিরদুঃখপীড়িত নারীচিত্তে এতে যেটুকু বেদনার সঞ্চার করত, নন্দলালের অবস্থার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সেটুকু যেন সে স্বীকার ক'রে নিলে।

যে শোকের আঘাত প্রথম দিন মালতীর কাছে দুঃসহ ব'লে বোধ হয়েছিল, সেই শোক পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যেই কেমন ক'রে যে সাংসারিক ও ভবিষ্যৎ চিন্তার আবশ্যকের পরিধির মধ্যে এসে আবদ্ধ হ'ল ভাবলে অবাক হতে হয়।

একদিন সে কমলাকে বললে, দিদি, তুমি কিন্তু আমাকে ছেড়ে যেও না। আমি চিরদিন তোমার কাছে থাকব। খোকনকে তো ছাড়তে পারব না। কমলা মালতীর দুর্দশার কথা স্মরণ ক'রে ব্যথিত হয়ে উঠল। বললে, তোমাকে কি আমি ছেড়ে যেতে পারি দিদি? খোকনই বা তোমায় ছাড়বে কেন? কী যে হবে তা নিখিলবাবুর সঙ্গে

দেখা না হ'লে তো কিছুই বুঝতে পারছি নে। কিন্তু সে যাই হোক, তুমি আমার বড় দুঃখের বোন যে দিদি! তোমায় ছেড়ে আমারই বা গতি কি? বলতে বলতে সে অন্যমনস্ক হয়ে নিখিলনাথ যে আজ কয়দিন একেবারেই আসেন নি সেই কথাই চিন্তা করতে লাগল।

৫৭

সীমার কাছে অপমানিত হয়ে রঙলাল বেরিয়ে গেল। ক্রোধে তার মনে প্রতিশোধের আগুন উঠছে লেলিহান হয়ে। একটা সামান্য মেয়ের তর্জনীর তাড়নে চিরদিন তাকে কুকুরের মত ঘৃণ্য জীবন যাপন করতে হবে—এ কথা মনে ক'রে রাগে হিংসায় সে অস্থির হয়ে উঠছে। ডাক্তারের প্ররোচনায় সীমা তাকে অপমান করতে সাহস করে! এ দুঃসাহসের প্রতিফল সে দেবেই। একবার ভাবলে, নিখিলকে শেষ ক'রে এর শোধ তুলবে। কিন্তু ডাক্তারকে খুন করলে যে সীমা'র হাতে সে রেহাই পাবে না—এই কথাটা চিন্তা ক'রে তার মনটা নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল। সীমার অনুচরদের উপর সীমার প্রভাব অসীম। সুতরাং হত্যা ক'রে তাদের হাত থেকে রক্ষা পাবার আশা তার অল্পই। গোপনে নিজেরই দলের লোকের হাতে নিঃশব্দে প্রাণ দিতে সে কিছুতেই পারবে না। প্রফুল্লের মত, সত্যবানের মত যুদ্ধ ক'রে প্রাণ দিয়ে দেশের এবং দশের মধ্যে একটা চিরস্মরণীয় নাম সে রেখে যেতে চায়, কিন্তু সীমার সঙ্গে যোগ দিয়ে এ কি ভুলই করেছে সে? এই সব স্ত্রীলোকের কারবারে সেই বীরত্ব দেখাবার, সেই সব দুর্দ্ধর্ষ বিপ্লবের আশা কোথায়? শেষকালে পুলিসের হাতের হাতকড়ি প'রে সুবোধ বালকের মত একদিন ফাঁসিতে লটকাতে হবে না কি! তা কিছুতেই পারবে না সে। তার আগেই এর একটা বিহিত করতে হবে। সমস্ত ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যাবার পূর্বে সে এমন একটা কিছু ঘটিয়ে

তুলতে চায়, যাতে তার চিরদিনের দুরাশা এবং প্রতিশোধের তৃষ্ণা দুই-ই চরিতার্থ হয়।

এর পর যে তার পক্ষে তার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব হবে এবং সীমার কাছে এই পরাজয় যে তাকে নিঃশব্দে পরিপাক করতে হবে, এ তার পক্ষে অসহ্য। সীমার কার্যপদ্ধতির এই নিরুপদ্রব বিস্তৃত আয়োজনের প্রহসন সে সহ্য করতে পারে না। এমনি ক'রে মরা দেশের বুকে ব'সে শবসাধনার কি আবশ্যক? 'মরা'কে বাঁচিয়ে তুলতে হ'লে যে জীবন্ত মানুষের বলি প্রয়োজন। দেশের নাড়ীতে উত্তেজনার রক্তপ্রবাহ না বহাতে পারলে, দেশের নিস্তেজ স্নায়ুগুলোর মধ্যে মৃত্যুস্পৃহার তৃষ্ণা না জাগাতে পারলে নিরর্থক হবে তাদের এই মৃত্যুসাধনা। অনায়াসে অকারণে মরণের তাণ্ডবে ঝাঁপ দিতে না শেখালে জীবনের সাড়া এই মরাদেশের মধ্যে জাগবে কি ক'রে? হবে না সীমার ওই ক্ষীণপ্রাণ নপুংসক প্রতিষ্ঠান দিয়ে। কি করতে পারে সে, যাতে এই বিরাট ইংরেজ রাজত্বের নখাগ্রও ধ্বংস পেতে পারে। ওসব অজুহাত তার কিছু করতে ভয় পাবার নামান্তর বই আর কিছুই না। কিসের অহঙ্কারে সে আমাকে তুচ্ছ করে? রঙ্গলাল মৃত্যুভয়ে-পালিয়ে-বেড়ানো কুকুর নয়। মৃত্যুকেই সে চায়—বীরের মৃত্যুকে; প্রবলের বিরুদ্ধে, নিশ্চিত মৃত্যুর সঙ্গে দুর্জয় লড়াই ক'রে সে মরবে। সীমা-নিখিলের লীলাকুঞ্জ সে রক্তস্রোতে ভাসিয়ে দেবে—তবেই তার শান্তি।

দিনের পর দিন এই রকম চিন্তা করতে করতে মাথার মধ্যে রক্তস্রোত তার উত্তাল হয়ে উঠল। সীমার উপর প্রতিশোধের আশায় এবং একটা সম্মুখ সংগ্রামের বাসনায় মনে মনে একটা মতলব স্থির ক'রে এবং গোপনে তার বিস্তৃত আয়োজন ক'রে পুলিসের কাছে ভুলু দত্তের নামে সে একটা চিঠি লিখে পাঠাল। ভুলু দত্ত যে সীমার সন্ধানে উৎকণ্ঠ

—এ কথা তাদের অজানা ছিল না। বিস্তৃতভাবে সীমা এবং তার প্রতিষ্ঠানের সংবাদ, তাদের বিভিন্ন কার্যকলাপের, এমন কি শচীন্দ্রনাথের বন্দী হওয়ার সংবাদটি পর্যন্ত, দিয়ে সে জানাল যে, দু-এক দিনের মধ্যে সীমার দল দমদমের বাড়ি পরিত্যাগ ক'রে রাজকোষের উপর তাদের বহুদিনের ঈপ্সিত অভিযান নিয়ন্ত্রিত করবার ব্যবস্থা করেছে, ইত্যাদি।

রঙ্গলালের দু-একজন বিশ্বস্ত লোক তার দলে ছিল। তাদের সাহায্যে পরদিন এই পত্র রওনা ক'রে দেবার ব্যবস্থা ক'রে সে নিজেকে কতকটা সুস্থ বোধ করলে এবং নিতান্ত নিরীহভাবে সে দমদমায় সীমার সঙ্গে দেখা করতে গেল। তখন সন্ধ্যা আসন্ন।

সীমা একটু সন্দেহের সুরে বললে, রঙ্গদা, কি মনে ক'রে? মতলবটা কি? রঙ্গলাল কৃত্রিম ক্ষোভে গম্ভীর হয়ে বললে, রঙ্গলাল অত মতলবের ধার ধারে না। সে নিজের সীমা লঙ্ঘন করেছে, তাই তার মন সুস্থ নয়। সে নির্জীবের মত নিজের গৃহকোটরে নির্বাসিত হয়ে আর থাকতে পারে না। তার স্পর্ধা ক্ষমা ক'রে তার নির্বাসনদণ্ড থেকে তাকে অব্যাহতি দাও।

সীমা বললে, রঙ্গদা, আমাদের নিয়ম তো জান। সাত দিন না গেলে ক্ষমা করবার অধিকার তো আমার নেই।

তোমার শাস্তি থেকে আমি নিষ্কৃতি চাইছি না সীমা। বাকি দু-তিনটা দিন আমাকে এখানে থাকতে দাও। আমাদের সমস্ত কর্মসূত্র থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকাই আমাদের সব চেয়ে বড় শাস্তি। এ তিন দিন আমি তোমাদের কোন কাজে বা আলোচনায় থাকব না, প্রতিজ্ঞা করছি।

সীমা একটু ভেবে বললে, আচ্ছা, কিন্তু কথা দাও যে, শচীনবাবুর সঙ্গে কোন রকম বাক্যালাপ করবে না বা তাঁর সম্বন্ধে কোন কিছুতে তুমি হাত দেবে না।

তথাস্তু, সেই প্রতিজ্ঞাই করলাম। একটু নত হয়েই যেন সে এই কথা কয়টা উচ্চারণ করলে। তার নতিভঙ্গীতে যে-একটু উপহাসের আভাস ছিল সীমা সেটুকু লক্ষ্য করলে, কিন্তু গ্রাহ্য করলে না। ভাবলে, এখানে সে কিছু বেয়াদবি করতে সাহস পাবে না, বরং সকলের চোখের উপরেই থাকবে—সেই ভাল।

রঙ্গলালের অবশ্য সম্প্রতি শচীন্দ্র সিংহ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু কৌতূহল ছিল না। পুলিসবাহিনীর আসন্ন আক্রমণের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য আয়োজন এই সুযোগে সে এখানে সম্পন্ন ক'রে রাখতে চায়, যাতে ব্যাপারটা রীতিমত একটা যুদ্ধের আকার নেয়। সীমার অনুপস্থিতিতে প্রায় অর্ধরাত্রি পর্যন্ত সেই কাজেই সে নিজেকেই ব্যাপৃত রাখলে।

* * *

ওদিকে নির্জন কক্ষে বন্দী শচীন্দ্রনাথ মৃত্যুর প্রতীক্ষায় সময় অতিবাহিত করতে লাগল। মৃত্যুকে সম্পূর্ণ স্বীকার ক'রে নেবার পর মৃত্যুভয় তার কাছে যেন ছায়াস্পর্শ অবাস্তব হয়ে গিয়েছিল। মৃত্যুঞ্জয়তার মহিমা তার চিত্তকে গভীর আত্মপ্রসাদের অনুভূতিতে পরিপূর্ণ করেছে। হীন মৃত্যুভয় এই মহিমার কাছে লজ্জিত হয়েই যেন তার আভিজাত্য-প্রাপ্ত চিত্তে প্রবেশাধিকার লাভ করে নি। সে নিজেকে সহজ ক'রে নিয়ে আসন্ন মৃত্যুর জন্যে নিশ্চিন্তে প্রস্তুত হবার ভূমিকা-স্বরূপ তার নোট-বই বার ক'রে কখন একটা উইল, কখন বা কমলাপুরীর ব্যবস্থা এবং কখন প্রয়াগ থেকে সীমার হাতে বন্দী হওয়ার ইতিহাস লিপিবদ্ধ ক'রে অবসর বিনোদনের অভিনয় করতে লাগল।

সীমার কল্যাণে তার আহারনিদ্রার সুব্যবস্থায় ত্রুটি ছিল না। কিন্তু এই নির্জন কারাবাসের ভাববিনিময়-পরিশূন্য নিঃসঙ্গতায় কয়দিন মাত্র ক্রমান্বয়ে কাটাবার পর এক সময় সভয়ে সচেতন হয়ে সে স্পষ্ট অনুভব করলে যে, এই মহা সুদীর্ঘ কয় দিনের মধ্যে এক মুহূর্তও সে মৃত্যুচিন্তা-

বিহীন নিরাময় শান্ত চিত্তে অতিবাহিত করে নি। যেমনই এই সম্বন্ধে তার চেতনা ফিরে এল, সেই মুহূর্তেই সমস্ত প্রিয়-পরিজন, তার কর্ম ও ধ্যানজগতের সমগ্র রসানুভূতিপূর্ণ অস্তিত্ব তাদের অমোঘ বিচ্ছেদের বেদনা নিয়ে মৃত্যুকে তার কাছে নিষ্ঠুর-ভয়ঙ্কর ক'রে তুললে। দুই হাতে মুখ ঢেকে সে তার খোকন, তার কমলা, তার পার্বতীর বিরহে অকস্মাৎ আকুল হয়ে উঠল।

৫৮

রঙ্গলাল চ'লে যাওয়ার পর সীমা স্তব্ধ হয়ে ব'সে তার ইতি-কর্তব্য সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগল। শচীন্দ্রনাথের কথা নিখিলনাথকে জানাতে পারলে না। তার দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে জ্যোৎস্নার স্বামী শচীন্দ্রকে মুক্তি দেবার তার কোন অধিকার নেই। তা ছাড়া রঙ্গলালের প্রতি শাস্তিবিধান করার পর তার দলের প্রতি কর্তব্য সাধনের দায়িত্বে নিজের দুর্বলতার উপর সে মনে মনে আরও কঠিন হয়ে উঠল। কতকটা নিখিলের সম্বন্ধে তার গোপন আকর্ষণের উত্তেজনায় যে সে রঙ্গলালকে শাস্তি দিয়েছে—এ কথা অন্তরে অন্তরে তার চিত্তকে পীড়িত করছিল। নইলে ইন্সপেক্টর হত্যা তাদের আইনে কিছু অন্যায় নয়, বরং তাদের কার্যতালিকার অন্তর্গতই। তবে হুকুম ছাড়া কোনো হত্যা—। যাক, ও কথা চিন্তা করার সময় আর নাই। শচীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপন করাবার সুযোগ সে দেবে না—মনে মনে এই রকম স্থির ক'রে সে জ্যোৎস্না এবং মালতীর সম্বন্ধে জানবার জন্য প্রশ্ন ক'রে নিখিলের দিকে চাইলে।

বাইরের বাগানের দিকে চেয়ে নিখিল চুপ ক'রে ব'সে ভাবছিল। তারই নালিশে রঙ্গলালকে শাস্তি দেওয়া হ'ল, এই রকম অনুভব ক'রে নিখিল অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিল। সীমার সতেজ নির্ভীক আচরণে

তার চিত্ত অধিকতর আকৃষ্ট হ'লেও সীমার কঠিন নির্মম দ্বিধাশূন্য শক্তির প্রচণ্ডতা তাকে যেন দূরে দ্বারের বাইরে ভদ্রতার সীমার ব্যবধানে সরিয়ে নিয়ে গেল। এই নারীকে বিপত্তরঙ্গপরিবেষ্টিত মৃত্যুপারাবারের সর্বনাশ থেকে শান্তিময় উপকূলে উত্তীর্ণ করবার উপায় সে যেন চিন্তা ক'রে উঠতে পারলে না।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে সীমা বললে, ইন্সপেক্টরের মৃত্যুর কোন প্রতিকার তো করা যাবে না; অন্য দিকে মালতীর যদি কোন উপকার করতে পারি তার ত্রুটি হবে না, এ আমাদের নারী-ভবনের প্রোগ্রামে আছে অবশ্য—আমাদের সাধ্যে যা সম্ভব। বলুন, কি করা যাবে?

ব্যক্তিগতভাবে মালতীর সাহায্য করা যে নিরাপদ নয় তা তো জান। অর্থের অনটন মালতীর সম্ভবত হবে না। জ্যোৎস্না দেবীকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে রেখেছি। তাঁর আত্মীয়স্বজনকেও সংবাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু— ব'লে সীমার বিপদের কথা বলতে গিয়ে সে সঙ্কোচে চুপ ক'রে গেল। সকলের বিপদ থেকে সীমাকে পৃথক ক'রে সাবধান করার স্বার্থপরতা সীমার কাছে প্রকাশ করতে তার লজ্জা বোধ করতে লাগল।

সীমা তার কথার ধুয়া ধ'রে নীরস কণ্ঠে নিজেই বললে, কিন্তু কিছুদিন এখানে আপনার আর আসা চলবে না, নিখিলবাবু। এই হত্যার অনুসন্ধানে পুলিস হন্যে হয়ে লাগবে। সুতরাং অকারণে আপনার নিজেকে এই বিপদের মুখে টেনে নিয়ে এসে কোন লাভ নেই। দরকার হ'লে আপনাকে সংবাদ দেওয়া—

আমার বিপদের কথা এখানে আসছে না। আমি বলছিলাম, তোমাদের ঠিকানা বদল ক'রে আপাতত এখান থেকে কিছুদিন অন্যত্র গিয়ে থাকা উচিত। আর যদি শোন তবে বলি যে, এই হত্যাকাণ্ডের বীভৎসতার মধ্যে নিজেকে আর জড়িও না, সীমা। এর দ্বারা দেশের

কি মঙ্গল করা যেতে পারে? এই সব হত্যায় দেশের জনসাধারণের চিত্ত তোমাদের অহেতুক নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। কি নিদারুণ. কি করুণ এই—

সীমা বাধা দিয়ে বললে. এ হত্যাটি কিছু অকারণ নয় নিখিলবাবু। আমিই কোনো সময় অবস্থা বুঝে এ হুকুম দিতাম হয়তো। তা ছাড়া, দেশের জনসাধারণকে বাইরে যতই নিরীহ নির্জীব মনে হোক, দেশ-দ্রোহীদের, ইংরেজের চাকরির লোভে দেশের প্রতি যারা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের, বিদেশী প্রভুর প্রসাদপুষ্ট প্রহরী কুকুরের পালকে মৃত্যুদণ্ড দিলে তারা উচিতদণ্ড ব'লেই জানে, মানে, খুশিই হয়। আপনার পরিচিত ব'লে আপনার কাছে এর নিষ্ঠুরতাটা এত বেশি বীভৎস লাগছে। সে যাই হোক, আমি আপনাকে সংবাদ না দেওয়া পর্যন্ত এখানে আপনার আর আসা চলবে না। আপনি যে আমাদের সাবধান ক'রে দিয়েছেন, তার জন্যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আপনি এখন আসুন। আমার অনেক কাজ আছে, এখনি আমাকে বাইরে যেতে হবে। মনে রাখবেন. কোন কারণেই এদিকে আর আপনি কিছুদিনের মত আসতে চেষ্টা করবেন না। এই রূঢ় আদেশের বিরুদ্ধে নিজের আবেদনের আর্জি নিয়ে অগ্রসর হতে নিখিল আর ভরসা পেল না। অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ মনে শ্রান্ত চরণে সে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে গেল।

সীমাকে এই সর্বনাশের পথ থেকে বাঁচাবার কোন উপায় করতে না পেরে তার মনটা হাহাকার করতে লাগল। কিন্তু সে কি করবে! সুখশান্তির প্রলোভন যার কাছে তুচ্ছ, প্রেমের মোহ যার কাছে পরিহাসের বস্তু, মৃত্যুর মহিমা নিয়ত যাকে আকর্ষণ করছে, তাকে সে নিরস্ত করবে কোন্ উপায়ে? হতাশ ক্লান্ত চিত্তে সে নিজের শূন্য গৃহে ফিরে গেল।

সীমা অনেকক্ষণ নিশ্চল হয়ে ব'সে চিন্তা করতে লাগল। অসংখ্য

বিপদের সম্ভাবনা নিয়েও নিখিল যে তাকেই বিপদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে অনুনয় করতে এসে তিরস্কৃত ব্যথিত হয়ে ফিরে গেল, তার বেদনা উন্মনস্ক সীমাকে অন্তরে অন্তরে পীড়িত করতে লাগল। যে পথে সে অগ্রসর হয়ে চলেছে তার থেকে নিবৃত্ত হয়ে নিরাপদ পন্থা গ্রহণ করবার উপায় নেই তার। সে কেমন ক'রে নিখিলের উপদেশে আবার শান্তির রাজ্যে ফিরে যাবে? চিন্তা করতে করতে সে ক্ষণেকের জন্যে যেন এক পরম রমণীয় কল্পনার রাজ্যে উপনীত হ'ল। যেখানে নিখিলের সহস্র মঙ্গল-প্রতিষ্ঠানের কর্মশক্তিরূপে সে পার্বতীর মত নিজেকে দান ক'রে আনন্দময় শান্তিময় পরম পরিতৃপ্তির মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করছে। যেখানে দেশের মানুষের মধ্যে জীবনের স্রোত উচ্ছল হয়ে উঠেছে; কর্মে, আনন্দে, প্রাণে, শক্তিতে দাসত্বের শৃঙ্খল আপনি খ'সে পড়েছে তাদের অঙ্গ থেকে; যেখানে এই মুক্তি-উৎসবের প্রাঙ্গণে নিখিলনাথের উৎসাহ-উদ্দীপনা, কৃতজ্ঞতা, আনন্দে উদ্ভাসিত আনন তাকে অভিনন্দিত করছে। সহসা সচেতন হয়ে সে দ্রুত উঠে পড়ল। সে কঠিন ভাবে নিজেকে ভৎর্সনা করলে, এ সে কোথায় চলেছে! এই কি তার গুরু সত্যবানের পরিশোধ? এই কি তার দাদা প্রফুল্লর শোণিতের মূল্য? ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপঃ। নিজেকে সে মনে মনে বারংবার নির্যাতন করতে লাগল। কিন্তু নিখিলের সেই তিরস্কৃত হতাশাপূর্ণ মুখ তার মনের অন্তস্তলে পরম স্নেহে আঁকড়ে ধ'রে রইল।

৫৯

সীমার কাছে প্রতিহত হয়ে নিখিল মালতীর বিষয়কর্ম এবং তার ও কমলার ভবিষ্যৎ ব্যবস্থার উদ্যোগে নিজেকে নিয়োজিত রেখে সীমার কঠিন ব্যবহার এবং তার বিপদের কথা বিস্মৃত হতে চেষ্টা করতে

লাগল। অক্লান্ত পরিশ্রমে সে নন্দলালের ব্যবসাসংক্রান্ত ব্যাপারগুলিকে যথাসাধ্য সুবিন্যস্ত ক'রে মালতী ও কমলার নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার ব্যবস্থায় নিজেকে কোন মতে অবসর দিল না। মালতীর বাপের বাড়ির আত্মীয়স্বজন বড় কেউ ছিল না। নন্দলালের বৃদ্ধা জননী নিতান্ত অথর্বপ্রায় অবস্থায় দেশের বাড়িতে তাঁর দূরসম্পর্কিত এক ননদের তত্ত্বাবধানে বাস করতেন। তাঁর পক্ষে তাঁর চিরাভ্যস্ত গৃহকোটর ত্যাগ ক'রে কলকাতায় মালতীর কাছে এসে থাকা সম্ভব হ'ল না। মালতীও তার দুর্দৈব নিয়ে অজয়কে ছেড়ে দেশের বাড়িতে কিছুতেই যেতে রাজী হ'ল না। অগত্যা সম্প্রতি কমলা এবং মালতীকে অপেক্ষাকৃত একটা ছোট বাড়িতে মালতীর গ্রাম-সম্পর্কে এক দরিদ্র বৃদ্ধ মাতুলের তত্ত্বাবধানে রাখার আয়োজন ক'রে নিখিল একটু অবসর পেল।

অবসর পাওয়ামাত্র সীমার বিপদের ভয় আবার তাকে পেয়ে বসল। কিন্তু কি উপায়ে সে সীমাকে নিরাপদ করতে পারবে, তার পথ সে মনে মনে খুঁজে পেল না। ভুলু দত্ত যত দিন পর্যন্ত সীমার সন্ধান না জানতে পারে, তত দিন সে এক রকম নিরাপদ—এটুকু সে বুঝেছিল; তাই ভুলু দত্তের কার্যকলাপের উপর দৃষ্টি রাখা প্রায় তার অভ্যাসের মধ্যে হয়ে পড়েছিল। অনন্যোপায় হয়ে তাই সে আজ অনেক দিন পরে ভুলু দত্তের বাড়ির দিকে যাত্রা করলে, বুলডগের ভাবগতিক বুঝে দেখবার উদ্দেশ্যে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। বিষয়কর্মবিরত পথিকের দল শ্রান্ত চরণে ফিরে চলেছে দলে দলে শান্তিপূর্ণ গৃহনীড়ের পথে। একটা অন্ধ ভিখারী একটা মাটির হাঁড়ি বাজিয়ে পরিত্রাণে গান ক'রে গলার শিরাগুলো ছিঁড়ে ফেলবে—এই তার পণ যেন, 'একবার বিদায় দেও মা ঘুরে আসি'। গানের বিষয়—ক্ষুদিরামের ফাঁসী, বিপ্লবীদের ইতিহাস ও

তার পরিণাম। এক দল লোক অবহিত হয়ে তাই শুনছে। মৃত্যুকে যারা পরোয়া করে না, তাদের উপর মনে মনে এই নিতান্ত নিরীহ ভয়ার্ত মূঢ় গড্ডলিকাযূথের কোথায় যেন একটু দরদ আছে। সে দরদের মধ্যে ইংরেজবিদ্বেষ বা রাজদ্রোহের নামগন্ধও নেই। একটা ছোট ছেলে সেই অন্ধের হয়ে পয়সা কুড়িয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিখিল তার হাতে অভ্যাসমত কিছু পয়সা দিল। দু-এক মিনিটের মধ্যেই একটা কাণ্ড ঘটল। পুলিসের একটি সার্জেণ্ট, একজন ছোটবাবু এবং দু-চারটি পুলিস এসে প্রবল বীরত্বের সঙ্গে লাঠিবাজি ক'রে ওই নিরীহ জনতাকে ছত্রভঙ্গ ক'রে দিয়ে অন্ধকে ধ'রে নিয়ে গেল। অন্ধ মূর্খ বর্ণজ্ঞানহীন, গান গেয়ে দু-একটা পয়সা পায়—গানের সাহিত্য, ফিলসফি, পলিটিক্‌স্ কিছুরই সে ধার ধারে না। নিখিল ভাবলে, সর্বত্রই এরা বিভীষিকা দেখছে। ব্যাপারটা হাস্যকর, কিন্তু নিখিলের মনটা খারাপ হয়ে গেল।

সে ধীরে ধীরে ভুলু দত্তের দরজায় গিয়ে পৌছল। পূর্বদিনই সে রঙ্গলালের প্রেরিত সীমার সংবাদ লাভ করেছে। সদর দরজায় আজ প্রহরী দুজন। তার পরিচিত যে-কন্‌স্টেব্‌লটি সেখানে থাকত, সে সসম্ভ্রমে উঠে তাকে অভিবাদন ক'রে জানালে যে, এত্তেলা না ক'রে আজ কারও যাবার হুকুম নেই। পুলিসের বাড়িতে এ ব্যাপারটা সামান্যই এবং স্বাভাবিক, তবু কি জানি কেন তার ত্রস্ত মনটা বাধা পেয়ে বিমর্ষ হয়ে উঠল।

কিছুক্ষণ পরে কন্‌স্টেব্‌ল এসে জানালে যে, হুজুরের যেতে বারণ নেই, সাহেব সেলাম দিয়েছেন।

নিখিল তার চঞ্চল মনকে যথাসাধ্য সংযত ক'রে নিয়ে চেষ্টাকৃত নিরুদ্বিগ্ন মুখে ভুলু দত্তের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলে। ঘরের বাইরেও দুজন পুলিস ছিল, তারা দাঁড়িয়ে সেলাম ক'রে তাকে পথ ছেড়ে

দিলে। এত পুলিসের প্রাচুর্য সে ভুলুর বাড়িতে পূর্বে কোন দিন দেখে নি। ঘরে প্রবেশ ক'রে তার মনটা রীতিমত দ'মে গেল। তবু প্রাণপণে নিজেকে স্বাভাবিক এবং শান্ত রেখে সে এগিয়ে গেল।

পুরো জঙ্গী পোশাকে ভুলু দত্তকে আজ একটা জাঁদরেল বুলডগেরই মত দেখাচ্ছে। মুখ তার একটা গোপন উত্তেজনায় ও আশায় প্রসন্ন, উত্তেজিত এবং যেন উচ্চকিত। সামনে টেবিলের উপর একটা রিভল্ভার। নিখিলকে দেখে একরাশ কাগজপত্র সরিয়ে সে বললে, আরে, এস এস। কোথায় ছিলে বল তো এতদিন? তারপর, বড্ড শুকনো দেখাচ্ছে যে? তোমার বউদির সঙ্গে দেখা ক'রে একটু চা-টা খাও গে, আমি আজ ভাই একটু ব্যস্ত। ঘুরেছ বোধ হচ্ছে টৈ-টৈ ক'রে সমস্ত দিন! কোথায় গিয়েছিলে? ক-দিন আগে তোমার খোঁজ করেছিলাম। নিখিল ক্লান্তভাবে একটা চেয়ারে ব'সে সহজ সুরেই বললে, আর বল কেন? হাসপাতালের জন্যে টাকার জোগাড় করতে একটা বিটকেল জায়গায় গিয়ে পড়েছিলাম। তা না মিলল অর্থ, না পেলাম মহাজনের দর্শন। বাব', সে কি এখানে! বিশ মাইল হেঁটে মারতে হয়েছে। তাও যদি কিছু পেতাম!

বটে? কোথায় হে, কার দরবারে?

আরে, ওই যে কমলাপুরীর মালিক, বল্লভপুরের জমিদার শচীন সিংহী। লোকটা বিস্তর দান-টান করে শুনি।

কার কাছে? ব'লে বুলডগ টেবিলের উপর দুই থাবা পেতে যেন কান খাড়া ক'রে সোজা হয়ে বসল, যেন অপ্রত্যাশিত কিছু একটা শুনছে।

শচীন্দ্রনাথ সিংহ—বল্লভপুরের জমিদার। কেন? অমনি ক'রে উঠলে যে, চেন নাকি? তার বুকের মধ্যে তোলপাড় করতে থাকলেও খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে সে কথাগুলো উচ্চারণ করলে।

ভুলু নিজেকে একটু সামলে নিয়ে পুলিসোচিত সংযত স্বরে বললে, চিনি নে ঠিক, তবে এ—। দেখা পেলে?

না, তবে বলছি কি? প্রয়াগে না কোথায় যেন বেড়াতে গেছে। কেন? তার সন্ধান জান না কি? ব্যাপারটা কি বল তো?

সন্ধান? হ্যাঁ, না, তা ঠিক জানি নে, তবে; হ্যাঁ, ব্যাপারটা একটু গুরুতর বই কি! তাকে কিডন্যাপ করেছে। তার ম্যানেজার কাল খবর দিয়েছে। এইটা নিয়ে পাঁচটা হ'ল। একটারও কিনারা আমাদের মহাত্মারা করতে পারেন নি। এটা আমি নিজে নিয়েছি, ইচ্ছে ক'রে। তুমি এসেছ ভালই হয়েছে। আবার কবে দেখা হয় কি না-হয়। যা কাজ, হাতের তেলোয় প্রাণটি নিয়ে নড়াচড়া।

বুলডগের কথাগুলো যেন কেমন রহস্যে ঢাকা।

নিখিলের ঠোঁট শুকিয়ে উঠছে, গলা কাঠ হয়ে যাচ্ছে। ভাবছে, ইস্, কি করেছি! এতক্ষণে যদি সীমারা তার সব শেষ ক'রে দিয়ে থাকে! উঃ, তা হ'লে জ্যোৎস্নার কাছে মুখ দেখানো অসম্ভব হবে। আমারই দুর্বলতায় বেচারার প্রাণটা গেল। আমি যদি দেরি না ক'রে আগে পুলিসে সংবাদ দিতাম! অনুতাপে সে অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হচ্ছিল। তবু সে নিজেকে বহু কষ্টে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে, এখুনি বেরুচ্ছ নাকি?

হ্যাঁ, এখুনি। বেশ একটু আয়োজন ক'রে নিতে হবে কিনা। মনে হচ্ছে, একটা বড় দাঁও মিলে যেতে পারে তোমার বউদির বরাতে। তুমি একটু ভিতরে যাও, ও বড় কান্নাকাটি করছে। এখন তোমায় কিছু বলব না, কাল যদি বেঁচে থাকি তবে সব শুনবে। তুমি ভাই ওকে একটু শান্ত কর গে। আরে, পুলিসের বউয়ের চোখ অত পানসে হ'লে কি চলে? যাই ভাই, প্রার্থনা কর, যেন আমার বহুদিনের আশা পূর্ণ

হয়। হয় এসপার না-হয় ওসপার, কি বল? ব'লে হা-হা ক'রে একটা শুষ্ক হাসিতে ঘরটা ভরিয়ে দিলে।

নিখিল স্পষ্ট দেখলে যে, একটা অনিশ্চিত-ফল আসন্ন ঘটনার উত্তেজনায় ভুলু দত্তর সমস্ত স্নায়ু আজ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। ঘটনাটা যে কি, তা কল্পনা ক'রে নিখিল তার অনুতাপ প্রায় বিস্মৃত হ'ল এবং এখনই ছুটে সীমাকে গিয়ে সংবাদ দেওয়া দরকার—এই কথাই মনে মনে ভাবতে লাগল। অথচ ভুলু দত্ত না বেরলে এবং ভুলু-পত্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎ না-ক'রে গেলে সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে ভেবে অল্প হাসিমুখে বললে, যাই ভাই, দেখি, বোঝাতে পারি কি না। গুড লাক। ব'লে আর অপেক্ষা না ক'রে নিজের দুর্দমনীয় উত্তেজনা সামলাতেই বোধ করি তাড়াতাড়ি উঠে সে ভিতরে গেল।

৬০

নিখিলনাথ যখন সীমার আস্তানায় গিয়ে পৌছল তখন রাত হয়েছে। রাত্রে তাকে আসতে দেখে সীমা আশ্চর্য হয়ে বললে, আপনি এই রাত্রে যে! কি ব্যাপার? ওঁ কি? আপনার এমন চেহারা হয়েছে কি ক'রে? খাওয়া-দাওয়া হয় নি বুঝি?

নিখিল নিজের মনের উত্তেজনা কষ্টে দমন ক'রে গম্ভীর মৃদু কণ্ঠে বলতে লাগল, সীমা, অত্যন্ত বিপদ উপস্থিত। ইন্‌স্পেক্টর ভুলু দত্তর নাম শুনেছ নিশ্চয়। সত্যদার মৃত্যুর পর তোমাদের অনুসন্ধানে সে-ই শ্রীরামপুর গিয়েছিল। তোমাকে পায় নি বটে, কিন্তু তোমাকে ধরবার চেষ্টায় সে এতদিন অপেক্ষা ক'রে ছিল। আজ যেমন ক'রেই হোক, সে তোমাদের আড্ডার সন্ধান পেয়েছে; এবং আজই সে তোমাদের বিরুদ্ধে বেশ বড় একটা চেষ্টা করবে। বিশেষ ক'রে তোমারই উপর তার আক্রোশ। আমার কথা শোনো; এখনি এখান থেকে পালাও।

নইলে, ভুলু দত্তকে তুমি ভাল ক'রে জান না, সে কোনো কিছু করতেই পিছ-পা হবে না। তাকে তার নাছোড়বান্দা একগুঁয়েমির জন্যে কলেজে আমরা 'বুলডগ' ব'লে ডাকতাম, সে আমাদের ক্লাস-ফ্রেণ্ড ছিল। আমার একান্ত অনুরোধ, অকারণে ধরা প'ড়ে প্রাণ হারিয়ে কোন লাভ নেই, সীমা।

সীমা বললে, প্রাণ হারিয়েই তো লাভ। আজ দাদারা প্রাণ দিয়েছে ব'লে প্রাণ হারানোর ভয় আমাদের ঘুচে গেছে। কিছু করবার শক্তি বা সুযোগ আমাদের নেই, তাই প্রাণটাকে পণ ক'রে দেশে প্রাণের সাড়া জাগাবার ব্রত নিয়েছি আমরা। ভুলু দত্তের সব খবরই আমি জানি। কোন একটা কারণে ভুলু দত্তের কৃপা আমাদের উপর পড়তে পারে জেনেই আপনাকে এখানে আসতে বারণ ক'রে দিয়েছিলাম। না শুনে আপনি ভাল করেন নি। এখন আপনাকে বাঁচাবার হাতও বোধ হয় আমার নেই। আমাদের বাড়ির চতুর্দিকে আজ সন্ধ্যে থেকে পুলিসের পাহারা আছে জানবেন। ঢুকতে বাধা পান নি বটে, কিন্তু বেরতে গেলেই ধরা পড়বেন।

নিখিল সন্ত্রস্ত হতাশ স্বরে বললে, জেনেও পালাও নি! এ কি করেছ তুমি? এখন কি উপায় করবে বল তো? আমার জন্যে আমি ভাবি না। এ আমার উপযুক্তই হয়েছে। তোমাদের থেকে আমার অপরাধ তো একটুও কম না। তোমাদের সব সংবাদ জেনেও আমি তার কোন প্রতিকার করি নি। আর আজ এই হত্যাকারী অ্যানার্কিস্ট্‌দের রক্ষা করবার জন্যই গুপ্তচর হয়ে এসেছি ছুটে। তোমাদের ভাগ্যে যে শাস্তি আছে তার থেকে যদি আজ বঞ্চিত হই, তবে আমার চেয়ে দুর্ভাগ্য কেউ নেই। কিন্তু কোন উপায়ই কি নেই? নিখিল ইচ্ছে ক'রেই শচীন্দ্রের কথা এড়িয়ে গেল, পাছে তার কোন দুঃসংবাদ শুনতে হয়।

সীমা বললে, উপায় আছে শুধু আমার পালাবার। কিন্তু আমার আরও পাঁচজন ভাই এখানে আছে, তাদের কি গতি হবে? ওদের ছেড়ে তো যাওয়া চলবে না। পালানো আমার হবে না। নইলে অকারণে পুলিসের হাতে প্রাণ দেবারও আমাদের নিয়ম নেই। আর পালাবার ইচ্ছে আমার নেই। আমাদের নিজেদের মধ্যেই ঘুণ ধরেছে। নইলে আজকের এই অতর্কিত বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা ছিল না, নিখিলবাবু। সীমার স্বর ক্লান্ত গভীর মনস্তাপব্যঞ্জক।

মানে?

মানে যা বলছি তাই। নইলে যে ব্যবস্থা এবারকার আয়োজনে আমরা করেছিলাম, তাতে আপনার বুলডগের সাধ্য ছিল না আমাদের গন্ধ পায়। তা আর হতে দিল না নিখিলবাবু, সব নষ্ট হয়ে গেল। খেলো ড্রামাটিক কিছু একটা ক'রে জগৎকে তাক্ লাগিয়ে দিতে না পারলে—। ব'লে হঠাৎ সামলে নিয়ে বললে, কিন্তু সে যাই হোক, আপনার নিশ্চয় খাওয়া হয় নি। তার ব্যবস্থা কিছু করা যায় কি না আগে দেখি।

নিখিল ব্যস্ত হয়ে বললে, সীমা শোনো, খিদে-টিদে আমার পায় নি। তুমি ওসব রেখে বাঁচবার চেষ্টা কর। একদিনের জন্যেও অন্তত আমার অনুরোধ রাখ, সীমা।

সীমা হেসে বললে, শ্রীরামপুরে যে পিণ্ডি খাইয়েছিলাম, তাই মনে ক'রে বুঝি ভয় পাচ্ছেন? এখানে তার চেয়ে কিছু ভাল ব্যবস্থা করতে পারব। বরং চলুন, আমাকে যদি কিছু সাহায্য করতে পারেন। কি বলেন?

সীমার পরিহাসের মধ্যে স্নেহের স্পর্শটুকু পেয়ে নিখিল মনে মনে কৃতার্থ বোধ করলে। কিন্তু এই সমূহ বিপদের সময়ে সীমার অসীম ঔদাসীন্যে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে বললে, সীমা, আজ রক্ষা পেলে তোমার

নিমন্ত্রণ আমার তোলা রইল। চল, দেখি, কোন উপায় করা যায় কি না!

বৃথা, নিখিলবাবু, চেষ্টার কোন রাস্তা নেই। আপনাকে তো বলেছি যে, আমাদের পালাবার উপায় একেবারে বন্ধ। ওসব কথা মিছে ভেবে কোন লাভ নেই আর। তার চেয়ে, আপনি ক্লান্ত হয়েছেন, চলুন, আপনাকে শুইয়ে দিই গে। আপনি একটু বিশ্রাম ক'রে নিন ততক্ষণ। খাবার হ'লে আপনাকে ডেকে তুলব না হয়! ব'লে সীমা তাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেল।

নিখিল সীমার মৃত্যুভয়হীন এই নিশ্চিন্ত দৃঢ়তার কাছে অবশেষে হার মানলে। মনে মনে প্রস্তুত হয়ে ভাবলে, আজ ওর সঙ্গে এক পরিণামের সৌভাগ্যই আমার জীবনের পরম সম্পদ হয়ে থাকুক। শান্ত চিত্তে মৃত্যু সাক্ষী ক'রে আজ আমাদের মিলন ঘটুক। এমন প্রত্যক্ষ জীবন্ত সত্য সাক্ষী কার ভাগ্যে আর জুটেছে!

সীমা সযত্নে পরিপাটি ক'রে বিছানা প্রস্তুত করলে। হাসতে হাসতে বললে, আমাদের অ্যানার্কিস্ট্ ব'লেই চিনে রেখেছেন; তাই আমরা যে মেয়ের জাত—সে কথা আপনাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। আপনি শ্রান্ত, চিন্তাক্লিষ্ট, ক্ষুধার্ত হয়ে আমার কাছে এসেছেন, আর আমি কোন্ মুখে আপনার একটু সেবাযত্ন না ক'রে বিদায় দেব বলুন তো? আমাদের বাইরের এই কদাকার রূপটাই আপনারা দেখেন, ভিতরের মানুষটার উপর আপনাদের চোখ পড়ে না, না নিখিলবাবু? ব'লে সে নিখিলের দিকে আর না ফিরেই দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরিপূর্ণ পুলকে, গর্বে, দুঃখে নিখিলের চোখ জলে ভ'রে এল। সীমার স্নেহ-সংরচিত শুভ্র শয্যায় তার ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে নিখিল মুদ্রিত নেত্রে সীমার অন্তরবাসিনী স্নিগ্ধ সত্তাকে নিবিড়ভাবে হৃদয়ে অনুভব করতে লাগল। সম্মুখের বিপদ, পশ্চাতের বিবেকের তাড়না,

সমস্ত জগতের বাস্তব অনুভূতি তার কাছে মিলিয়ে এল এবং পরম নিশ্চিন্ত ও সুনিশ্চিত এক রসানুভূতিতে তার চিত্ত পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

* * *

দুশ্চিন্তার অবসান হওয়ায় এবং সমস্ত দিনের ক্লান্তিতে নিখিল ঘুমিয়ে পড়েছিল। রান্না শেষ ক'রে সীমা যখন উঠল, তখন রাত বারোটা বেজে গেছে। সে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে শুচি হয়ে তার তনুদেহ-লতাটিকে একখানি কৌষেয় বস্ত্রে আবৃত ক'রে নিদ্রিত নিখিলের শয্যার পাশে এসে দাঁড়াল। আজ যেন এই এক রাত্রের আনন্দে তার সমস্ত জীবন যৌবন তার নিখিল,ভুবন নারীত্বের গৌরবে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। ওই যে স্নেহশীল নিঃস্বার্থ মানুষটি তারই রচিত শুভ্র শয্যায় শুয়ে নিশ্চিন্ত আরামে ক্ষণকালের জন্যও তার পরিবেশিত সেবা সম্ভোগ করতে পেরেছে, সীমার জীবনে এর চেয়ে পরিতৃপ্তির বস্তু যেন কিছুই সে মনে করতে পারে না। আজ সমস্ত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই মৃত্যু-সাগরের বিস্মৃতির কূলে ওরা দুটিতে যেন একটি চিরস্মরণীয় স্নিগ্ধ কোমল শান্তিনীড় রচনা করেছে। নিখিলের নিদ্রিত শ্রান্ত মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে তার চোখ দিয়ে দুই বিন্দু অশ্রু ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়ল। সে অশ্রু আসন্ন বিরহজনিত শোকের, না, পরিপূর্ণ আনন্দময় অনুভূতির, আজ তা কে বলতে পারে! সাবধানে নয়ন মার্জনা ক'রে গিয়ে সে নিখিলকে ডাকল। নিখিল চোখ খুলে দেখলে, তার সামনে দাঁড়িয়ে সীমা—সদ্যস্নাত, শুচি-বস্ত্রপরিহিত, স্নানসিক্ত মুক্তবেণী, শুভ্র, সুন্দর, শুচিস্মিতা পূজারিণীর ছবির মত যেন। মনে হ'ল, আজকের এই উৎসব-রজনীর জন্য সে সমস্ত জীবন, জন্ম-জন্ম প্রতীক্ষা ক'রে ব'সে ছিল। সার্থক তার এই এক রাত্রির পরম রজনী। পরিপূর্ণ পুলকিত শুদ্ধ হৃদয়ে নীরবে উঠে সে সীমার রচিত আসনে গিয়ে বসল। যেন দেবতার আসনে ভক্তের অর্ঘ গ্রহণ করবার সৌভাগ্য তার।

আজকের আয়োজনে প্রাচুর্য ও নৈপুণ্য ছিল। সীমা তার এই একটি দিনের আয়োজনের মধ্যে তার এতদিনকার বঞ্চিত হৃদয়ের সমস্ত সুধা যেন নিঃশেষে উজাড় ক'রে দিয়েছিল। নিখিল আহার্যের বৈচিত্র্য এবং পরিমাণ দেখে হেসে বললে, আলাদীনের প্রদীপটা যোগাড় করেছ নাকি! এত সব পেলেই বা কোথায়, করলেই বা কখন? অঁ্যা! ব'লে খুব লোভী বালকের মত আহারে মন দিলে।

আহার শেষ হ'লে সীমা মৃদু হেসে বললে, নিখিলবাবু, ভবিষ্যতে এই দুরন্ত প্রগল্‌ভ মেয়েটাকে যদি কখনও মনে পড়ে, তবে অনেক দিনের দুর্ব্যবহারের সঙ্গে, আজকের কথাটাও একটু মনে করবেন তো?

সীমা, আজকের আনন্দ আমার সমস্ত জীবনের পরম সম্পদ হয়ে রইল। আমার দুঃখ এই যে, এমন অমূল্য জীবনটাকে জগতের সেবায় লাগাতে পারলাম না। আজ আমার ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছে যে, ধ্বংসের দ্বারা মানুষের মুক্তি হয় না, মানুষের মুক্তি তার সৃষ্টিতে। সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে তারই ইঙ্গিত ধ্বনিত হচ্ছে। গাছ তার পাতাকে ধ্বংস ক'রে সুন্দর হয় না, সে তার অন্তরের পরিপূর্ণ নূতন সৃষ্টির বিকাশের প্রেরণায় পুরাতনকে ঝরিয়ে দেয়। সেখানে পুরাতনের ধ্বংসের পশ্চাতে থাকে নূতনের সৃজনলীলা। সেই সৃষ্টির জোয়ারের মুখে পুরাতন আপনি খ'সে যায়। ধ্বংস ক'রে নিয়ে বাইরের থেকে সৃষ্টি করা চলে না। সৃষ্টির মধ্যে বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে তাই 'অ্যানার্কি' কোথাও নেই। ওটা একটা সৃষ্টিছাড়া প্রকৃতিবিরুদ্ধ জিনিস। তোমার মধ্যেকার সেই সুন্দর স্বাভাবিক তেজোময়ী সৃজনশক্তিকে দেশের দুর্দশা মোচনে লাগাতে পারলাম না, এই দুঃখই আমার র'য়ে গেল।

সীমা আজ কোন তর্ক করলে না। তার মন আজ যে-সুরে বাঁধা

ছিল, তর্কের তীব্রতা সেখানে গিয়ে পৌঁছয় না। সে হেসে বললে, নিখিলবাবু, আপনি আজ আর আমার কথা ভেবে দুঃখ করবেন না। পরিপূর্ণ বিশ্বাস এবং নিষ্ঠার সঙ্গে যদি এ পথে কাজ ক'রে থাকি, তবে বিশ্বাস এবং নিষ্ঠাটুকুর মঙ্গলপ্রভাব থেকে আমার দেশ বঞ্চিত হবে না। আপনি আপনার অপরাজেয় দেশপ্রীতি দিয়ে নূতন মানুষ গ'ড়ে তুলুন— দেশকে যারা শান্তিতে আনন্দে মুক্তির পথে নিয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে আপনার রক্ষার একটা ব্যবস্থা মনে এসেছে, সেইটুকু করতে হয়।

আমার রক্ষা! তোমাদের যা গতি, আমি সেই গতিই আজ একান্ত মনে প্রার্থনা করছি। আমি—

তা হয় না নিখিলবাবু। আপনার আরও কর্তব্য আছে। আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে, হতভাগিনী জ্যোৎস্নার স্বামীকে উদ্ধার ক'রে তাকে সুখী করবার ভার আপনারই। শুনুন, আপনাকে বলা হয় নি। কিন্তু আর তো সময় নেই। তাই আপনাকে জানাচ্ছি। শচীনবাবু আমার এখানেই বন্দী আছেন।

শচীনবাবু এখনও বেঁচে আছেন? নিখিলের বুক থেকে একটা দুশ্চিন্তা যেন নেমে গেল।

হ্যাঁ। আমি ভেবেছি, তাঁর ঘরে আপনাকে একই সঙ্গে বন্দী ক'রে রেখে দিই। তা হ'লে পুলিস এসে আর আপনাকে আমাদের দলের ব'লে অত্যাচার করবার কোনও কারণ পাবে না।

নিখিল এবার জোর দিয়েই বললে, তা কিছুতে হবে না, সীমা। তোমাকে এই বিপদের মুখে ফেলে এক পাও নড়ব না। মিছামিছি ও-অনুরোধ আমাকে ক'রে কোন লাভ নেই।

বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সীমা নিখিলকে কিছুতেই সম্মত করাতে পারল না।

এমন সময় স্তব্ধ রজনীকে সচকিত ক'রে একটা বন্দুকের আওয়াজ গর্জে উঠল। নিখিল ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল।

সীমা হেসে বললে, বসুন, আমি আসছি। এ বন্দুক আমাদের ছাদ থেকেই ছোঁড়া হয়েছে। রঙ্গদার উৎসব শুরু হ'ল। এর জন্মে বেচারা এতদিন অপেক্ষা করেছে। ব'লে সে বেরিয়ে গিয়ে সব দরজা ভাল ক'রে বন্ধ ক'রে দিয়ে এসে বসল। তার মুখে ব্যর্থতার একটা তিক্ত হাসি ফুটে উঠল। নিখিলের দিকে চেয়ে বললে, দিলে না নিখিলবাবু, দিলে না এরা দেশটাকে স্বাধীনতার রাস্তায় নিয়ে যেতে। সে দিকে কারোরই দৃষ্টি নেই। সকলেই যেন রঙ্গমঞ্চের পাদদীপের সামনে দাঁড়িয়ে অভিনয় করছে, আর তাকিয়ে আছে গ্যালারির দিকে বাহবার প্রত্যাশায়। দেশের স্বাধীনতার কথা গভীর ক'রে, আত্মপ্রচারের থেকে বড় ক'রে, কেউ ভাবলে না। হায় হায়! গড়বার ধৈর্য হ'ল না ওদের, নইলে এমন মৃত্যুভয়শূন্য মানুষ কি সহজে পাওয়া যায় নিখিলবাবু? যে দেশের জন্মে ওরা প্রাণটাকেও তুচ্ছ করেছে, তার চেয়েও মোহ ওদের ঐ অ্যাডভেঞ্চারের ওপর, দুনিয়াটাকে চমকে তাক লাগিয়ে দেবার। তাই আজ আমার সব নষ্ট হয়ে গেল।

৬১

রঙ্গলাল তার পাঁচটি অনুচর নিয়ে সমস্ত রাত যথাসাধ্য বিস্তৃত আয়োজন ক'রে ছাদে অপেক্ষা করছিল। ভুলু দত্তকে সে যে বর্ণনা দিয়েছিল, তাতে একটা প্রকাণ্ড দলের বিরুদ্ধে যে পুলিসকে লড়াই করতে হবে—এমনই একটি আভাস দেওয়া ছিল। কোন ছোটখাট ছিঁচকে ব্যাপারে আয়োজনার গুরুত্ব এবং উত্তেজনা লঘুক্রিয়ায় পরিসমাপ্ত না হয়, এ বিষয়ে রঙ্গলাল চেষ্টার ত্রুটি করে নি। ভুলু দত্তও প্রকাণ্ড আশায় বিপুল বাহিনী নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছিল।

একটা বৃহৎ বাগান। বড় বড় প্রাচীন পাদপশ্রেণীতে রাত্রে প্রায় অরণ্যের মত মনে হয়। গাছের আড়ালে আড়ালে নিজেদের রক্ষা ক'রে বাড়ির দিকে অগ্রসর হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ ও নিরাপদ। বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে একটা স্বল্পাধিক বিস্তৃত উন্মুক্ত অঙ্গন। সেইখানটাতেই বিপদের সম্ভাবনা জেনে ভুলু দত্ত বাড়ির চতুর্দিক বেষ্টন ক'রে বড় বড় গাছের গুঁড়ির অন্তরালে যথাসম্ভব নিজের বাহিনীকে সংযোজিত ক'রে রাখলে।

শেষরাত্রের দিকে গোপনে অগ্রসর হয়ে অকস্মাৎ আক্রমণ করা যায় কি না ভেবে সে একবার এগোবার চেষ্টা করলে। রঙ্গলালের দল প্রস্তুতই ছিল; দ্বিধামাত্র না ক'রে তারা ছাদের উপর থেকে এক মুহূর্তে আক্রমণ শুরু করলে। পুলিসের দলের দুজন মৃত এবং ছজন আহত হয়েছিল। দত্ত দেখলে, গুলির মুখে এগিয়ে গেলে অকারণে নরহত্যা তথা বলক্ষয়ের সম্ভাবনা। সে আবার হ'টে গাছের আড়ালে চ'লে গেল এবং নির্বিবাদে ছাদ লক্ষ্য ক'রে গুলি চালাবার হুকুম দিলে। তার ইচ্ছা ছিল যে, যদি অগ্রসর হতে নাও পারা যায়, তবে শত্রুপক্ষের গুলির রসদকে এই উপায়ে ক্রমে নিঃশেষ ক'রে ফেলবে।

তার এই মতলব সম্পূর্ণ ব্যর্থ হ'ল না। রঙ্গলালের গোলাগুলির আয়োজন অত্যন্ত অধিক ছিল না। যুদ্ধ ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতাও কিছু মাত্র নেই। সীমা একদিন ঠিকই বলেছিল যে, 'দুঃসাহস তার যতটা আছে, বুদ্ধি যদি তার ততটা থাকত, তবে ভারতবর্ষে তার তুলনা থাকত না।' সে প্রথম ভুল করেছিল ছাদের উপর আশ্রয় নিয়ে। মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা ক'রে পুলিসবাহিনী যে সুবোধ ছেলের মত মুক্ত অঙ্গনে অকারণে তাদের বন্দুকের 'চাঁদমারি' হতে এগিয়ে এসে লড়াই করবে না, এটা তার মাথায় আসে নি। ছাদের উপর থেকে

গুলি চালাতে গেলে গাছের বিস্তীর্ণ শাখাপল্লবাশ্রয়কে ভেদ ক'রে যে আক্রমণ করা সম্ভব নয়, অথচ বৃক্ষকাণ্ডের অন্তরালে নিজেদের রক্ষা ক'রে শাখাপল্লবের অবকাশ-পথে তাদের প্রত্যভিবাদন করা যে পুলিসের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ, সে কথা পূর্বে তার মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নি। পুলিস যে তাদের বিষম আক্রমণে হ'টে গিয়ে পেছিয়ে গেল, এই আনন্দেই সে প্রথমটা বিপুল বিক্রমে গুলি চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু প্রতিপক্ষের আক্রমণও নিরস্ত ছিল না। ছাদের আলিসার প্রত্যেকটি রন্ধ্র লক্ষ্য ক'রে অনবরত গুলির পর গুলি তারা ছাড়ছিল। তাতে ফল নিতান্ত খারাপ হয় নি। রঙ্গলালের দলের একজন মৃত ও অন্য সকলেই অল্পবিস্তর আহত হয়েছিল। ঘণ্টা দুয়েক এমনি যুদ্ধ চলবার পর ইন্দ্রজিৎ সাহস ক'রে বললে, রঙ্গদা, গুলি তো প্রায় ফুরিয়ে এল। শেষে কি খালি হাতে গিয়ে ওদের কাছে ধরা দিতে হবে? তখন তাদের দলের আরও একটি ছেলে মারা গেছে।

ধরা দেবার কথাতেই রঙ্গলালের সব চেয়ে আতঙ্ক, সব চেয়ে আপত্তি। সে বললে, কি করতে চাও, বল।

নীচের ঘরে চল, জানলা দিয়ে গুলি চালাবে। তাতে না হ'লে বেরিয়ে পড়ব। মরতে তো হবেই।

রঙ্গলাল উৎসাহিত হয়ে বললে, বেশ, তাই চল। বিনা রক্তপাতে মরা হবে না।

যুদ্ধের অভিজ্ঞতা দুজনেরই সমান।

নীচের ঘরের দরজা জানালার আড়ালে ব'সে নূতন ক'রে তারা আক্রমণ শুরু করলে। অজস্র রক্তপাতে রঙ্গলাল এবং তার সঙ্গীদের দেহ ক্রমে অবসন্ন হয়ে আসছিল; কিন্তু উৎসাহের তাদের অন্ত ছিল না। কিন্তু জীবনীশক্তি ক্রমেই তাদের ক্ষয় হয়ে আসছিল। রসদও

নিঃশেষপ্রায়। দুটি ছেলে সংজ্ঞা হারিয়ে রঙ্গলালের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল। রঙ্গলাল পলকের জন্য তাদের দিকে ফিরে তাকাল। এতক্ষণে রঙ্গলাল তাদের ভুল বুঝতে পারলে। ছাদের উপর থেকে বাড়ির চতুর্দিকের আক্রমণকে প্রতিহত করা সহজ ছিল। কিন্তু সকলেই ছাদ থেকে নেমে আসাতে মাত্র একটি দিকের উপর তাদের প্রভুত্ব থাকল। এই ত্রুটিটুকু ভুলু দত্তের লক্ষ্য করতে বিলম্ব হয় নি। পশ্চাৎ দিক থেকে বাড়ি চড়াও করার এই সুযোগ সে ছাড়লে না। লোকও অপেক্ষাকৃত বেশি মারা যাচ্ছিল এখন ওদের। নিচে এসেই রঙ্গলালের দল অতর্কিত পুলিস-বাহিনীকে আক্রমণ ক'রে বিব্রত ক'রে তুললে। পুলিস দল আবার গাছের আড়ালে স'রে গেল। এখন পর্যন্ত পুলিসের তেরোজন হত এবং একাদশজন আহত হয়েছিল। ভুলু দত্ত আর দেরি না ক'রে অল্প কয়েকজন সামনে মোতায়েন রেখে সে নিজে ঘুরে বাড়ির পিছন দিক থেকে গিয়ে দরজা ভেঙে বাড়িতে প্রবেশ করলে।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ইন্দ্রজিৎ বললে, রঙ্গদা, ওরা যে আমাদের আব্রু ভাঙতে চলল। আমি ওদিকে যাই, কি বল?

রঙ্গলাল ওর দিকে না ফিরেই বললে, যাও; একটাকেও ছেড়ো না। কাল বিচার হবে। বন্দে মাতরম্!

বন্দে মাতরম্—ব'লে ইন্দ্রজিৎ চ'লে গেল। অতিরিক্ত রক্তপাতে ইন্দ্রজিতের পা টলছে। বন্দুক রেখে দুটো রিভলভার দুই হাতে নিয়ে সে টলতে টলতে ভিতরের দিকে গেল। ভুলু দত্তরা তখন দরজা ভেঙে বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়েছে।

ইন্দ্রজিতের সমস্ত শরীর রক্তাক্ত; চোখে মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়ে আসছে, পা আর চলতে চাইছে না। তবু সে বেপরোয়া গুলি চালাতে চালাতে, এগিয়ে এল ওদের সামনে। গুলি খেয়ে সামনের দুজন

সেপাই হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে গেল। একটা গুলি ভুলু দত্তের কাঁধের খানিকটা মাংস আর কাপড় ছিঁড়ে নিয়ে উড়ে গেল। উন্মাদের মত হা-হা ক'রে হেসে উঠল ইন্দ্রজিৎ। ভুলু দত্ত একটা বাঘের মত লাফ দিয়ে এগিয়ে এল। কিন্তু তার আগেই একসঙ্গে অনেকগুলো গুলির চোট খেয়ে ইন্দ্রজিতের শেষ হয়ে গেছে।

রঙ্গলাল দেখলে, আর কোন আশা নেই। তখন অনিল আর সে—দুই জনে নিজেদের সমস্ত শক্তি সংহত ক'রে নিয়ে, দরজা খুলে সেই মুক্ত প্রাঙ্গণে অজস্র গুলির মুখে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল নিশ্চিত মৃত্যুর আলিঙ্গনের মধ্যে বিপুল বিক্রমে। একটা গুলির চোট খেয়ে তার সঙ্গী অনিল চেঁচিয়ে বললে, রঙ্গদা, চললাম। বন্দে মাতরম্—

রঙ্গলাল তার শেষ গুলিটা বন্দুকে ভরতে ভরতে বললে, একটু সবুর, এই এলাম ব'লে!

সীমার দুই চোখ দিয়ে আগুন বেরচ্ছে যেন। তার অনুচরদের সে নিজের ভায়েরই মত ভালবাসত। অনিল ও রঙ্গলালের কথা স্পষ্ট তার কানে এল। প্রত্যেকটি মৃত্যু সে যেন প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছে। রিভল্‌ভারটা হাতে ক'রে সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। তারপর নিখিলের দিকে ফিরে বললে, এমন কোথাও দেখেছেন? দাদাদের কথা আজ মনে পড়ছে। মৃত্যু যেন একটা মুহূর্তেকের পরিহাস। এবার আমায় বিদায় দিন। প্রার্থনা করুন, যেন ফিরে বার স্বাধীন ভারতে জন্ম নিতে পারি। আর আপনার মত বন্ধুকে যেন দুঃখ না দি।

এই ব'লে সীমা অকস্মাৎ নত হয়ে নিখিলের পায়ের ধুলো নিতেই নিখিল তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে দুই বাহু ধ'রে তাকে সস্নেহে তুলে নিল।

সস্মিত নয়নের পরিপূর্ণ প্রসন্ন দৃষ্টি নিখিলের উদ্ভাসিত আননের উপর স্থাপন ক'রে সীমা নিখিলের চরিতার্থ হৃদয়ের নিবিড় আনন্দ আপনার নিবেদিত চিত্তের মধ্যে অনুভব করলে।

এমন সময় বন্ধ দ্বারে ভীষণ তাড়নায় দরজা ভাঙবার উপক্রম হ'ল। নিখিলের বাহু থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে সীমা ফিরে রিভল্‌ভারটা একবার দরজার দিকে লক্ষ্য ক'রে দাঁড়াল। তারপর নিখিলের দিকে ফিরে তারই কথার পুনরাবৃত্তি ক'রে হেসে বললে, কি হবে একটা দুটো খুন ক'রে, কি বলেন? সেই মুহূর্তে দরজা পড়ল ভেঙে এবং পর-মুহূর্তেই নিজের বুকের উপর গুলি চালিয়ে দিয়ে সীমা নিখিলের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল।

পুলিস-বাহিনীর দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না ক'রে পাগলের মত নিখিল হাঁটু গেড়ে সীমার মুখের উপর ঝুঁকে প'ড়ে "সীমা সীমা, এ কি করলে, সীমা! এমনি ক'রে কিসের শোধ নিলে তুমি? সীমা, সীমা, সীমা!" ব'লে সে ক্রমাগত ডাকতে লাগল। মরণোন্মুখ সীমার মুখে অল্প একটু হাসির রেখা ফুটে মিলিয়ে গেল।

ভুলু দত্ত ঘরে ঢুকেই 'সীমা' নাম শুনে বললে, সীমা! কই সীমা?

নিখিল হা-হা-হা-হা ক'রে একটা উন্মাদের হাসি হেসে দাঁড়িয়ে উঠে ভুলু দত্তকে বলতে লাগল, বুলডগ, পারলে না, পালিয়েছে। তোমার দাঁতের ধার আর পরীক্ষা করবার সুযোগ দিলে না। হা-হা-হা-হা।

এ কি নিখিল! তুমি এখানে! তুমিও?

হ্যাঁ, আমিও। একটুও দয়া ক'রো না আমাকে, একটুও না। তোমাদের বন্দুকে কি একটাও গুলি আর বাকি নেই? ওদের চেয়েও অপরাধী আমি। ওদের অপরাধ বিশ্বাসে, আর আমার পাপ লোভে। কিছুমাত্র দয়া ক'রো না আমাকে।

ভুলু দত্ত দেখলে যে নিখিলের মস্তিষ্ক কিছু উত্তেজিত হয়েছে। আর বাক্যব্যয় না ক'রে তাকে গ্রেফতারের হুকুম দিয়ে অত্যন্ত গম্ভীর চিন্তিত মুখে সে সমস্ত বাড়িটা অনুসন্ধানের জন্য বেরিয়ে গেল।

আজকের অভিযানে ব্যক্তিগত আনন্দের ও জয়ের যে আত্মপ্রসাদ, তা যেন কিসের ছায়াপাতে ম্লান হয়ে গিয়েছে।

* * *

দু-এক দিনের মধ্যেই নিখিল শান্ত হয়েছিল। হাজতে একদিন ভুলু দত্তকে ডেকে নিয়ে সে বললে, আমার একটা অনুরোধ তোমার কাছে আছে—শচীন সিংহ সম্বন্ধে। যদি হাজতে তাঁকে আমার সঙ্গে দেখা করতে দাও তবে তাঁকেই সব বলব। নইলে অগত্যা তোমাকেই ব'লে যেতে হবে।

ভুলু দত্ত বললে, সে হুকুম তো এখন আমি দিতে পারব না। আমাকে বলতে যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তবে বলতে পার।

নিখিল তখন তাকে কমলার মোটামুটি ইতিহাস সংক্ষেপে ব'লে বললে, ডাক্তার হিসেবে বলছি, হঠাৎ শচীনবাবুকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত ক'রো না। তাদের বৃদ্ধ ভৃত্য ভোলানাথ—

ভুলু বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ম্যানেজারের সঙ্গে ওই নামের একজন এসেছিল বটে। লম্বাচওড়া বুড়ো মানুষ।

হ্যাঁ, তাকে দিয়ে সাবধানে সংবাদ দিও। নইলে, হঠাৎ সংবাদ দিলে ফল ভাল নাও হতে পারে। আমার বন্ধু হিসাবে ওইটুকু ব্যবস্থা তুমি ক'রো। সম্মত হয়ে ভুলু দত্ত চ'লে গেল।

৬২

কমলার সংবাদে শচীন্দ্রনাথের চিত্ত যে পরিমাণ আনন্দের উত্তেজনায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠবার কথা, সেই অবাধ আনন্দ যেন তার চিত্তে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে চাইল না। বহু দিনের পর তার একান্ত বাঞ্ছিতের মিলনের অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা, তার মিলনের সুনিশ্চিত সম্ভাবনায় আকস্মিক আঘাতে যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ল। এতদিন তার জীবনে যে বিরাট

বিরহকে নিজের চিত্তের একান্ত অবলম্বনরূপে জাগিয়ে রাখার আত্ম-প্রসাদে সে মগ্ন ছিল, সহসা তার সেই মহত্ত্বের অধিকারে অপ্রত্যাশিত-ভাবে বঞ্চিত হয়ে, পাওয়ার আনন্দের মধ্যেও একটা সৃষ্টিছাড়া কর্মসূত্র-বিচ্ছিন্ন নিরবলম্বতা তার চিত্তকে এসে অধিকার করলে। কয়েক মুহূর্ত সে চিন্তালেশশূন্য নিষ্ক্রিয় চিত্তে স্থির হয়ে ব'সে রইল। তারপর এক সময় পার্বতী, কমলাপুরী, সিংহযোড় প্রভৃতি নানা অসম্বদ্ধ চিন্তা তার মস্তিষ্কের কুলায়ে অন্ধপক্ষীশাবকের মত চঞ্চল হয়ে উঠল।

নিখিলনাথের কাছ থেকে শোনা কমলার অভূতপূর্ব কাহিনী শেষ ক'রে ভুলু দত্ত বললে, শচীনবাবু, নিখিল একটা অনুরোধ জানিয়েছে আপনাকে ডাক্তার হিসেবে; আপনি হঠাৎ গিয়ে দেখা করলে আপনার স্ত্রীর পক্ষে সেটা ক্ষতিকর হওয়া সম্ভব। আচমকা একটা অভাবনীয় আনন্দের ঘা খেলে তাঁর স্মৃতি কিংবা তাঁর স্নায়ু সে আঘাত সহ্য নাও করতে পারে। তাই আপনাদের চাকর ভোলানাথের সহায়তায় ধীরে ধীরে সাবধানে একটু এগনো দরকার। আনন্দ-উৎসব তো প'ড়েই রয়েছে—কি বলেন? কিন্তু কি অদ্ভুত ব্যাপার বলুন তো! ভাগ্যিস আমি ঠিক সময়ে গিয়ে পড়েছিলাম, নইলে—হাঃ হাঃ হাঃ—একেই বলে 'কারু পৌষ মাস কারু সর্বনাশ'। আমি তা হ'লে আসি এখন। নমস্কার।

ভুলু দত্তের কথার ধাক্কায় যেন সচেতন হয়ে সে অতিরিক্ত ক'রে ভুলুকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগল, এবং এক প্রকার লজ্জিত হয়েই যেন নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে কমলার জন্যে এই কয় বছর যে সে কি রকম মনোবেদনা সহ্য করেছে, এবং স্ত্রী যে তার সমস্ত জীবনের কতখানি অধিকার করেছিল, এমন কি তার প্রতি একান্ত প্রেমে সে যে কমলাপুরী নারী-প্রতিষ্ঠানের স্মৃতিমন্দির রচনা ক'রে একাগ্র চিত্তে তারই ধ্যানে নিমগ্ন ছিল—এই সব কথা বলতে বলতে তার

স্তিমিতপ্রায় প্রেমকে যেন সে সঞ্জীবিত ক'রে তুলতে চেষ্টা করতে লাগল।

ভুলু দত্ত মনে মনে একটু অশ্রদ্ধাপূর্ণ কৌতুক অনুভব ক'রে ভাবলে, আচ্ছা বউ-পাগলা লোক তো! খেয়ে-দেয়ে আর কাজ নেই! পয়সা থাকলে কত শখই না যায়!

ভুলু দত্ত বিদায় হয়ে গেলে সে ম্যানেজার এবং ভোলানাথকে ডেকে দস্তুরমত উচ্ছ্বসিত হয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে কমলার সংবাদ জানালে। ম্যানেজারকে তখনই কমলাপুরী পাঠিয়ে দিলে পার্বতীর কাছে সংবাদ বহন ক'রে এবং বিরাট উৎসবের আয়োজন করতে। এতদিনের হারানো স্ত্রীপুত্রকে পাওয়ার উল্লাসে সে রীতিমত নিজেকে মাতিয়ে তুললে। বললে, ভোলাদা, তোমাকেই তো সব করতে হবে। কি করব না-করব আমি কিছু ভেবে পাচ্ছি নে। এখনি চল, যাওয়া যাক। তুমি কিন্তু মাথা ঠিক রেখ ভোলাদা, নইলে আবার একটা কাণ্ড হবে। বুঝতেই তো পারছ।

ভোলানাথ তার কাছ থেকে শুনেই প্রথমে হেসে কেঁদে একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছিল। খোকনবাবু? আহা, কত বড়টি হয়েছে না জানি! মা কি ছেড়ে যেতে পারে বাবু? আহা, মা আমার জগদ্ধাত্রী! মাথায় ক'রে নে আসব 'খন। খোকনবাবু কি চিনতে পারবে? কত পুণ্যি করেছিলাম, বাবু, যে আবার মাকে খোকনবাবুকে ফিরে পেলাম! ইত্যাদি।

শচীন বললে, ভোলাদা, সেই ওরা হারানোর দিন কি রকম পোশাক তোমার ছিল মনে আছে? ঠিক সেই রকমটি সেজে তোমায় যেতে হবে। নইলে— ওর আবার সব ভুল হয়ে গেছে কি না। কি জানি, শেষকালে যদি চিনতে না পারে!

শচীন্দ্রনাথের নিজের মনে এতদিনকার অদর্শনজনিত অপরিচয়ের

যে দ্বিধা সঞ্চিত হয়ে উঠছিল ভোলানাথের উচ্ছ্বসিত চিত্তে কমলা সম্বন্ধে সে সন্দেহ তার লেশমাত্র ছিল না। সে সগর্বে বললে, মা কি ছেলেকে ভুলতে পারে বাবু? দেখো, আমি গিয়ে আমি একবার 'মা' ব'লে ডাকলে সব মনে প'ড়ে যাবে।

খোকন যে চিনতে পারবে না, সে সম্বন্ধে ভোলানাথের সঙ্গে শচীন্দ্রের মতদ্বৈধ ছিল না, কিন্তু কমলার মন এতদিনের পরও তার প্রতি আসক্ত থাকবে বা তাকে ফিরে পেতে চাইবে তার নিশ্চয়তা কি? তবু তার স্মৃতিপটে কমলার যে অনুপম সৌন্দর্য এবং একান্ত নির্ভর-পরায়ণা নারীর যে চিত্তগ্রাহী মূর্তি অঙ্কিত ছিল, অন্তরে অন্তরে তার আকর্ষণ ক্রমে প্রবল হয়ে উঠছিল। সে নিজের দ্বিধার দুর্বলতাকে মনে মনে উপহাস এবং অস্বীকার ক'রে কমলার সন্ধানে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল। এই সমস্ত চিন্তা, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, উচ্ছ্বাস এবং মিলনের আয়োজনের অন্তরালে, পার্বতীর প্রতি তার স্নেহসরস চিত্তের আকর্ষণ যেন বিসর্জন-রজনীর দূরাগত সানাইয়ের স্বপ্নসমাচ্ছন্ন বেদনার সুরের মত তার মগ্নচৈতন্যকে আচ্ছন্ন ক'রে রইল; কিন্তু সে কথা আজ কিছুতেই সে স্পষ্ট ক'রে প্রত্যক্ষ করতে চাইল না।

তার মনের মধ্যে অপস্রিয়মান যৌবনের দোলায় অতীত যুগের সমস্ত স্মৃতিসম্ভারপূর্ণ কমলার প্রতি তার চিরাভ্যস্ত ও মগ্ন প্রেম কমলার যৌবনলাবণ্যস্মৃতিকে আশ্রয় ক'রে ধীরে ধীরে তার দেহমনকে উন্মুখ ক'রে তুলছে। কত দিনের কত তুচ্ছ কথা, কমলার একান্ত সমর্পিত প্রেম ও রূপের কত অপরূপ ছন্দোবিলাস, তার সন্তানের তরুণী জননী কমলার সলজ্জসুখাবেশতৃপ্ত আননের স্নিগ্ধকোমল অরুণিমা, নিশ্চিন্ত-নির্ভরে উৎসর্গিত পূজার পুষ্পাঞ্জলি মত তার দেহমনহৃদয়ের পবিত্র সৌরভ যেন ক্রমে ক্রমে শচীন্দ্রের চিত্তে তার আসন্ন মিলনের আকাঙ্ক্ষাকে সজীব ক'রে, উদ্‌গ্রীব ক'রে তুলছে। তার দ্বিধা শঙ্কা

সঙ্কোচ আত্মাভিমান দক্ষিণ-পবন স্পর্শে মেঘের মত অপসারিত হয়ে গেল।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রসাধনের অবকাশে সে আজ প্রথম যেন লক্ষ্য করলে, তার কপালের বলিরেখা বিস্তৃত গভীর, তার চোখের দৃষ্টি নিষ্প্রভ সঙ্কুচিত; সমস্ত মুখের উপর তার আসন্ন যৌবন-বিদায়ের সুনিশ্চিত ছায়া। একটা ম্লান হাসিতে তার মুখটা একটু করুণ হয়ে এল।

বৃদ্ধ ভোলানাথ তার বাবুর কথায় একটুও কান দেয় নি। এত বড় আনন্দের দিন আজ তার জীবনে সে কল্পনাও করতে পারে না। এত বড় উৎসব শচীন্দ্রের বিবাহের দিনও তার কাছে মনে হয় নি। আজ প্রথম দর্শনেই সে খোকনবাবুর মনোহরণ করবার উচ্ছ্বসিত আশায় তার সবচেয়ে মূল্যবান রঙিন পোশাক সে পরেছে। মাথায় পরেছে ফিরোজা রঙের পাগড়ী, ধোপদুরস্ত কাপড়ের উপর চড়িয়েছে সাদা সাটিনের আচকান, (পায়জামা সে কোনকালে পরতে পারে না,) পায়ে দিয়েছে শুঁড়তোলা জরিদার নাগরা। হাতে একটা রূপা-বাঁধানো সোঁটা—দেখলে হঠাৎ একটা পশ্চিমা রাজারাজড়ার মত মনে হয়। তার প্রকাণ্ড দেহও আজ যেন আর ন্যুব্জ দেখায় না।

শচীন্দ্র তাকে দেখে হেসে ফেললে, ও কি ভোলাদা, করেছ কি, তোমার বউমা তোমাকে চিনতেই পারবে না যে! ভাববে, কোন্ রাজাবাদশাই বা এল হঠাৎ!

ভোলানাথ সগর্বে বললে, চিনবে না কি! চিনতেই হবে যে। আর আমরা নফর মানুষ; পরের বাড়ি যাচ্ছি, তা তারা একটিবার চোখ মেলে দেখুক যে, কেমন বাড়ির বউরে তারা ঘরে ঠাঁই দেবার ভাগ্যি পেয়েছে। ঘরে ঠাঁই দেওয়া সে কি সোজা কথা বাবু? মা আমার রাজরাণী।

তার রাজরাণী বধূমাতার আশ্রয়দাতার স্পর্ধার বিরুদ্ধে এ যেন তার যুদ্ধ-সজ্জা।

একটা ট্যাক্‌সি ক'রে দুজনে বেরিয়ে পড়ল। ভোলানাথের উৎসাহ যেন বাধা মানতে চাইছে না। কি ক'রে এক মুহূর্তেই খোকনবাবুর মনটা জয় ক'রে তার পূর্ব গৌরব প্রতিষ্ঠিত রাখবে এই তার এক সমস্যা। সামনের সীট থেকে ঘুরে বললে, বাবু, খোকনবাবুর জন্যে একটু মেঠাই কিনে নিয়ে যাই। আর একটা বড় কাঠের ঘোড়া। আমার পিঠে ঘোড়া-ঘোড়া খেলতে বড় ভালবাসত।

বৃদ্ধের কল্পনা খোকনের সেই শিশুকালকে অতিক্রম ক'রে এগোতে পারে না। তার রকম দেখে শচীন্দ্র হেসে বললে, খোকন কি আর এতটুকুনটি আছে? কাঠের ঘোড়ায় তার মানহানি হবে যে। তবু সে বৃদ্ধের উৎসাহকে ক্ষুণ্ণ না ক'রে কিছু মিষ্টি, চকোলেট, এয়ারগান প্রভৃতি উপহার-দ্রব্য কিনে দিল। কমলার জন্যে দ্বিধায় সঙ্কোচে প'ড়ে সে কিছু কিনতে পারলে না। কে জানে, কমলার পছন্দ এখন কেমন হয়েছে!

৬৩

শচীন্দ্র ও ভোলানাথ যখন গিয়ে মালতীদের বাড়ি পৌঁছল, তখন দ্বিপ্রহরের দীর্ঘ দিবানিদ্রা সমাপন ক'রে মালতীর মাতুল বাইরের ঘরে উবু হয়ে ব'সে, হাঁটুর কাপড় খসিয়ে, একটি থেলো হুঁকোয় তাম্রকূট সেবনে ও আলস্যচর্চায় রত। ইন্সপেক্টর হত্যার কথা সে শুনেছিল, তারই তাড়সে সর্বদাই তার প্রাণে একটা আতঙ্ক জেগে ছিল। পারতপক্ষে নিদ্রার সময় রাত্রে বা দিনে ঘরের জানলা দরজা সে মুক্ত রাখত না। আজও অভ্যাসমত চতুর্দিক বন্ধ ক'রেই অন্ধকূপের মধ্যে ব'সে সে তাম্রকূট ধ্বংস করছিল। কড়া-নাড়ার আওয়াজে অকস্মাৎ চকিত হয়ে তার হাত

কেঁপে কলকে থেকে জ্বলন্ত কয়লা বিছানার উপর প'ড়ে গেল। বিছানা ঝাড়তে; কাপড় সামলাতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে হুঁকার জল ফেলে একটা কাণ্ডই বাধিয়ে দিলে সে। হত্যাকারীদের কেউ যে দরজায় উপস্থিত সুতরাং তার যে প্রাণ সংশয়, এ-বিষয়ে তার লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না। কড়া-নাড়ার কোনও প্রকার প্রত্যুত্তর দেওয়া সে সমীচীন বোধ করলে না। ভিতর দিকের দরজা খুলে কাপড়ের খুঁট গুঁজতে গুঁজতে সটান সে মালতীর দরজায় গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

বঁটি পেতে মালতী অজয়ের জন্যে ফল ছাড়িয়ে থালায় সাজাচ্ছিল। মাতুলও নিত্য এই ফলের অংশীদার। মালতী তার ভাব দেখে অবাক হয়ে বললে, কি মামা, ব্যাপার কি? কিছু চাই নাকি?

মালতীকে দেখে কতকটা সম্বিত ফিরে পেয়ে, সে বেশ জুত ক'রে দরজার বাইরে একটা মোড়ায় জ'মে ব'সে বললে, কাল যে সেই খাজুর দিইছিলে, তা একটু টক হলি কি হয়, খাতি বড় সরেশ। আছে না-কি দুটো? বাইরের ঘটনা যে প্রণিধানযোগ্য, তা তার ব্যবহারে প্রকাশ পেল না। দুটি নারী ও একটি শিশুর সে রক্ষক। দিবা দ্বিপ্রহরে কড়া-নাড়ার আওয়াজে যে সে আতঙ্কিত হয়ে পলায়ন করেছে, এ কথা প্রকাশ করা দুরূহ। সুতরাং ইতিহাসে এমন ঘটনা ঘটে নি, এই তার ভাব।

মালতী একটু হেসে গোটা কয়েক প্রুন তার হাতে তুলে দিলে। তারই গোটা দুই সে গালে ফেলে দিয়ে রসচর্চায় সবে মন দিয়েছে, এমন সময় বিরক্ত ভোলানাথের হাতের কঠিন তাড়নে কড়া কর্কশ নিনাদে পাড়া চকিত ক'রে তুললে। মাতুল দুই হাতে কান ঢেকে মাথা নিচু ক'রে চর্বণের অবসরে বললে, হম্‌ন্, হম্‌ন্; ওই আবার নাড়তি লেগেসে। হম্‌ন্, নেসে নেসে, সব কটারে নেসে এবার। হম্‌ন্, হম্‌ন্।

মালতী বললে, কে ডাকছে যে মামা! কি বকছ বিড়বিড় ক'রে? যাও, খুলে দেখ গে, কে ডাকে!

আর দেখিসি! বুঝতি পাস্‌স না? নেবে, এবার সব কটারে নেবে। আমারেও সাড়বে না।

মালতী এতক্ষণে ব্যাপারটা কতকটা বুঝতে পেরে হেসে ফেললে, ও, তাই বুঝি ভয়ে পালিয়ে এসেছ? ভ্যালা লোককে আমাদের পাহারায় দিয়ে গেছেন নিখিলবাবু। অজয়, আয় তো বাবা দেখি কে! হয়তো নিখিলবাবুই এসে থাকবেন। বাইরে দাঁড়িয়ে, বেচারা কি ভাবছেন বল তো মামা?

নিখিলের কথাটা মাতুলের মনে উদয় হয় নি। সে তৎক্ষণাৎ আশ্বস্ত হয়ে বললে, ও, তাই কও। আমুও তো তাই কই। আমি থাকতি কোন্ বেডা আসতি ভরসা করবে! চল চল, আমুউ যাব অ্যানে। এস তো বাবা অজয়, দোরডা খুলে দেবে।

মালতী চ'টে বললে, থাক্, তোমার আর আদিখ্যেতায় কাজ নেই। আয় অজয়।

আরে, চট ক্যান্। চারদিক সামাল দিতি হয় তো!

* * *

কড়া-নাড়া ও গোলমাল শুনে কমলাও বাইরের ঘরের দরজার আড়ালে মালতীর কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিল।

অজয় দরজা খুলে ভোলানাথকে দেখে একটু থমকে গেল। প্রকাণ্ড রঙিন পাগড়ী, প্রকাণ্ড চেহারা, চক্‌চকে পোশাকে ভোলানাথকে দেখে সে সসম্ভ্রমে একটু পিছিয়ে এল। উঁকি মেরে 'এডা আবার কেডা!' ব'লে মাতুল ঘরের এক কোণে গিয়ে আশ্রয় নিলে।

ভোলানাথ অজয়কে আশ্চর্য হয়ে দেখছিল। সেই শিশুকালের শচীন্দ্রনাথ যেন আরও সুন্দর হয়ে ফিরে এসেছে। সেই নাক চোখ,

সেই মুখ, গালের উপর তিলটি পর্যন্ত হুবহু এক। দুই হাতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে তাকে আদর করবার জন্য ভোলানাথের মন আকুল হয়ে উঠেছিল। তবু, বাবুর কথামত নিজেকে সামলে রেখে সে অজয়কে জিজ্ঞাসা করলে, খোকাবাবু, এটা কি নিখিলবাবুর বাড়ি বাবা ?

হ্যাঁ।

ভোলানাথের গলার প্রথম আওয়াজ শুনেই কমলা যেন কেমন হয়ে গেল। অবরুদ্ধ স্মৃতির দুয়ারে ঘা পড়ল যেন। সমস্ত অতীত যুগের চেনা কণ্ঠস্বর যেন তার স্মৃতিকে মথিত ক'রে চারদিক থেকে মৃত্যুপারের ইতিহাসকে সজীব প্রত্যক্ষ ক'রে তুলতে চাইছে। এই কণ্ঠস্বরের ছায়াপথ অবলম্বন ক'রে পরপারের নির্বাসিত কূল থেকে তার মনটা পৃথিবীর আত্মীয়লোকের কূলে উপনীত হবার জন্যে আকুল হয়ে উঠছে। ললাট কুঞ্চিত ক'রে সে তার মনের অন্ধকার কক্ষগুলির মধ্যে যেন তার দৃষ্টিকে কঠিন বলে প্রসারিত করবার প্রয়াসে নিয়োজিত করতে চাইছে।

ভোলানাথ ততক্ষণে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। সকলেই স্তব্ধ। মালতী সভয়ে কৌতূহলে এই রাজসজ্জায় সজ্জিত বিরাট ব্যক্তিটিকে দেখছিল। কমলা ভোলানাথের উষ্ণীষ-পরিহিত মূর্তি দেখে তার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে কোন যোগাযোগ সাধন করতে পারছিল না। এমন সময় ভোলানাথের দৃষ্টি কমলের উপর পতিত হতেই সে তার পাগড়ী উন্মোচন ক'রে এগিয়ে এল। মা, মাগো, আমায় চিনতে পারছ না মা ? আমি যে তোমার সন্তান ভোলানাথ। ব'লে আটাসোঁটা জামা-জামিয়ার সুদ্ধ প্রকাণ্ড দেহ নিয়ে সাষ্টাঙ্গে মাটিতে প'ড়ে কমলাকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াল। এক মুহূর্তের মধ্যে কমলার স্মৃতির অবরুদ্ধ দ্বার খুলে গেল। সে চীৎকার ক'রে 'ভোলাদা!' ব'লেই হতচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

কি হ'ল! কি হ'ল! দিদি, দিদি গো! ব'লে ডাকতে ডাকতে

কমলার মাথাটা কোলে তুলে মালতী ব'সে প'ড়ে বললে, জল, জল! অজয়, বাবা, দৌড়ে একটু জল নিয়ে আয়। ওগো, এ কি হ'ল! দিদি, ও দিদি, কথা কও। ব'লে সে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল। অজয় দৌড়ে গেল জল আনতে।

ভোলানাথ থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে অদূরে ট্যাক্সিতে উপবিষ্ট শচীন্দ্রকে ডেকে বললে, বাবু, শিগ্‌গির এস। মা যেন কেমন হয়ে পড়েছে! ভির্মি গেছে।

মাতুল ব্যস্তসমস্ত হয়ে শুধু 'তাই তো, তাই তো, এ যে যায়' বলতে বলতে অকারণে সমস্ত ঘর চামচিকের মত ঘোরাঘুরি ক'রে বেড়াতে লাগল।

কমলা অজ্ঞান হয়ে পড়েছে শুনে শচীন্দ্রের মনে এতক্ষণ যে দ্বিধা সঙ্কোচ জড়তা ছিল, এক নিমিষে সব ঘুচে গিয়ে কূলে উপনীত নিমজ্জমান তরীর আরোহীর কূলের দিকে তাকিয়ে যে মনোভাব হয়, সেই হতাশাপূর্ণ আগ্রহে সে ছুটে এল কমলার কাছে।

মালতীর কোলে শিথিল দেহার্ধ ন্যস্ত ক'রে মেঝের উপর লুটিয়ে প'ড়ে আছে কমলা ছিন্নবৃন্ত শতদলের মত। মন্দসমীরস্পর্শে দীর্ঘিকার আকুঞ্চিত বারিরাশির মত ছড়িয়ে পড়েছে তার বিপুল কেশভার। লজ্জাসঙ্কোচভাবব্যঞ্জনাবর্জিত. দীর্ঘপল্লবছায়ারেখাঙ্কিত শুভ্র কপোলে নিমীলিত নেত্রে তার মুখ অপূর্ব শ্রী ধারণ করেছে। শচীন্দ্র মুহূর্তকাল. নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে এই অপরূপ রূপশ্রী নিরীক্ষণ করতে লাগল।

কমলাকে দেখে তার মনের মধ্যে তার পুরাতন পরিপূর্ণ প্রেম উদ্বেল হয়ে উঠল। তার মনে হতে লাগল যে, এই দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তার সাধনার ধন যদি এমনি ক'রে তাকে বঞ্চিত ক'রে যায়, তবে সে বিরহ তার পক্ষে সহ্য করা কেমন ক'রে সম্ভব হবে! পার্বতীর প্রেম কমলার স্থান পূরণ করতে পারবে না। কখনই না। তার মনে হ'ল,

এ নিশ্চয় তারই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। পার্বতীর প্রতি তার দুর্বল চিত্তের উন্মুখীনতার জন্য তার মনে একপ্রকার অনুতাপের উদয় হ'ল।

ভদ্রতার কথা সে এক মুহূর্তের জন্যে ভুলেই গিয়েছিল। তারপর নিজেকে সংযত ক'রে নিয়ে সে মাতুলকে সম্বোধন ক'রে বললে, দেখুন, এঁকে আপনারা জ্যোৎস্না ব'লে জানেন। এঁর নাম কমলা। ইনি আমার পত্নী। আমার সঙ্গী এই এঁর কাছ থেকে সব জানবেন। আমি একজন ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসি তাড়াতাড়ি।

মাতুল শচীন্দ্রের পিছন পিছন দরজা পর্যন্ত গিয়ে, 'তাই তো, তাই তো' বলতে বলতে ফিরে এল।

তাড়াতাড়ি তার আচকানটা খুলে রেখে একটা পাখা-হাতে ভোলানাথ সঙ্কুচিত অবগুণ্ঠনবতী মালতীকে বললে, মা, আমারে লজ্জা ক'রো না। আমি মায়ের সন্তান, নফর—ভোলানাথ। মা আমার রাজরাণী অন্নপুন্ন, ছল ক'রে তোমার বাড়ি আশ্রয় নিইছিল। ব'লে মাতৃসেবায় মন দিলে। বহুক্ষণ চোখে মুখে জলের ছিটে দিয়ে বাতাস করতে করতে কমলা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে একবার শূন্য দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে আবার চক্ষু মুদ্রিত ক'রে প'ড়ে রইল। তার মস্তিষ্কের স্মৃতিফলকে অতীতের অজস্র ছবি রক্তধারার বেগে প্রতিফলিত হয়ে চলেছে; সে অজস্রতার বেগ যেন তার দুর্বল মস্তিষ্ক সহ্য করতে পারছে না। এক-একবার এক-একটা উদ্বেলিত দীর্ঘশ্বাসে তার স্নায়ুর শ্রান্তিকে প্রকাশ করছে যেন। এমনি ভাবে বহুক্ষণ যাবার পর কমলার জ্ঞান সম্পূর্ণ ফিরে না এলেও তার নিশ্বাসপ্রশ্বাস অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এল।

জীবনের ধারাবাহিক লক্ষণে আশ্বস্ত হয়েই হোক বা তার এই অস্বস্তিকর অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়েই হউক, মালতী অজয়ের কানে কানে বললে, যা তো বাবা, একটা বালিশ নিয়ে আয়। আমি উঠে মার জন্যে একটা বিছানা ক'রে রাখি।

মালতী উঠে ভিতরে গেলে, গ্রামের খোলা বাতাসে অভ্যস্ত ভোলানাথ এই বন্ধ ঘরে হাঁপিয়ে উঠেই বোধ করি, কিছুমাত্র ভদ্রতা না ক'রে মাতুলের দিকে চেয়ে বললে, ধর দিকি বাবু, একটু পাখাটা, জানলা কটা খুলে দি। ঘরটা যে একেবারে পায়রার খোপ ক'রে থুয়েছ! এ ঘরে ঢুকলে মানুষ যে এমনিতেই ভির্মি যায়।

মাতুল ব্যস্তসমস্ত হয়ে, 'ঠিক কইছ। আমুউ তো তাই কই আমুউ তো তাই কই।' বলতে বলতে জানালাগুলি খুলে দিতে লাগল।

এমন সময় ডাক্তার নিয়ে শচীন্দ্রনাথ ফিরে এল।

৬৪

সীমার কাছে বিদায় নিয়ে পার্বতী কমলাপুরীতে ফিরে গেল। লঞ্চের নিরানন্দ কেবিনে প্রবেশ ক'রে তার মনে বারম্বার এই কথাটাই আঘাত ক'রে ফিরতে লাগল যে, শচীন্দ্রের উপর তার প্রেমের স্বাভাবিক অধিকারকে সে মনে মনে কেন এমন নিঃসংশয়ে স্বীকার ক'রে নিতে পারে নি, যার বলে সমস্ত দ্বিধা সঙ্কোচ অভিমান পরিত্যাগ ক'রে শচীন্দ্রের পরিতপ্ত শ্রান্ত চিত্তকে সে সেবাসমাদরে গ্রহণ করতে সংস্কার-বিমুক্ত চিত্তে অগ্রসর হতে পারে! সে তার প্রেমের-পরিণাম-বিচারশূন্য কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে; হ্যাঁ, হয়েছে সে। শচীন্দ্রের দ্বিধাকুণ্ঠিত মনকে সে যে অভিমানের বশবর্তী হয়েই স্বার্থপরের মত তার নিঃসঙ্গতার সুদুঃসহ শ্মশানবৈরাগ্যের মধ্যে নির্বাসন দিতে পশ্চাৎপদ হয় নি, প্রেমাস্পদের প্রতি তার এই কঠিন নিষ্ঠুরতায় মনে তার অনুশোচনার সঞ্চার হতে লাগল। কমলার প্রতি শচীন্দ্রের প্রেমের স্মৃতি যে কেবল স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত হয়েছে, এ কথা নিশ্চয় ক'রে জেনেও কেন সে শচীন্দ্রের দুর্বল চিত্তের প্রেমাভিনয়ের শাস্তি বিধান

করতে প্রবৃত্ত হ'ল ? কেন সে সুনিশ্চিত দৃঢ়তা এবং প্রেমের নিশ্চিন্ত অধিকারের বলে অনায়াসে অগ্রসর হয়ে তার দয়িতের নিরাশ্রয় ভ্রাম্যমান চিত্তকে পরিপূর্ণ দায়িত্বে নিজের প্রেমের নিঃসংশয় আশ্রয়ের মধ্যে টেনে নিতে বাধা পাচ্ছে ? এ কি ক্ষুদ্রাশয় বণিকবৃত্তি তার প্রেমে ? নিজেকে সে কঠিন তিরস্কারে নির্যাতিত করতে লাগল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে যে, আর নয়। এমনি ক'রে নিজের আত্মাভিমানের আবরণে, অকারণে ব্যবধান সৃষ্টি ক'রে আত্ম-সম্মানের তুচ্ছ প্রসাদ লাভের আকাঙ্ক্ষায় সে চিরদিন সত্যকে অস্বীকার ক'রে ফিরবে না আর। এবারে সে শচীন্দ্রের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করবে নিজেরই প্রেমের অবিচলিত মর্যাদায়। সংসারে তার নিজের প্রেমের মূল্যে সে শচীন্দ্রকে নবজীবনের পরিপূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করবে নবীনতর গৌরবে।

এই সংকল্প স্থির ক'রে নিয়ে মন তার এক অভিনব আনন্দরসে পূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল। অনুশোচনার বেদনা দূর হয়ে গিয়ে তার অপরিতৃপ্ত তৃষিত চিত্ত রূপে রসে আনন্দে সরল ও সমুজ্জ্বল এক নূতন গৃহসংসার সংরচনের মনোহর কল্পনায় আবিষ্ট হয়ে গেল। মায়ের সংসারের গৃহব্যবস্থার শৃঙ্খলার কথা সে স্মরণে আনতে পারে না। কিন্তু পিতৃগৃহ-পরিচালনের যে সামান্য অভিজ্ঞতা তার স্মৃতিতে সঞ্চিত ছিল, তাকেই সে কল্পনার অবাধ আতিশয্যের সম্ভারে, নিজের ভাবীগৃহশিল্পরচনায় নিয়োজিত করলে।

চিন্তার আবেগে সে রুদ্ধবায়ু কেবিনের অন্ধ কোটর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে এসে বারান্দার রেলিঙের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। বাংলার শান্ত নদীতট ; পর্বতগুহা থেকে অকস্মাৎ বহির্গত নদীর ধারার মত আম্রবনচ্ছায়ামুক্ত বিসর্পিত গ্রাম্য পথ ; দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরের বক্ষে সঙ্গীহীন গরুর গাড়ির আচ্ছাদনের অবকাশে অজ্ঞাত পথিকবধূর উৎসুক

ভঙ্গী ; সমস্তই আজ তার চোখে রহস্যাবৃত সৌন্দর্যলোকের অপরূপ আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত ক'রে তুলেছে।

কমলাপুরী পৌঁছে সে তার ভাবী জীবনের অনাবিষ্কৃত কল্পরাজ্যের পরিবেশের মধ্যে শচীন্দ্রকে অভ্যর্থনা করবার আনন্দময় পরিকল্পনায় তার অতীত দুঃখের ইতিহাস বিস্মৃত হয়ে গেল। তার মনে কোন সংশয়, কোন দৈন্য আর তাকে বিচলিত করতে পারলে না। শচীন্দ্রের বিরহবিধুর জীবনকে সে আবার আশায় আনন্দে উৎসাহে কর্মের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে পারবে ; কমলাপুরীকে পরস্পরের সংহত শক্তির নবীন গতিবেগে আরও বৃহত্তর ক'রে বাংলার নারীদের প্রকৃত কর্মক্ষেত্র, নিশ্চিন্ত আশ্রয় এবং স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার প্রতিষ্ঠাভূমিতে পরিণত করতে পারবে। এই চিন্তায় সে অধিকতর উৎসাহে কর্মে নিজেকে প্রবৃত্ত করলে। কল্পনার মায়ায় কয় দিন এমনি ক'রে মোহের আবেশে তার কেটে গেল।

* * *

এমন সময় ম্যানেজার এসে পৌঁছল কমলের প্রত্যাগমনের সংবাদ নিয়ে। সুখস্বপ্নের মধ্যে অকস্মাৎ একটা রূঢ় আঘাতে সে যেন বাস্তব জগতের আবেষ্টনের সংঘর্ষে জেগে উঠল। অকস্মাৎ মুহূর্তের মধ্যে স্বপ্নের ঘোর কেটে গিয়ে নিজের অসহায়, ভবিষ্যৎ-আশাপরিশূন্য, অপমানিত মূর্তি তার চোখের উপর ভেসে উঠল। শচীন্দ্রের কাছে অকস্মাৎ সে অকাম্য অস্পৃশ্য হয়ে গেছে। নিজের বাসনায় রচিত আবর্তের মধ্যে তাকে সমস্ত জীবন সঙ্গবিহীন নিরবলম্ব তৃণখণ্ডের মত আবর্তিত হয়ে কোন্ বিপর্যস্তভাগ্য অন্ধকার ভবিষ্যতের গর্ভে নিশ্চিহ্ন বিলুপ্তির প্রতীক্ষায় কালযাপন করতে হবে, তা কে বলতে পারে!

চিন্তার উত্তেজনায় ঘর থেকে বেরিয়ে নদীর ধারে তার একটা প্রিয় নির্জন স্থানে নিজেকে সুসম্বৃত ক'রে নেবার জন্যে গিয়ে সে বসল।

উৎসবের আয়োজন তাকেই করতে হবে; সুতরাং অলস কল্পনাবিলাসে কালাতিপাত করবার সময় তার নেই। নিজের দুর্বলতার কাছে নিজেকে বিসর্জন দিয়ে শোক বা পরিতাপ সম্ভোগ করবার স্বভাবও তার নয়। সে ভেবে দেখলে যে, সে যে কোন দিনই শচীন্দ্রকে অগ্রসর হবার উৎসাহ দান করতে পারে নি তার গূঢ় তত্ত্ব এই যে, শচীন্দ্রের চিত্ত কখনও অনন্য এবং দ্বিধাহীন হয়ে তার প্রেমভিক্ষা করেছে ব'লে তার মনে হয় নি। নিজের আকাঙ্ক্ষায় প্রলুব্ধ হয়ে সে যে শচীন্দ্রের ভবিষ্যৎকে অবরুদ্ধ করে নি, সেজন্যে সে মনে মনে নিজেকে ধন্যবাদ না দিয়ে থাকতে পারল না। অনেকক্ষণ নদীর ধারে কাটিয়ে সে নিজের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ ক'রে নিয়ে উঠে পড়ল। হেসে বললে, আগমনীর চেয়ে বিসর্জনের আয়োজনই আমার জীবনের মহোৎসব হোক।

শচীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয়াকে ফিরে পেয়ে এত দিনের দুঃখ সার্থক আনন্দে পরিণত করতে পেরেছে, সে কথা কল্পনা ক'রেও সে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। 'শচীন্দ্রকে সুখী করাই যদি তার প্রাণের অভিলাষ হয়, তবে সে পার্বতীর দ্বারাই হোক বা কমলার দ্বারাই হোক তাতে কি আসে যায়?' কিন্তু মনের মধ্যে সর্বহারা নিঃস্বতার বেদনা অন্তরে অন্তরে তার জমা হয়ে উঠতে লাগল। সেই সঞ্চীয়মান রিক্ততার দুঃখকে মনে মনে মনে অস্বীকার এবং উপেক্ষা করবার প্রয়াসে অতিরিক্ত উদ্যম ও উৎসাহে অভ্যর্থনা-উৎসবের আয়োজনে সে লেগে গেল। পাছে কোথাও কিছু ত্রুটি থেকে যায়, পাছে উৎসবের দেওয়ালির উজ্জ্বল আলোকমালার একটি দীপও দীপ্তিহীন দেখায়, পাছে শচীন্দ্রের কল্পনায় কোন কারণে, অবহেলাজনিত অব্যবস্থার কোন সন্দেহের ছায়া তার আনন্দের উৎসাহকে ম্লান করে, এই আশঙ্কায় সে প্রত্যেকটি বিষয়, প্রত্যেকটি ব্যাপার সম্পূর্ণ নিজের তত্ত্বাবধানে অনন্যসাধারণ রুচি এবং

পারিপাট্যের সঙ্গে রচনা ক'রে তুলতে তার সমগ্র চিন্তা এবং শক্তি নিয়োগ করলে। এমনি ক'রে সে তার বিসর্জনের মহোৎসবকে মহিমান্বিত ক'রে তুলতে চেষ্টা করতে লাগল।

এই চেষ্টা যে তার জীবনের সত্যকে শচীন্দ্রের করুণার নিষ্ঠুরতা থেকে আবৃত করবার প্রয়াস, এই চেষ্টা যে সত্যের পরিবর্তে আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার আত্মপ্রতারণা, এ কথা তার মনে রইল না। এই আহুতির অন্তরালে নিজের আত্মসম্মানকে প্রতিষ্ঠিত রাখবার এক প্রকার আত্মপ্রসাদ সে অন্তরে অন্তরে অনুভব করতে লাগল।

উৎসব-অনুষ্ঠানের কোথাও কোন বিচ্যুতি ছিল না; পার্বতীর অভিনব কর্মসূচীর আনন্দ-আয়োজনে শিথিলতাও লক্ষিত হয় নি, তবু যে দুদিন তারা কমলাপুরীতে ছিল তার মধ্যে শচীন্দ্রনাথ কেন যে পার্বতীর দৃষ্টিকে প্রাণপণে অন্তরাল ক'রে ফিরেছে, তা কে বলতে পারে! এই এড়িয়ে-চলার প্রয়াস পার্বতীর সচেতন দৃষ্টির কাছে কিছুমাত্র অগোচর ছিল না; কিন্তু পাছে এই সঙ্কোচের আব্রুটুকু তার দৃষ্টির আঘাতে লজ্জা পায়, সেইজন্য সে তার শত কর্মের মধ্যেও পূর্বেরই মত স্বচ্ছন্দ পরিহাসে, আলাপে এবং পরামর্শ গ্রহণের অভিনয়ে শচীন্দ্রের মনকে নিশ্চিন্ত নিঃশঙ্ক সহজ ক'রে তোলবার চেষ্টার ত্রুটি করে নি।

এই দু দিনের জন্য নিজের গৃহদ্বার কমলাদের ছেড়ে দিয়ে, নর্মদা নাম্নী তার কোন সহকর্মিণীর গৃহে, সে নিজের ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছিল; এবং কমলা বা মালতী পাছে কোন কারণে নূতন পরিবেষ্টনের আড়ষ্টতা কিছুমাত্র অনুভব করে, সর্বদাই সেজন্যে সে তার আত্মীয়তার স্বচ্ছন্দ ভাবকে সজাগ ও সতর্ক রেখেছিল।

একদিন তার নিরবচ্ছিন্ন কর্মের মধ্যে একটু অবকাশ পেয়ে শচীন্দ্রের অন্বেষণে সে তার বাড়ি গেল। শচীন্দ্র অন্যমনে একটা খবরের কাগজ হাতে বাইরের বারান্দায় ব'সে ছিল। পার্বতী গিয়ে বললে, বেশ তো,

আমরা খেটে খেটে হয়রান হয়ে যাব আর আপনি আড়ালে ব'সে আরাম ক'রে মজা দেখবেন! সেটি হচ্ছে না। একে আপনি হিরোইনের স্বামী, তাতে কমলাপুরীর প্রতিষ্ঠাতা; আপনি লুকিয়ে থাকলে, আপনাকে ছাড়ব না কি? তা কিছুতেই হবে না। তারপর যত বদনামের ভাগী হব একলা আমি, না?

শচীন্দ্র অবশ্য এই সহজ সরল কৌতুকের সঙ্গে যোগ রক্ষা করবার প্রাণপণ চেষ্টা করলে।

একটু অবাক হওয়ার ভান ক'রে দুষ্টু হেসে সে বললে, একলা কেন! তোমার নাইট-এর‍্যাণ্ট ভোলাদা কি তোমায়—?

কথা শেষ হতে না দিয়ে পার্বতী কৃত্রিম ক্রোধে চোখ পাকিয়ে তর্জন ক'রে বললে, শাট আপ। ডোণ্ট্ বি সিলি। এখন উঠুন তো মশাই, উঠুন। বায়না ক'রে কেবল ফাঁকি দেবার মতলব! সেটি হচ্ছে না মশায়।

শচীন্দ্র আবার একটু হেসে বললে, আরে বুঝতে পারছ না যে, সাড়ম্বরে যার শ্রাদ্ধের আয়োজন করছিলাম, তিনি স্বয়ং শ্রাদ্ধবাসরে এসে হাজির। তাই লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছি নে।

এই কৌতুকহাস্যের চেষ্টার আন্তরালেও সে সত্যিই তার লজ্জাকে চাপা দিতে পারছিল না এবং পার্বতীর কাছে তা অগোচরও ছিল না, তবু পার্বতী নিজের দিক থেকে তার কোন আভাস দিলে না।

সে বললে, না না, সত্যি একটু দরকার আছে। আজ রাত্রে একটা সভার আয়োজন করেছি। আজ শুক্লা চতুর্দশী কিনা! আজ—

তুমি কি ক'রে জানলে?

এ তো কলকাতা শহর না মশাই যে, ইলেক্ট্রিক লাইটের পর্দা টাঙিয়ে আমরা অমাবস্যা পূর্ণিমা সব আড়াল ক'রে ব'সে আছি। তা ছাড়া হিন্দু বিধবাদের একাদশী-পূর্ণিমা হিসেব ক'রে চলতে হয় মশাই,

বুঝলেন ? আপনার আশ্রমটা যে বিধবাদের, তা কি ভুলে গেছেন নাকি ?

আশ্রমটা যে আমার তা আর ভুলতে দিচ্ছ কই ? নইলে—

নইলে কি ? নইলে ফাঁকি দিয়ে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াতেন, না ? তা হচ্ছে না। শুনুন, একটা মতভেদ ঘটেছে। সভার জায়গাটা—কেউ বলছে, ফুল দিয়ে আটচালাটাকে সাজিয়ে তার মধ্যে করতে, আবার কেউ বলছে, চাঁদনী রাত, নদীর ধারে খোলা মাঠে করতে। আপনি কি বলেন ?

আমি বলি, একটা মতভেদ ঘটেছে তাই ভাল, ওর মধ্যে আবার দুটো ঘটিয়ে বিশেষ লাভ নেই।

কথার জাহাজ ! মতভেদ যে বাড়াতেই হবে, তারই বা মানে কি ?

বেশ, ওর মধ্যে কোন্ মতটা দিলে মতভেদ বাড়বে না অর্থাৎ কোন্‌টা তোমার তাই ব'লে দাও। বাস্, চুকে যাক।

আমি ব'লে দিলেই উনি আমার মতে মত দেবেন। আহা, কি আমার বাধ্য গো !

না না, তা বলছি না। তোমারটা জানলে অন্যটাতে মত দিতে আর ভুল হবে না। মতভেদ তা হ'লে একটাই থেকে যাবে, আর বাড়বে না। তাই বলছি।

থাক্, তাই আর বলতে হবে না। এখন চলুন দেখি।

পার্বতী এমনি ক'রে সহজ স্বাভাবিকতার আবহাওয়া সৃজন করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পার্বতী যে অক্ষুণ্ণ এমন কি আনন্দিত চিত্তে শচীন্দ্রের বিচ্ছেদকে গ্রহণ করেছে—এ কথা মনে মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করলেও কল্পনা ক'রে একদিকে শচীন্দ্রের অভিমান আহত হয়েছিল ; আবার অকস্মাৎ পার্বতীকে শূন্যতার মধ্যে বিসর্জন দিয়ে তারই সামনে কমলাকে নিয়ে 'সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না'র উৎসবে মত্ত হওয়ার চিত্রটাও

তাকে লজ্জিত করছিল। সুতরাং পার্বতীর চেষ্টা সত্ত্বেও সে কিছুতেই নিজেকে বিস্মৃত হতে পারছিল না। দুদিন পার্বতীর দৃষ্টি সে এক রকম এড়িয়েই বেড়াতে লাগল।

৬৫

তারপর কিছু দিন অতীত হয়েছে। কমলাপুরী ও বল্লভপুরের আনন্দ-উৎসবের কূলপ্লাবী বন্যাকল্লোচ্ছ্বাস গ্রাম্য জীবনস্রোতের স্বাভাবিক ধারা-প্রবাহের তটসীমার মধ্যে শান্তরূপ ধারণ করেছে। শচীন্দ্রনাথ যেন নবীন আশায় নবতর উদ্দীপনার উৎসাহে সংসারে নব জন্মলাভ করেছে। কমলাকে ফিরে-পাওয়ার রূপকে সে নিজের অন্তরের মধ্যে এবং বাহিরের জীবনব্যাপারে ওতঃপ্রোত ক'রে উপলব্ধি করবে—এই তার পণ। প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তকে সে কমলার প্রত্যক্ষ অনুভূতি দিয়ে আবৃত ক'রে গেঁথে তুলতে চায়। নিত্য নবোৎসারিত এই রসোচ্ছ্বাসপ্লাবনের অন্তরালে পার্বতীর অস্তিত্বকে সে মগ্ন ক'রে দিতে চায়। কমলাকে নানা ছন্দে সাজিয়ে, নূতন নূতন উপহার-দ্রব্যে পরিতুষ্ট ক'রে, অবসরকালে চিত্তবিনোদনের নানা তুচ্ছ আয়োজন ক'রে সে তার হৃদয়ের বহুদিনপরিত্যক্ত তৃষিত মধুচক্রকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিপূর্ণ ক'রে তুলবে তাদের মিলনরসমধুপ্রবাহে। আজ সে নিঃসংশয়ে প্রমাণ করবে যে, এই দীর্ঘ বিরহ তার চিত্তকে কমলার একান্ত মিলনাকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ ক'রে রেখেছে, অন্য তুচ্ছ আকর্ষণে, অন্য কোনও আনন্দরসে তা তৃপ্ত হবার নয়।

উচ্ছ্বসিত প্রমাণের আবশ্যক কমলার ছিল না, আবশ্যক তারই। সুতরাং এই প্রমাণের আতিশয্য কমলার পক্ষে অত্যাচারে পর্যবসিত হবে কি না, এ কথা চিন্তা করবার মত মোহমুক্ত অন্তর তার ছিল না।

কমলা স্বভাবত শান্ত ও অন্তর্মুখী। এই অত্যধিক উচ্ছ্বাসবেগের

সঙ্গে ছন্দ রক্ষা ক'রে চলার মত গতিবেগ সে আপনার অন্তরে সংগ্রহ করতে পারে না। তার চিরদিনের শান্ত নির্বাক চিত্ত নানা বিপর্যয়ের আঘাতে আরও প্রকাশ-বিমুখ হয়ে গিয়েছে। বাহিরের অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসের আবেগে তার নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রা যেন হাঁপিয়ে উঠতে চায়। সে শচীন্দ্রের দুর্বার হৃদয়ের সমাদরকে তার উপযুক্ত মূল্য দিতে পারে না। নিজের দৈন্য অনুভব ক'রে মনে মনে সে শচীন্দ্রের জন্য শঙ্কিত হয়ে ওঠে। বারম্বার অনুভব করে যে, তার কাছ থেকে উপযুক্ত সাড়া না পেয়ে শচীন্দ্র ক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে যায়। শচীন্দ্র মুখে অবশ্য কোনও নালিশ জানায় না এবং আরও অজস্ররূপে প্রকাশ ক'রে কমলাকে সে অভিভূত করতে চায়। কমলাও তার আদরে তার উদ্বেল হৃদয়ের প্লাবনে অভিভূত হয়; কৃতজ্ঞতায় তার মন ভ'রে ওঠে, কিন্তু নিজেকে সে তেমন ক'রে সমর্পণ করতে পারে না।

বস্তুত এত আনন্দের মধ্যেও মন তার সর্বদা সুস্থ নয়। সীমার মৃত্যু, নিখিলনাথের কারাবাস, নন্দলালের নিষ্ঠুর পরিণাম এবং মালতীর ভাগ্য-বিপর্যয় তার হৃদয়ের উৎসবের আয়োজনে মাঝে মাঝে গভীর ছায়াপাত করেছে। বিশেষত মালতীর দুরদৃষ্টে তার নিজের সৌভাগ্যোদয় কল্পনা ক'রে মালতীর প্রতি অপরাধজনিত পরিতাপ এবং করুণায় ও এক প্রকার সঙ্কোচে তার মন অভাগা মালতীর চোখের উপর নিজ ভাগ্যের এই অপর্যাপ্ত দাক্ষিণ্য সম্ভোগ করতে যেন নিষ্ঠুরতার লজ্জা অনুভব করে।

শচীন্দ্রের হাত থেকে মুক্তি পেলেই সে মালতীর কাছে গিয়ে বসে। সংসারের নানা কথায় তার অনভ্যস্ত পরিবেশকে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। নিজের অনভিজ্ঞতার নিদর্শন দেখিয়ে কর্ত্রীপদে মালতীকে প্রতিষ্ঠিত করবার এবং তার আজ্ঞাবহ হয়ে চলার অভিনয় করে। এমনি ক'রে নিজেকেও সে কতকটা সান্ত্বনা দেয়, মালতীর সঙ্কোচ এবং নূতন জায়গায় অনাত্মীয়-বোধের দ্বিধা দূর করবারও চেষ্টা করে।

সরলা মালতী হেসে বলে, সে কি ভাই, এ সব কি আমি পারি? এ রকম পেল্লায় বাড়ি ভাই আমি জন্মে দেখি নি। তোমার রাজত্বি তুমিই দেখ।

কমলা বলে, তার চেয়ে বল না যে, আমি নাকাল হই, আর তুমি দাঁড়িয়ে রঙ্গ দেখ। আমি কি ছাই ঘর-সংসারের কিছু জানি? তা হবে না দিদি, তুমি এরই মধ্যে আমাকে পর ভাবতে শুরু করলে আমি বাঁচি কি ক'রে বল তো?

তারপর হেসে বলে, ছেলেটিকে তো পর করেইছ, ছেলে তো মাসী বলতে অজ্ঞান।

মালতী বলে, হ্যাঁ, অজ্ঞান! ভোলাদাকে পেয়ে ছেলে আর বাড়ির মধ্যে পা দেওয়াই বন্ধ করেছে।

কমলা হেসে বলে, ওই রকম নেমকহারামই ওরা।

খোকনের চরিত্রেও পরিবর্তন বড় কম হয় নি। মা এবং মাসী দুজনেই এখন অবান্তর হয়ে পড়েছে। ভোলানাথের আসরেই এখন তার প্রধান আড্ডা। তার উপর তার জন্যে নূতন একটা টাট্টু ঘোড়া কেনা হয়েছে। তাই নিয়েই সে দিবারাত্র একেবারে মেতে আছে। ভোলানাথ বলেছে, আর অল্প কিছু দিন অভ্যাস করতে পারলেই একেবারে ফৌজে গিয়ে সেপাই হবে। সেই মহদুদ্দেশ্যে এয়ার-গান ছোড়ার অভ্যাসও চলেছে।

ভোলানাথের সাহায্যে মালতী কোনও মতে ধরপাকড় ক'রে তাকে স্নানাহারে প্রবৃত্ত করে। দুধের বাটিতে অর্ধেক দুধ প'ড়ে থাকে, তেল মাথার ধৈর্য তার সয় না। সাফসোফ ক'রে পোশাক পরিয়ে দিতে গিয়ে দেরি হ'লে হাত পা ছুঁড়ে অস্থির ক'রে তোলে। মালতী আর তাকে আয়ত্তের মধ্যে রাখতে পারে না। কেবল সমস্ত দিন ছুটোপাটি ক'রে সন্ধ্যার সময় যখন চোখ ঢুলে আসে, তখন পোষা বেরাল-ছানাটির

মত বিছানায় এখনও মাসীর কোল ঘেঁষে না শুলে তার চলে না। মাসী, পিঠ চুলকে দাও। বলতে বলতে মাসীর গায়ে কচি হাতটি রেখে ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়ে।

নন্দলালের ব্যাধির ওই হাসপাতালের চিকিৎসায় কোনো উপশম দেখা গেল না। তাই শচীন্দ্র ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তাকে রাঁচির উন্মাদাশ্রমে রাখার সুব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিল।

বেকার মালতী অগত্যা ধীরে ধীরে শচীন্দ্রের সংসারের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল এবং পরে একদিন তার কথা বড় আর কারও মনে রইল না।

কেবল মাঝে মাঝে শ্রান্ত বিমর্ষ চিত্ত নিয়ে কমলা তার কাছে এসে বসে। সীমা ও নিখিলনাথের গল্প, হাসপাতালের গল্প, তাদের নূতন পরিচিত বন্ধু পার্বতীর গল্প করে।

মালতী বলে, পার্বতী ভাই কেমন সায়েব-সায়েব। ঘরদোর সব মেমসাহেবদের মত ছিমছাম। অত ধোপদুরস্ত হ'লে ঘরে ঢুকতে গা ছমছম করে। আবার নাইবার ঘরে—

শুনতে শুনতে অন্যমনা হয়ে-কমলা ভাবে, শচীন্দ্র তার কাছ থেকে আহত হয়ে শুষ্ক মুখে ফিরে গেছে। কিন্তু সে কি করবে? স্বামীর নবীন হৃদয়াবেগের উদ্দাম বন্যাস্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়বার শক্তি এবং উৎসাহ সে কেমন ক'রে পাবে?

আসল কথা, শচীন্দ্রনাথ যদি ধীরে সুস্থে সন্তর্পণে, কমলার নূতন জীবনের বন্ধনগুলির উপর সহানুভূতি রেখে, অনুকূল আবহাওয়া সৃজন করতে পারত, তবে হয়তো একদিন সে তার সরসস্নিগ্ধ হৃদয়ের স্পর্শ পেয়ে ধন্য হ'ত। কিন্তু নিখিল-নন্দ-মালতীর জন্যে তার মনে সেই আগ্রহ, সেই দরদ তো জাগতে পারে না। এদের সম্বন্ধে মনে তার একটা স্বাভাবিক, উত্তেজনাবিহীন কৃতজ্ঞতা আছে বটে, কিন্তু সে কতটুকুই বা!

কমলার আত্মীয়বিচ্ছেদের তীব্র বেদনা সে বুঝবে কেমন ক'রে? কিন্তু বহু দিনের শুষ্ক তৃষিত পাত্রকে এক মুহূর্তের উত্তেজনায় সুরায় ফেনিয়ে তুলে আকণ্ঠ পান ক'রে সে মত্ত হতে চায়। বিপুল বাসনার আঘাতে কমলার সুপ্ত হৃদয়কে জাগিয়ে তুলতে চায়। কিন্তু নিজেকে অন্তরাল করায় অভ্যস্ত কমলারি পীড়িত অন্তঃকরণ প্রকাশের অক্ষমতার সঙ্কোচে আপনাকে যেন আরও আবৃত ক'রে ফেলে শামুকের মত।

কমলা মনে মনে ভীত হয়ে দেখে যে, যে-শচীন্দ্র পূর্বে তার কাছে পরিচিত ছিল, এ যেন সে-শচীন্দ্র নয়। কি যেন একটা অতৃপ্ত ক্ষুধা এর অন্তরে তীব্র হয়ে জাগ্রত হয়ে আছে, যার স্বরূপ কমলা কিছুতেই নির্ণয় ক'রে উঠতে পারে না। এই কয় বৎসরের ব্যবধানে তার মধ্যে কিসের একটা তীব্র মরুভূমির তৃষ্ণা সঞ্চিত হয়ে উঠেছে, কমলার শান্ত অনুচ্ছ্বসিত প্রেম যা পূরণ করতে পারছে না। কিসের এই অভাব! কি চায় সে কমলার মধ্যে! কমলা বুঝতে পারে না। একটা অজানা আতঙ্কে সমস্ত শরীর-মন তার সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। কেবলই মনে হয়, এ নয়, এ তো নয়! যার স্মরণে সে এই দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেছিল, এর মধ্যে তার সেই শান্ত, সমাহিত সংযত স্বামীত্বের স্নিগ্ধ পরিচয় কেন নেই! কেন ভাবতে ভাবতে এক এক সময় স্বাভাবিক দুর্বল মস্তিষ্কের কল্পনার ঘোরে তার মনে হয়, যেন কোন এক যাদুমন্ত্রের প্রভাবে সে এসে পড়েছে তার স্বামীর দেশে। সেখানে স্বামী তার নেই, বিদেশে তারই সন্ধানে তিনি ঘুরে ফিরছেন। আর সেই অবকাশে যেন তার স্বামীর ছদ্মবেশে এ কোন্ অপরিচিত এক কামনা দানব তার প্রেমের ভিখারী হয়ে এসেছে তার কাছে—রামের ছদ্মবেশে রাবণ!

এই অপরিচিত পুরুষের প্রতি, তার এতদিনকার অভিজ্ঞতায় অর্জিত স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা যেন তার চিত্তে অল্পে অল্পে কি এক রকম বাধার সৃষ্টি করতে চায়; ভয়ে সে দিশা পায় না, তার নিজের মানসিক অবস্থা

দেখে। ভয়, পাছে তার মুখে, তার আচরণে কোন মতে এই বিরূপতা প্রকাশ হ য় পড়ে। অথচ শচীন্দ্রের প্রতি তার একান্ত সমর্পিত প্রাণ তাকে তৃপ্ত করবার শক্তি পাবার জন্যে মনে মনে তার দেবতার কাছে কাতর প্রার্থনা জানায়।

কমলাকে হারাবার পূর্বে তো এমন দিন ছিল না! প্রতিদান-লাভের তৃষ্ণা শচীন্দ্রের চিত্তে তখন তীব্র হয়ে জাগত না। মনে হ'ত না যে, কমলা নিজের কামনার নূতন নূতন আবেগ তার মধ্যে জাগিয়ে দিয়ে সম্ভোগের আনন্দকে তীব্রতর ক'রে তুলুক। তখনকার দিনে শচীন্দ্র কমলাকে নিজের ইচ্ছায় খেলার পুতুলের মত ক'রে সম্ভোগ ক'রেই সুখ পেত অপর্যাপ্ত। স্নিগ্ধ আনন্দে নিরাপত্তায় কমলা যে অবাধে শুধু গ্রহণই করত, সেই গ্রহণেই বিকশিত হয়ে উঠত তার প্রতিদান নরনারীত্ববিকাশের মহান ঐশ্বর্যে। এখন এই অক্রিয়-প্রতিদানে আর সে তৃপ্ত হতে পারে না। কমলার কাছ থেকেও দুর্দমনীয়, ইচ্ছাময় ব্যক্তিত্বের সাড়া সে পেতে চায়—যে তাকে নিজের মত ক'রে উপভোগ করবার উত্তেজনায় নব নব বাসনার আবেগে তাকে গ'ড়ে নেবে; যে তার কাছে শুধু পোষমানা প্রাণীর আত্মবিসর্জন নিয়ে উপস্থিত হবে না; যে আসবে নিজের প্রেমের প্রবল শক্তিতে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইচ্ছার জয়ধ্বজা বহন ক'রে; ব্যক্তিত্বের বিপুল সংঘাতে যে তার মধ্যে রূপায়িত ক'রে তুলতে চাইবে নূতনতর সৃষ্টির প্রেরণাকে। কমলার মধ্যে তীব্র উৎসারিত আত্মার সেই সর্বজয়ী অস্তিত্বের কোন চিহ্ন সে পায় না—রাজ্ঞীর মত যে নিজের মনোহর প্রভুত্বের অপ্রতিহত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

শুষ্ক দারুখণ্ড যেমন নিজের অন্তর্নিহিত অগ্নিতে একদা বহ্নিমান হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে, শচীন্দ্রের চিত্তও তেমনি তার নিজের প্রদীপ্ত অন্তর-জ্বালায় নিজেকে দগ্ধ ক'রে ক্রমে নিস্তেজ হয়ে এল। তার

মনে হতে লাগল যে, কমলা যেন তার পক্ষে জীবলোকের সম্পর্কশূন্য অনায়ত্তগম্য অস্তিত্ব মাত্র ; যে-মৃত্যুর সমাধিগহ্বর থেকে সে এই পৃথিবীর আলোর মধ্যে উঠে এসেছে, সেখানকার শোণিতোত্তাপবিহীন হৃৎপিণ্ড যেন ওই রক্তমাংসের নারীদেহকে পরিণত করেছে প্রাণহীন মর্মর-প্রতিমায়—মানবের সুখ-সম্পদ আশা-উচ্ছ্বাসের তপ্ত জীবনধারা সেখানে প্রবাহিত হয় না ; জীবনকে সে উত্তাপ দান করে না ; বিদ্যুৎপ্রবাহে মানুষকে নূতন ক'রে অভিনব ক'রে সৃজন করবার প্রাণশক্তি ওখানে সুপ্ত। ওর মধ্যে নেই মানুষের আত্ম-আবরণ থেকে শতদলের মত সৌরভে সৌন্দর্যে বিকশিত ক'রে তোলবার প্রাণময় সৌরকর।

কমলা এবং শচীন্দ্রনাথের পরস্পরের সম্পর্কে এই সমালোচনা ও বিশ্লেষণের দৃষ্টি পরস্পরের মধ্যে, নিজেদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে যে ব্যবধান সৃজন ক'রে তুললে, তাতে তাদের বাইরের সংসারযাত্রা সুস্পষ্ট-ভাবে আক্রান্ত না হ'লেও অন্তরে অন্তরে অস্বস্তির মেঘ এবং অতৃপ্তির বিদ্যুৎ জমা হয়ে উঠেছিল। কমলার স্বভাবত অন্তঃশীলচিত্ত নিজেকে প্রকাশ করতে বাধা পেয়ে আরও বেশি ক'রে যেন নিজের আবরণের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলে এবং শচীন্দ্র উত্তরোত্তর নিজেকে প্রতিহত ব্যর্থ অনুভব ক'রে অশান্ত বিক্ষোভে শান্তি ও সান্ত্বনার পথ খুঁজে ফিরতে লাগল।

মধ্যের যে কয় বৎসর সে কমলাপুরী প্রতিষ্ঠানের কর্মপ্রেরণার উৎসাহে, চেষ্টায়, পরিশ্রমে সৃজনের আনন্দরসের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছিল, সেই স্বল্পকাল পূর্বের স্খলিত অতীতের স্মৃতিসূত্রকে খুঁজে নেবার জন্য আবার তার মনের পরিত্যক্ত নিভৃতে গিয়ে সে উপস্থিত হ'ল। কমলাকে ফিরে-পাওয়ার উত্তেজনায় পার্বতীর কথা সে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে চলেছিল তার মনে ; এবং এই মিথ্যাচার তার সহজ জীবনযাত্রার শান্তি ও সন্তোষকে উত্তেজনা ও আতিশয্যের বিক্ষোভে

কমলার মধ্যে নিজেকে সমাহিত করবার অবসর দেয় নি। পার্বতীর নিজের হাতে নূতন ক'রে গ'ড়ে-তোলা তার গত কয়েক বৎসরের জীবনকে আপনার প্রেমাভিনয়ের উত্তেজনার মধ্যে ভুলতে চেয়েছিল ব'লেই পার্বতীকে সে কোন মতে বিস্মৃত হতে পারলে না; এবং দিনে দিনে চিন্তাস্রোত সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে পার্বতীর প্রতি তার চিত্তের গোপন আকর্ষণ ক্রমে ক্রমে তার কাছে প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। মনে পড়ল, কমলার অভ্যর্থনা-উৎসবের সময় সে প্রাণপণে পার্বতীকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করেছিল; তবু উৎসবের আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে অক্লান্ত পার্বতীকে সে কখনও ম্লান হতে দেখে নি। যে দুদিন তারা কমলা-পুরীতে ছিল, তার মধ্যে এর জন্যে সে শচীন্দ্রকে কখনও অনুযোগও করে নি। বরং তার অতিপিনদ্ধ কার্যক্রমের মধ্যে অবকাশ অন্বেষণ ক'রে নিয়ে কমলা, মালতী ও শচীন্দ্রের সঙ্গে এসে কত গল্প পরিহাস করেছে সহজ কৌতূহলপূর্ণ নির্লিপ্ত প্রফুল্লতায় সরস ক'রে। পরস্পরের বিচিত্র ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছে। কত সহানুভূতি নিয়ে বার বার ক'রে কমলার অলৌকিক রূপলাবণ্যের প্রশংসা ক'রে সভার দিন নিজে হাতে তাকে সাজিয়ে, তাকে হাসপাতাল প্রভৃতি দেখিয়ে বেড়িয়ে, তার পরামর্শ জিজ্ঞাসা ক'রে কমলার বন্ধুতা সে সহজেই অর্জন করেছে।

কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীর অভ্যর্থনা-উৎসবে পার্বতীর প্রফুল্ল নেত্রীত্বের অন্তরালে যে বিক্ষত চিত্ত কল্পনা ক'রে শচীন্দ্র লজ্জায় পার্বতীকে এড়িয়ে চলেছিল, তারই নিষ্ঠুরতার স্মৃতি আজ বারম্বার তার মনে এসে আঘাত করতে লাগল। সে সুস্পষ্টভাবে আজ উপলব্ধি করতে পারলে যে, তার বিভ্রান্ত জীবনকে পার্বতী স্নেহে, শক্তিতে, সংযমে, আত্মত্যাগে তিল তিল ক'রে অপরূপ দক্ষতায় গ'ড়ে তুলেছিল। তার যে শোককে ছিন্নবৃন্ত স্রোতের ফুলের মত সে তার ভাববাষ্পাকুল চিত্তপবনের

বিলাসের বস্তু ক'রে রেখেছিল, পার্বতী তাকে সার্থক ক'রে মহীয়ান ক'রে তুলেছে।

হায় রে, সংসারটা যে নিছক সত্যের উপাদানে গঠিত! এতটুকু মিথ্যার ভর যে এখানে সয় না! সেই মিথ্যার মুখোশ প'রে জগৎকে যতটুকু প্রবঞ্চনা করা যায়, ততটুকু প্রবঞ্চিত হতে হয় নিজেকেই এক-দিন। কমলার প্রতি শচীন্দ্রের প্রেমের গর্বে পার্বতীর প্রতি তার অন্তরের সত্যকে সে প্রাণপণে অস্বীকার ক'রে চলেছে। কিন্তু যে প্রেম দিনের পর দিন, অল্পে অল্পে, লৌকিকতার বাধা লঙ্ঘন ক'রে, মনের অন্ধকার উদয়াচলে, তার চিত্তাকাশ উদ্ভাসিত ক'রে দেখা দিল, দুঃখ-রাতের পারে সূর্যোদয়ের মত, তাকে জীবনে অস্বীকার করলে জীবন তো তার তমসাচ্ছন্ন হয়ে উঠবেই। সে আজ পরিষ্কার ক'রে বুঝতে পারলে যে, ওই যে বৎসরের পর বৎসর অক্লান্ত একাগ্রতায় সে নারী-প্রতিষ্ঠানের বিস্তৃত সফলতা সম্ভব ক'রে তুলতে পেরেছে, কখনই তা সম্ভব হ'ত না, যদি পার্বতীর সাহচর্য এবং প্রেমের সঞ্জীবনীরসে এই কর্মের মধ্যে সে অপরিমেয় মাধুর্যের আস্বাদন লাভ না করত। এই প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়েই তো জীবনে যা-কিছু সার্থকতা সে লাভ করেছে, কিন্তু কমলার প্রেম কি সেখানে উপলক্ষ্য এমন কি অবান্তর হয়ে ওঠে নি?

কমলার প্রেম ধরিত্রীর মত, বীজকে যে আপনার হৃদয়ে গুহায়িত ক'রে রেখে দেয়। কমলার প্রেম তার অন্তরকে চায় আবরণের আচ্ছাদনে, নিভৃতে, অনুভূতির রসলোকে, একান্তে আবৃত ক'রে। যেখানে প্রকাশের উচ্ছ্বাস নেই, জীবনের চঞ্চল গতিবেগ যার মধ্যে সুপ্ত অথচ প্রাণরসে নিবিড়—চিরন্তন। আর পার্বতীর প্রেম? সে আকাশের মত, বীজের জীবনপ্রবাহকে যে তামসলোক হতে জ্যোতিরুৎসবে আহ্বান ক'রে নেয়। জীবনলীলারসের মাধুর্যকে যে বিকশিত ক'রে, সার্থক ক'রে তোলে পত্রপুষ্পফলে। তার মনে হতে লাগল, এই তো

সত্য। কমলার প্রেমের রসধারা কখনই তার জীবনে সার্থক হয়ে উঠবে না, পার্বতীর মুক্তিমন্ত্রের আহ্বানে যদি তার জীবনবীজ শাখায় পুষ্পে পল্লবে উৎসের মত উৎসারিত না হয়ে উঠতে পায় মেদিনীর অন্ধ আবরণ ভেদ ক'রে, অবারিত আকাশের পানে, আলোকোজ্জ্বল ধরণীর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে। দু-জনেই তো সেই একই প্রেমের প্রাণদাত্রী—কমলা ও পার্বতী!

এমনি ক'রে শোভন উপমা এবং গভীর তত্ত্ব আবিষ্কারের মোহে নিজের পথের সন্ধানে সে প্রবৃত্ত হ'ল। তার ক্ষুধার্ত চিত্তের প্রেমাভিব্যক্তির সুনিশ্চিত ব্যর্থতায়, কমলার প্রতি শ্রান্ত তার হৃদয় পার্বতীর প্রচ্ছন্ন আকর্ষণের মোহে তার দিকে ধাবিত হতে চায়, এ কথা চায় না সে মানতে। না গো, না, এ তার মোহ নয়। এ যে তার সার্থকতার অনিবার্য আহ্বানরূপ—পার্বতীর এই আকর্ষণ। এই তো তার জীবনকে পরিপূর্ণতা দান করবে, তার প্রেমের মূলকে গভীররূপে কমলার অন্তরে প্রবেশের প্রেরণা দেবে। তবু যেন অন্তরে কে ব'লে ওঠে, এ মিথ্যা, এ ফাঁকি।

চিন্তায় চিন্তায় তাকে বিভ্রান্ত ক'রে তুললে। পার্বতীর কাছে নিজেকে নিবেদন করবার আকুলতা তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ধরলে। সে আর ব'সে থাকতে পারলে না। বাড়ির বিস্তৃত ছাদের উপর বহুক্ষণ সে অস্থিরচিত্তে পায়চারি ক'রে বেড়াতে লাগল। কিন্তু যে-গৃহ তাকে তার জীবনের সার্থকতা থেকে দূরে সরিয়ে বন্দী ক'রে রেখেছে, সেই গৃহের চতুঃসীমানার পরিবেষ্টন সে যেন আর সহ্য করতে পারছে না। বাড়ির দেয়ালের গণ্ডী তার কাছে প্রতিভাত হতে লাগল বন্দীশালার মত। অস্থির হয়ে বেরিয়ে পড়ল সে মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে, যেখানে সমস্তই অবারিত, চলা যেখানে প্রতিপদে প্রতিহত হয় না, মানুষের শাসন যেখানে স্বচ্ছন্দ আত্মার উপর প্রহরী নিযুক্ত ক'রে রাখে নি।

বাড়ি থেকে বেরবার সময় ম্যানেজার নমস্কার ক'রে বললে, বাবু, বায়সার প্রজারা আজ—

শচীন তাকে থামিয়ে বললে, আজ থাক্।

কাল আসতে বলব কি ?

না, পরে।

আপনি কি যাচ্ছেন কোথাও ?

এই প্রশ্নে সে মুহূর্তকাল থমকে থেমে ম্যানেজারের দিকে ফিরে বললে, হ্যাঁ, কমলাপুরী।

ঠিক অব্যবহিত পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্তও কোন বিশেষ জায়গায় যাবার উদ্দেশ্য তার মনে ছিল না। প্রশ্নের আঘাতেই তার চাপা-দেওয়া মনের বাসনাটা অকস্মাৎ মূর্তি নিলে। শুধু ঘোড়াটুকু টেপবার অপেক্ষা যেন, তারপর জ্বলন্ত গুলি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটে তার লক্ষ্যের দিকে।

তা নৌকো ঠিক ক'রে দেব, বাবু ?

না।

লোকজন কেউ ?

দরকার নেই। ব'লে দ্রুতপদে সে এগিয়ে গেল। ম্যানেজার তার খেয়ালী মনিবটিকে বিশেষ ক'রেই চিনত, সুতরাং আর বেশি ঘাঁটাতে সাহস করলে না। শুধু কর্তব্যবোধেই বোধ করি বাড়ির ভিতরে সংবাদটি পাঠিয়ে দিলে।

শুনে কমলা চুপ ক'রে রইল। তার নিজের অদৃষ্টাকাশে যে একটা কিছু ঘনিয়ে উঠছে, তা সে বুঝতে পারলে। এ সম্বন্ধে মেয়েদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়টি প্রবল, এ কথা মানতেই হবে।

মালতী উদ্বিগ্ন হয়ে কোলাহল ক'রে বলতে লাগল, ওমা, না খেয়ে-দেয়ে এই রোদে একলা! এ কি খেয়াল বাপু! তুমিই বা কি

মেয়ে বাছা, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে? তোমায় ব'লে গেছেন? জানতে তুমি, যাবেন?

অন্যদিকে চেয়ে কমলা বললে, হ্যাঁ।

জানতে, আর একলা যেতে দিলে? ভোলাদাকে না হয় পাঠিয়ে দাও সঙ্গে।

না, থাক্। ব'লে সে ঘরে গেল।

মালতী এইবার যেন কি একটা অনুভব ক'রে চুপ করলে, কিন্তু মনটা তার খারাপ হয়ে গেল। লোকটা এই রোদ্দুরে, না খেয়ে, চ'লে গেল!

সুস্পষ্ট কোন চিন্তার আকার না নিলেও কমলার মস্তিষ্কের মধ্যে কমলাপুরী ও পার্বতী—এই দুটো কথা এলোমেলো ভাবে ঘোরাফেরা করতে লাগল। কিছুতেই সে ওই দুটো কথার শব্দসীমানা ছাড়িয়ে উঠতে পারছিল না।

রাত্রে মালতী তার কাছে শুতে এলে এক সময় সে বললে, দিদি, খোকনকে নিয়ে তুমি এখানে থাক।

মালতী কিছু না বুঝতে পেরে বললে, তার মানে?

আমি কমলাপুরী গিয়ে পার্বতীর সঙ্গে কাজ করতে চাই। এখানে বিনা কাজে ঘরের মধ্যে ব'সে আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। একটা কাজের মধ্যে থাকতে চাই, নইলে আমি বাঁচব না।

মালতী রাগ ক'রে ঝাঁজিয়ে উঠল, যত অনাছিষ্টি আবদার তোমার! রাজরাণী হয়েও তোমার মন ওঠে না! যত খিষ্টানি। ইত্যাদি ইত্যাদি।

কমলা কোন জবাব দিলে না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শুয়ে রইল। নিঃশব্দ অশ্রুজলে তার উপাধান সিক্ত হয়ে গেল।

এই বিরাট পুরীর বন্দীশালায় বন্দিনী হয়ে চিরদিন কর্মহীন অবসরের অন্ধকার গহ্বরে আপনাকে বিসর্জন দিতে হবে মনে ক'রে

তার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠতে লাগল। তার আর এক সর্বনাশের দিনে সেই যে নন্দলালের গৃহকোটর থেকে কর্মের মধ্যেই একদিন সে মুক্তিলাভ করেছিল, বারংবার সেই পরিত্রাণের উপায় তার মনে এসে অভয় দিতে লাগল। কাজ, কাজ, কাজই মুক্তির পথ। ঠিক কথা, কমলাপুরীর বিধবা কন্যাদের সেবা'র ভার সে পার্বতীর কাছে চেয়ে নেবে।

৬৬

গভীর রাত্রি পর্যন্ত পার্বতী তার কাজকর্ম ক'রে অবশেষে শ্রান্ত হয়ে এসে শুয়ে পড়ত নদীর ধারের বারান্দায় তার প্রিয় আরাম-চেয়ারখানির উপর দেহ এলিয়ে দিয়ে। তার নিজের বঞ্চিত জীবনকে মানবের সেবায় আরও বেশি ক'রে দেবার এবং কমলাপুরীকে বৃহত্তর নারী-কল্যাণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবার পরিকল্পনা সে প্রস্তুত করেছিল। নিজেকে সে মুহূর্তমাত্র অবসর দেবে না—এই তার পণ। শচীন্দ্রের কর্মযজ্ঞের অগ্নিতে নিজেকে আহুতি দিয়ে শচীন্দ্রের সঙ্গে তার বাহ্য বিচ্ছেদকে সে পরিপূর্ণ মিলনে পরিণত করবে। প্রতি মুহূর্তে তার প্রিয়তমকে সম্মুখে জেনে প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যের অনুভূতিতে সে নিজেকে অনুপ্রাণিত ক'রে রাখতে চায়। বিধবার অতৃপ্ত পূজা তার নয়, কুমারীর কমনীয় কামনাকেও সে জীবনে চায় না; সাধকের ধ্যানলোকে সে তার দয়িতের অদীনসত্তার কর্মসহচরী। যেখানে তার চেষ্টা বাসনায় কলুষিত নয়, মোহে অবিবেকী নয়, এবং শচীন্দ্রের স্থূল সত্তা যেখানে তার স্বতঃস্ফূর্ত অজেয় আত্মাকে খণ্ডিত করে না।

এই দুই মাসের মধ্যেই সে নারীজগতের নানা মঙ্গল-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজের যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করেছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন

স্থান থেকে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট উৎসাহ ও প্রতিশ্রুতি পেয়েছে। তার ইচ্ছা যে, ভারতের নানা কেন্দ্রে নিজে উপস্থিত হয়ে সকল প্রগতিশীল কর্মী নারীকুলের সঙ্গে সে প্রত্যক্ষ পরিচয় ও যোগ স্থাপন করবে। সকলের সঙ্গে সহযোগে পৃথিবীতে এক বিরাট নারীমঙ্গল-প্রতিষ্ঠানে সকলকে অনুপ্রাণিত ক'রে তুলবে। শচীন্দ্রের কল্যাণে অর্থের অনটন তার ছিল না। তার অনুপস্থিতিতে কমলাপুরীর কার্যপরিচালনের সুবন্দোবস্ত সে ক'রে রেখেছিল। কাল প্রত্যুষে কলকাতায় যাবে ব'লে স্থির ক'রে সে আদেশ দিয়েছিল লঞ্চ প্রস্তুত রাখতে। তার নিখিল-ভারত ভ্রমণের ভূমিকাস্বরূপ কলকাতার কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সে পরিচিত হতে চায়।

সমস্ত কাজকর্মের অবসানে নিত্যকার অভ্যাসমত সে বারান্দায় তার আসনটিতে এসে বসল। কাল যে বিরাট উদ্দেশ্য নিয়ে সে সম্পূর্ণ অপরিচিত জগতের মধ্যে নির্বান্ধব হয়ে বেরিয়ে পড়তে যাচ্ছে, তার নিঃসঙ্গ একাকীত্বের গুরুভার অজ্ঞাতসারে তার চিত্তকে অধিকার করেছিল; এবং চিত্তের গোপন অন্তরালে প্রচ্ছন্নরূপে, তার সমস্ত সুশাসিত সাধনার আদর্শকে পরিহাস ক'রে, কখন যে শচীন্দ্রের বিরহ-বেদনা ধীরে ধীরে অন্তরের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে তা সে লক্ষ্যও করে নি। লণ্ডনে পীড়িত শচীন্দ্রের সেই অসহায় রোগতাপিত মূর্তি, ইউরোপের নানা দেশ ভ্রমণের অবসরে পরস্পরের ঘনিষ্ঠতার রসায়নে নূতন জীবনে পরস্পরকে সঞ্জীবিত ক'রে তোলার সেই সুবর্ণমণ্ডিত দিনগুলির ইতিহাস, কমলাপুরীতে দ্বিধাবিচলিত শচীন্দ্রের আত্মসমর্পণের করুণ কোমল রহস্য, সমস্তই তার চিত্তে গভীর বিরহতপ্ত অশ্রুসজল বেদনায় আজ প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে। নিমীলিত নেত্রের বারিধারা আর কূলের বাধা মানে না; অসহায় আকুল চিত্ত তার প্রেমাস্পদের

আকাঙ্ক্ষাকেও নিবারণ ক'রে রাখতে পারে না। নিরুপায় অনাথের মত সে নিজের শোকের কবলে নিজেকে বিসর্জন দিলে।

এমনি শাসনমুক্ত, শিথিলগ্রন্থি, বেদনাবিধুর চিত্তে অশ্রুবিগলিত মুদ্রিত নয়নে শচীন্দ্রকে তার নিজের সমগ্র চেতনা দিয়ে অনুভব করবার আবেশে আবিষ্ট হয়ে সে স্থির হয়ে প'ড়ে রইল।

রাত্রি পূর্ণিমা। সমস্ত জল স্থল আকাশ জ্যোৎস্নার প্লাবনে যেন জোয়ারের সমুদ্রের মত উদ্বেল। ও-পারের চাষীগ্রামের সুপ্তদীপ পর্ণকুটির থেকে রোমন্থনসুখাবিষ্ট গাভীর কণ্ঠলগ্ন মন্থর ঘণ্টাধ্বনি যেন দূর স্বপ্নালোকের রাগিণী আনছে বহন ক'রে। কিন্তু বহির্জগতের এই অনুপম সুন্দর রসস্রোত পার্বতীর গভীর বেদনার অন্তরালে আজ যেন অবাস্তব স্পর্শরহিত।

শচীন্দ্রের সত্তার স্বপ্নবিলাসে কতক্ষণ এমনি যে সে অভিভূত হয়ে ছিল, তা সে জানে না।

সহসা চকিত হয়ে সে উঠে বসল পদশব্দে। সামনে শচীন্দ্র—শচীন্দ্রই তো! বিস্রস্ত কেশবেশ, উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তি, স্খলিত চরণ। এ কি স্বপ্ন? চোখকে যেন বিশ্বাস করা যায় না। শাস্ত্রে বলে যে, একান্ত ধ্যানপরায়ণ একাগ্রচিত্তে আরাধনা করলে, দেবতা মূর্তি পরিগ্রহ ক'রে সম্মুখে আবির্ভূত হন। এ কি তার হৃদয়বাসী দয়িতের বিগ্রহমূর্তি? না, এ তার একান্ত নিবিষ্ট কল্পনারই ছায়ামূর্তি। এ কি সম্ভব! কিন্তু এ কি বিধ্বস্ত, ক্লান্ত, পীড়িত রূপ শচীন্দ্রের! এই কি সে! যাকে কমলার সাহচর্যসুখে পরিতৃপ্ত কল্পনা ক'রে সে মনে মনে সান্ত্বনা লাভ করবার প্রয়াস পেয়েছে; যার আপ্তকাম, সুখতৃপ্ত আননের হাস্যোজ্জ্বল প্রভা দেখার আশায় সে তার প্রতিষ্ঠানের দুয়ারে অপেক্ষা ক'রে আছে, এ তো সে নয়। শ্রান্তিতে অবসাদে শচীন্দ্র যেন আর দাঁড়াতে পারছে না, শ্লথ ভগ্ন ছিন্নমূল হয়ে এখনি সে প'ড়ে যাবে।

সেবাপরায়ণা পার্বতী তার এই ঝঞ্ঝাহত মূর্তি দেখে স্থানকাল ভুলে গেল। ত্রস্তপদে উঠে এল এগিয়ে তার দিকে দুই বাহু প্রসারিত ক'রে। এবং শচীন্দ্র তার শিথিলমূল কম্পমান দেহকে পার্বতীর অঙ্গের উপর ন্যস্ত ক'রে বললে, আমাকে ক্ষমা কর পার্বতী! আমি—

পার্বতী সকরুণ স্নেহে তার মুখের উপর হাত চাপা দিয়ে, নিজের প্রতি শান্ত দৃঢ় নির্ভরে, শচীন্দ্রের অজ্ঞাত দুঃখের গভীর করুণায়, নিরভিমান নিঃসঙ্কোচে ধীরে ধীরে নিয়ে গিয়ে তাকে আরাম-চেয়ারে শুইয়ে দিলে। তারপর একটা মোড়া এনে পাশে ব'সে তার পীড়িত উত্তপ্ত ললাটে, তার বিপর্যস্ত কেশের মধ্যে নিজের কোমল শীতল অঙ্গুলি সস্নেহে পরিবেশন করতে লাগল।

অনেকক্ষণ এমনি নিশ্চেষ্ট নির্বাক হয়ে প'ড়ে থেকে পার্বতীর স্নেহহস্তের সেবায় কতকটা সুস্থ বোধ ক'রে, তার বক্তব্যের ভূমিকাস্বরূপ শচীন্দ্র ধীরে ধীরে পার্বতীর হাতটা নিজের করতলের মধ্যে টেনে নিলে। সমস্ত রাস্তা সে পদব্রজে অতিক্রম ক'রে এসেছিল খর রৌদ্রে। তৃষ্ণায় তার কণ্ঠতল যে শুষ্ক হয়ে গিয়েছে, এতক্ষণ সে কথা তার মনে ছিল না। পার্বতীর স্নেহের ছায়ায় নিজের উৎকণ্ঠিত চিত্ত শান্ত হতেই ক্ষুধাতৃষ্ণার স্বাভাবিক তাড়না তার মধ্যে জেগে উঠল। তবু এমন রসোজ্জ্বল পরিবেশের মধ্যে অসময়ে অকস্মাৎ স্থূল ক্ষুৎপিপাসার আবেদনের লজ্জায় স্মিত হাস্যে পার্বতীর দিকে চেয়ে বললে, রোদ্দুরে যে কষ্ট হচ্ছিল, পথের মধ্যে তা খেয়াল ছিল না। একটু ঠাণ্ডা জল যদি—

পার্বতী সন্ত্রস্ত বিস্ময়ে বললে, ওকি! আপনি এই পথ হেঁটে এসেছেন এই রোদে? ইস, করেছেন কি? আর এতক্ষণ বলেন নি? ভারি অন্যায়! এখন একটা অসুখ-বিসুখ না করলেই বাঁচি। বসুন, জল আনছি। স্নান করবেন তো? না না, কিছু সঙ্কোচ করবেন না।

আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। ব'লে সে দ্রুতপদে চ'লে গেল এবং এক বালতি জল, মগ, তোয়ালে, সাবান নিয়ে এসে বললে, উঃ, কি রোদটাই না খেতে হয়েছে! নিন, একটু হাত-মুখটা ধুয়ে নিন তো, চলুন। ব'লে শচীন্দ্রের উদ্যত আপত্তির অপেক্ষা না রেখে, তার হাত ধ'রে নিয়ে কাছে একটা মোড়ার উপর বসাল। তারপর তোয়ালেটা তার গলায় জড়িয়ে দিয়ে, মাথাটা নিজের হাতে সযত্নে ধুইয়ে দিতে লাগল। শচীন্দ্রের আবেশবিজড়িত মৃদু আপত্তিতে কোন ফল হ'ল না। হাত-পা ধোয়া শেষ হ'লে সে পার্বতীর দিকে চেয়ে স্নেহমিশ্রিত পরিহাসের সুরে বললে, নার্সের টুপি প'রেই জন্মেছিলে বোধ হয়। আঃ, কি আরাম যে হ'ল! সমস্ত মাথাটায় যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল! পার্বতীর স্নেহে তার হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠেছে।

গৃহ থেকে কমলাপুরীর পথে যখন সে নিষ্ক্রান্ত, তখন তার মনে সংশয় এবং পার্বতীর প্রতি নিষ্ঠুরতার অপরাধজনিত সঙ্কোচের অন্ত ছিল না। কিন্তু পার্বতীর চিরজাগ্রত প্রীতির নিদর্শনে তার হৃদয় প্রশ্রয় পেয়ে উঠল। তার নিশ্চিন্ত নির্ভরের এই পরম রমণীয় আশ্রয়টুকু যেন সে নূতন ক'রে আবিষ্কার করলে।

তৃপ্তিদানের পরিতোষে পার্বতীর আনন আনন্দে ব্রীড়ায় ও সুখাবেশে রঞ্জিত হয়েছে। পার্বতীর সেই স্নেহশঙ্কালজ্জা-বিজড়িত মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে শচীন্দ্র আর সংযত রাখতে পারছিল না তার এতদিনের বঞ্চিত ক্ষুধাকে। হৃদয়ের অন্তস্তলে পার্বতীকে আজ সে পেয়েছে অনন্য-রূপে। হৃদয় তার দিতে চায় অন্তরে বাহিরে সেই পরম অনন্যতার অভিব্যক্তি। অত্যন্ত সমাদরে দুই করতলের মধ্যে পার্বতীর মুখটা টেনে নিয়ে সম্পূর্ণ দ্বিধাশূন্য সহজ প্রেমের আবেগে সে তার মুখচুম্বন ক'রে তাকে নিবিড় আলিঙ্গনে টেনে নিলে তার বুকের মধ্যে।

আজ পার্বতী কিছুমাত্র আপত্তি জানাল না। [illegible]

লেশমাত্র ছিল না তার নিজের মনে; তাই কোনরূপ কৃত্রিম বাধায় সে ওই সন্তপ্ত মানুষটির একান্ত সমর্পিত সহজ উৎসর্গের দানকে সামাজিক আচারনিষ্ঠ কোনও নীতির আঘাতে অপমান করলে না।

ওই যে পুরুষটি, আজ তার সমস্ত পৌরুষের অভিমান বিসর্জন দিয়ে, পীড়িত তাপিত চিত্তে অনন্য নির্ভরে, তারই কাছে এসেছে তার সহজ প্রাণের স্বাভাবিক আকুলতায়—দুরন্ত অবোধ শিশু আহত হ'লে মার কোলে যেমন ক'রে ছুটে যায়—এই কথাটাই তার স্নেহকরুণ চিত্তকে মথিত করতে লাগল। আজ সে কমলার প্রেমে দ্বিধাকুণ্ঠিত মন নিয়ে তার কাছে আসে নি। তার নিঃসংশয় অকুণ্ঠ আত্মবিসর্জনের সেই সহজ প্রকাশের উপলব্ধি-মুহূর্ত পার্বতীর অন্তর থেকে বাহিরের সমস্ত বাধাকে দূর ক'রে দিলে। যদিও পার্বতী জানে না যে, কি তার দুঃখ; তবু দুঃখ যে তার গভীর, এ বিষয়ে পার্বতীর সংশয়মাত্র ছিল না; এবং শচীন্দ্রকে শান্ত ক'রে তোলবার ব্যাকুলতায় সে নিঃসঙ্কোচে নিজেকে উৎসর্গ করলে।

শচীন্দ্রের জীবনে এই প্রথম,—পার্বতী এই প্রথম তার সমাদরকে প্রত্যাখ্যান করে নি; এবং মনে মনে আত্মোৎসর্গের এই প্রসাদ লাভ ক'রে শচীন্দ্রের হৃদয় আনন্দরসে মধুময় হয়ে উঠল।

তার মনে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ আনন্দের সঙ্গে গুনগুন সুরে গুঞ্জন ক'রে ফিরছিল—

তোমার বীণা যেমনি বাজে আঁধার মাঝে
অমনি ফোটে তারা।

আহারান্তে পার্বতী বললে, আপনি শ্রান্ত; চলুন, শুয়ে শুয়ে কথা বলবেন। আমি নর্মদার ঘরে গিয়ে শোব এখন।

ক্লান্তদেহ বিহ্বলচিত্ত শচীন্দ্রকে অধিক অনুরোধ করতে হ'ল না। পার্বতী তাকে সযত্নে শুইয়ে দিয়ে, তার পাশে ব'সে গায়ে মাথায় হাত

বুলিয়ে দিতে লাগল। কোমল শুভ্র শয্যার সুশীতল স্নিগ্ধ ক্রোড়ে আরামে দেহ বিকীর্ণ ক'রে দিয়ে, উচ্ছ্বসিত প্রাণের কলধ্বনির আবেগে সে মুক্ত ক'রে দিলে অজস্র কথার স্রোতে তার হৃদয়ের গোপন উৎস। পার্বতী নিঃশব্দে তার গভীর বেদনার কাহিনী শুনে যেতে লাগল। কমলাকে ফিরে-পাওয়ার ব্যর্থ প্রয়াসের সুদীর্ঘ ইতিহাস আর আজকের পরিতৃপ্ত কৃতজ্ঞ হৃদয়ের নিবিড় আনন্দের অনুভূতি। কোন কথাই আজ শচীন্দ্র অপ্রকাশ্য ব'লে মনে করলে না।

শচীন্দ্র অন্তরে অন্তরে স্বভাবতই ভোগী মানুষ। তার সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব বিতর্কবিচারের অন্তে যা অবশিষ্ট থাকে, তা একান্ত ক'রে তার ভোগেচ্ছা বই আর কিছুই নয়—অবশ্য হয়তো বা তা রুচিপিপাসু কবি-চিত্তের মর্জিত ভোগেচ্ছা এইমাত্র।

আজ তার সুখতৃপ্ত আরামলীন নিশ্চিন্ত মন, পার্বতীর হৃদয়ে আপনার অবিচলিত আসন সুনিশ্চিত অনুভব ক'রে, ক্রমে ধীরে ধীরে নিজের ভোগপিপাসু কল্পনাকে সে মুক্ত ক'রে দিলে সুমার্জিত ভাষার সুললিত বিন্যাসে। তবু যা সে বলতে চাইছে কেমন ক'রে সে কথা প্রকাশ করার সঙ্কোচ কাটিয়ে গ্রহণযোগ্য ক'রে বলবে তাই মনে মনে আলোচনা করতে করতে ব'লে যেতে লাগল। বলতে বলতে মনের এবং রসনার জড়তা তার দূর হয়ে গেল। বললে, পার্বতী, আজ আমার নিজেকে পরিপূর্ণ ক'রে পাবার দিন এল। অনেক ভেবে দেখেছি আমি, তোমাকে জীবনে না লাভ করলে জীবন আমার জ্যোতির্বিহীন তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। কমলাকে পাওয়ার পরিপূর্ণ রূপ তোমাকে বাদ দিয়ে আমার কাছে প্রকাশ পাবে না। তাতে কমলাও ব্যর্থ হবে, আমিও। তোমার মধ্যে প্রাণের বিদ্যুৎপ্রবাহ অপর্যাপ্ত সৃজনী শক্তিতে বেগবান। তুমি আমাদের বিধ্বস্ত আত্মার এই জড়স্তূপকে জগতের প্রাণস্রোতের মধ্যে টেনে বের ক'রে আন—নূতন ক'রে গ'ড়ে তোল

কর্মে, প্রাণে, কল্যাণে। কমলার অন্তরের মধুর রসকে উৎসারিত ক'রে তোল ; মুক্ত ক'রে দাও আমার জীবনযজ্ঞের প্রাঙ্গণে। বলতে বলতে সে পার্বতীকে আকর্ষণ ক'রে নিতে চেষ্টা করলে নিজের কাছে।

পরিতৃপ্ত সমাশ্রিতচিত্ত শচীন্দ্রের কণ্ঠে একটু একটু ক'রে সত্য ক'রে বলার চেয়ে সুন্দর ক'রে বলার সুর লাগছে। শামুকের শুঁড়ে অস্বস্তিকর কিছু স্পর্শ করলে, শামুক যেমন নিজের আবরণের আশ্রয়ে গিয়ে প্রবেশ করে, শচীন্দ্রের কথা শুনতে শুনতে পার্বতীর মন তেমনি ধীরে ধীরে ক্রমে সঙ্কুচিত হয়ে নিজের মধ্যে প্রবেশ করছিল ; এবং এক সময়, অতি ধীরে, শান্ত অথচ সুনিশ্চিতভাবে পার্বতী নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে, শ্রান্ত পীড়িত রোগীর পরিচর্যায় নিজেকে নিযুক্ত করলে।

* * *

শেষ রাত্রে লঙ্ক ছেড়ে গেছে। বীততাপ, পরিতৃপ্ত শচীন্দ্রনাথ তখন গভীর নিদ্রায় অচেতন। মনের সংগ্রাম তার শান্ত, চিত্ত তার নিরাময়, সমস্ত দেহ-মন-আত্মা এক নিবিড় আনন্দরসে নিমগ্ন।

সকালে বিছানার উপর যখন সে উঠে বসল, বেলা তখন অনেক। পূর্ব-রজনীর সুখাবেশ তখনও তার দেহমনের উপর জড়িয়ে রয়েছে। একটি আলস্যমধুর স্মিতহাস্য লেগে আছে তার ওষ্ঠে স্বপ্নের মত সেই স্মৃতির কুহকে। পর্বতী এখনও এসে উপস্থিত হয় নি। রাত্রিজাগরণের ক্লান্তিতে সে নিশ্চয়ই নিদ্রিত এখনও। শয্যা পরিত্যাগ ক'রে শচীন্দ্র উঠে বারান্দায় গেল। দীপ্ত প্রভাতের উজ্জ্বল কিরণে নদীর ঢেউ, দিগন্তপ্রসারিত শস্যক্ষেত্র, মেঘলেশরিহীন আকাশের অঙ্গন হাসির জোয়ারে প্লাবিত। বনতুলসীর গন্ধে মন্থর স্নিগ্ধস্পর্শ মৃদুসমীরণে কিসের যেন ইঙ্গিত! সমস্ত চরাচর প্রসন্ন, মুগ্ধ, রোমাঞ্চিত যেন।

পুলকিত স্বপ্নাবিষ্ট নয়নে রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়ে মধুক্ষরিত ধরণীর এই সৌন্দর্যসুধা পানে সে আবিষ্ট ছিল কতক্ষণ কে জানে! এক সময়

সচেতন হয়ে ভাবলে, কই, পার্বতী তো এল না এখনও! আকাশের দূরে উর্ধ্বে সে তার প্রসন্ন দৃষ্টিকে প্রসারিত ক'রে দিয়ে মৃদু উচ্চারণে বলতে লাগল, পার্বতী, পার্বতী, আকাশের নীলিমার মত রহস্যময়ী পার্বতী—

আবার সে গেল ঘরে ফিরে। বিছানার দিকে একবার চেয়ে সে তার চোখ ফিরিয়ে নিলে। কেন কি জানি, আয়নায় নিজেকে দেখবার বাসনায় সে দেরাজের কাছে এসে চেয়ে দেখলে আয়নার ভিতরে অযত্নবিন্যস্ত কেশবেশ, ক্লান্ত আবেশ নয়ন। অল্প একটু সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। সমস্ত স্থানটা জুড়ে যেন পার্বতীর দেহের একটি মৃদু সৌরভ। ছোট ছোট প্রসাধনের জিনিস, এলোমেলো ক'রে দেরাজের উপর রাখা। লণ্ডনে-তোলা শচীন্দ্রের একটা ছোট ছবি হাতীর দাঁতের ফ্রেমে আঁটা। রক্তহীন দুর্বল ছায়ামূর্তি, তার নিজের হাতে নীচে ইংরেজীতে লেখা Resurrected (রেসারেক্টেড্)। ইউরোপের দিনগুলি তার মনে ভেসে উঠল। অল্প হেসে আয়নায় আবার নিজেকে দেখলে। কত পরিবর্তন! চোখ ফিরিয়ে নিলে। কতকগুলো শুকনো ফুল। চন্দনকাঠের একটা বাণবিদ্ধ রাজহাঁস, যন্ত্রণায় স্খলিত গ্রীবা নুয়ে পড়েছে। কি সুন্দর কাগজ-চাপা! একটা চিঠি। একি! তারই নাম লেখা যে! ইংরেজীতে লেখা পত্র! খুলে পড়তে লাগল। পড়তে পড়তে তার মুখের সেই উদ্ভাসিত তৃপ্ত প্রসন্নোজ্জ্বল কান্তি কোথায় মিলিয়ে গেল। চিঠিতে লেখা—

প্রিয়তম, এত দিন তোমাকে নিজের গভীর অন্তরে ওই সম্বোধনে ডেকেছি। আজ প্রথম এবং শেষবার প্রকাশ্যে ডাকছি তোমায় ওই প্রিয় নামে—তোমারই মুহূর্তেকের পরিপূর্ণ আত্মদানের অধিকারে।

এখানে অবসান হয়েছে আমার কাজের। আমার উপস্থিতিতে অকারণ জটিলতার সৃষ্টি ক'রে লাভ নেই। তোমাকে পাওয়া আমার

পূর্ণ হয়েছে আজ। কমলার মধ্যে আমাকে পাওয়া তোমার থেকে শুরু হোক। আমাকে তুমি অনেক দিয়েছ—তা-ই আমার প্রাণ পূর্ণ ক'রে রইল। তোমাকে যা দিতে পারি নি, আপন আত্মার তুমি আপনার মধ্যে তা পূর্ণ ক'রে পাও। অন্তের কাছে পাওয়ার অপেক্ষায় তার থেকে বঞ্চিত কর না নিজেকে। তুমি শান্ত হও, নিজে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হও, তোমার অন্তরের প্রাণ-সম্পদে দূর হয়ে তোমার সকল দৈন্য, সমস্ত মিথ্যা—এই আমার প্রার্থনা।

বিদায়

পার্বতী

পত্রখানা সে একবার দুবার পাঁচবার দশবার পড়ছে, কিন্তু তার মস্তিষ্ক যেন এর প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করতে পারছে না। কথাগুলো যেন কয়েকটা অক্ষরের সমষ্টি মাত্র। Dearest-এর ডি-এর শুঁড়টা কি রকম পাকানো। প্রথম লাইনে মাত্র চারটে কথা। কিন্তু—কিন্তু এ কে লিখেছে পার্বতী? পার্বতী! হঠাৎ বুকটা যেন হাহাকার ক'রে উঠল তার। দ্রুতপদে সে ঘরে চ'লে গেল। সব ঠিক তেমনি আছে, কোন ব্যতিক্রম হয় নি। টিকটিকিটাকেও সকালে ওই কার্নিসের ধারেই দেখেছিল। রাজহাঁসটা ঠিক আছে। তাই তো, চিঠিটা হঠাৎ কে লিখল? I was a fool! Oh, I behaved like a cad ওঃ, কিন্তু, সত্যি? চ'লে গেছে? দুষ্টুমি করছে না তো? শচীন্দ্রনাথ চিঠিখানাকে দু-তিনবার পড়ল। না, দুষ্টুমি নয়, চ তো গেছে। তাই তো, স্টীমারটা চ'লে গেছে! তাড়াতাড়ি বারান্দায় গেল, ঘাটের দিকে চেয়ে দেখলে। দেখতে দেখতে শূন্য শূন্য ক'রে তার বুকটা আবার হাহাকার ক'রে উঠল। অন্যমনস্ক